প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : গণেশ বসু ॥

প্রকাশক : সুনীল মণ্ডল ॥ মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ ॥
মুদ্রক : শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায় ॥ অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৭/এ, বলাই সিংহ লেন ॥
কলিকাতা ৯ ॥

শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

ভূমিকা

উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা দেশ, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি সম্বন্ধে গত দশ বছর ধরে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছি, এই সংগ্রহে তারই কিছু প্রকাশিত হল। ইতিপূর্বে এগুলি নানা সাময়িক পত্র ও স্মারকগ্রন্থে ছাপা হয়েছে। বর্তমান সংগ্রহে তার কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে, কিছু নতুন কথাও সংযোজিত হয়েছে। এর বক্তব্যবিষয় প্রধানতঃ উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা দেশকে কেন্দ্র করেছে বলে এর নামকরণের মধ্যে সেই ইঙ্গিতটি রয়ে গেছে।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুনীল মণ্ডলের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি যে আন্তরিক প্রীতির বশে এ সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন এবং গ্রন্থটিকে সুচারু ও শোভন রূপ দেবার জন্য যেভাবে তৎপর হয়েছেন তাতে তাঁকে আমি অন্তর থেকে সাধুবাদ দিই। শিল্পী শ্রীগণেশ বসু শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের অঙ্গসজ্জার প্রতি কোনও প্রকার কৃপণতা করেন নি, এজন্য তাঁকেও আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আমার ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় নানা পত্র-পত্রিকায় ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আমার প্রবন্ধগুলির সন্ধান দিয়ে এবং দু'-একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রেসকপি তৈরি করে দিয়ে আমার পরিশ্রম লাঘব করেছেন। তাঁকে আশীর্বাদ জানাই।

পরিশেষে বলি, এ প্রবন্ধগুলি যদি কোনও পাঠকচিত্তে বিন্দুমাত্র কৌতূহল জাগায়, সামান্যতম প্রশ্ন-সংশয়ের দোলা দেয়, তা হলেই আমি কৃতার্থ হব।

উনিশ বিশ

সূচী

ভারত-পথিক রামমোহন

য়ুরোপের সংস্কার-আন্দোলনের শুকতারা জন উইক্লিফের (১৩২৪-১৩৮৪) সাড়ে চার শ' বছর পরে রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) আবির্ভাব হয়েছে। উইক্লিফের যুগে ইংলণ্ডের সমাজব্যবস্থা ও ধর্মনৈতিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের হুবহু সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু উইক্লিফের মতো রামমোহনও প্রচলিত সংস্কারকে বাদ-প্রতিবাদের সাহায্যে এবং বুদ্ধি ও যৌক্তিকতার নিরিখে তৌল করতে চেয়েছিলেন। উইক্লিফ ধর্মযাজকদের পার্থিব ঐশ্বর্য ও ভোগাসক্তি দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন করেছিলেন। যাঁরা খ্রীস্টসেবক, গির্জার কর্ণধার, তাঁরা ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসে পার্থিব আরাম ভোগ করছেন—এর বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তুললেন জন উইক্লিফ, এবং ১৩৭৪ সালের দিকে লাতিন ভাষায় *De Dominio* গ্রন্থ লিখে পোপ এবং তাঁর বশংবদ ধর্মযাজকদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করলেন। কিন্তু তিনি এখানেই থামলেন না, খ্রীস্টান ধর্মের কতকগুলি আচার ও কৃত্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুললেন। খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বে যাকে *Eucharist* (Trans-substantiation) বলে, তার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ তীব্র হয়ে উঠল। তাঁর দলবল, যারা 'লোলার্ড্' নামে পরিচিত, তারা একদা এমন প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে 'De Haeritico Comburendo' শীর্ষক আইন পাস করাতে হয়। এই অপরাধে উইক্লিফ্‌পন্থী স্যর জন ওল্ড ক্যাস্‌ল্‌কে পুড়িয়ে মারা হয়। বাঙলা দেশে রামমোহন কিছু কিছু সামাজিক নির্যাতন ভোগ করলেও তাঁর

বিরুদ্ধে কোন আইন পাস হয় নি, বা তাঁর কোন অনুচরকে নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি। অথচ তাঁর ক্রিয়াকর্ম তো উইক্লিফের চেয়ে নিরীহ ছিল না।

রামমোহন শাস্ত্রগ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে সুলভে প্রচার আরম্ভ করলেন। এতদিন যা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও শাস্ত্রব্যবসায়ীর কুক্ষিগত ছিল, এবার তা অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেতর লোকের দৃষ্টিগোচর হল। উইক্লিফ ইংরেজী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে অনুরূপ আন্দোলনের সম্মুখীন হন। রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বহু-কালাশ্রিত সংস্কারে দারুণ আঘাত দিলেন। সর্বোপরি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ প্রচার করে, পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করে এবং বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে (কিন্তু শাক্ত মত ও তন্ত্রের প্রতি তাঁর কোনরূপ বিরূপতা ছিল না) তিনি উনিশ শতকের প্রথম পাদে যে কী ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ শতাধিক বৎসর পরে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তাই আমরা রামমোহনকে প্রাচ্য-ভুবনের উদিত সূর্য বলে গ্রহণ করতে চাই। আপ্তবাক্যের স্থানে বিচারবুদ্ধি, প্রচলিত সংস্কারের স্থানে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ যৌক্তিকতা, জীবনভীরু উদাসীনতার স্থানে জীবনের প্রতি কঠোর বাস্তবানুবর্তিতা এবং মানুষের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা—রামমোহনকে আধুনিক মানুষের পুরোধার গৌরব দিয়েছে। এদিক থেকে তাঁর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[১] কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাঁর গদ্য নিয়েই আলোচনা করব।

১. তাঁর সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন, "He was by nature one of those who lead, not one of those who follow, one of those who are in advance of, not of those who are behind their age."

রামমোহন ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন এবং ১৮৩০ সালে বিলাত যাত্রা করেন। মোট পনের বছরের মধ্যে তিনি বাংলা গদ্যে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন প্রচুর। ছোট-বড় বাংলা পুস্তিকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল অন্ততঃ ত্রিশ, ইংরেজী পুস্তিকার সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। নানাবিধ গুরুতর কর্ম, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত থেকেও তিনি বাংলা গদ্যে যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন, তার কিছু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যান এবং কিছু বিচারবিতর্কমূলক রচনা। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, যাকে polemic রচনা বলে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তিনি তার অগ্রদূত। প্রাচীন যুগে শাস্ত্র ও তত্ত্ব নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদ হয়েছে। গোটা ন্যায়-শাস্ত্রটাই তো পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের সওয়াল-জবাবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা দেশে মধ্যযুগেও তর্কবিতর্কের সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত মিলছে। নব্যন্যায় বাঙালীর সূক্ষ্ম চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। চৈতন্যজীবনীগ্রন্থেও চৈতন্যদেবকে একজন বিশিষ্ট তার্কিক রূপে আঁকা হয়েছে। এমন কি, যখন তিনি ভাবরসে মাতাল হয়ে থাকতেন, তখনও রামানন্দের সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। সুতরাং রামমোহনের যুক্তি ও তার্কিকতা বাঙালীরই চিত্তসংস্কার থেকে উদ্ভূত। বাঙালীর আচার-আচরণ এবং কৃত্যের মধ্যে আবেগের অতিরেক যেমন আছে, তেমনি আছে সূক্ষ্ম চিন্তা ও যুক্তি। যৌক্তিক পারম্পর্য এ জাতির মনঃপ্রকর্ষকে তীক্ষ্ণতর করেছে। রামমোহনের সমস্ত গদ্যরচনায় সেই অপ্রতিহত ও অসংসক্ত বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আবেগের দ্বারা কিছু কিছু আন্দোলিত হয়েছিলেন। আবেগের প্রবলতা না থাকলে তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে এতটা তৎপর হতে পারতেন না। পতি-বিয়োগবিধুরা বিধবাকে কীভাবে হত্যা করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলছেন :

"তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর। পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ দিয়া চুপিয়া রাখ।......অন্য ২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে, কিন্তু বালককাল অবধি আপন ১ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য ২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃদেখিবাতে এবং দাহ-কালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে। এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর, কি পুরুষের, মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না।" [২]

('সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ')

এখানে তাঁর পুরুষ-হৃদয় কতটা স্নেহার্দ্র ও করুণ হয়ে উঠেছে, তা তাঁর সহজ সরল ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য তাই বলে আমরা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারি না। রামমোহন মূলতঃ জ্ঞানবাদী—প্রত্যভিজ্ঞামূলক নিরীক্ষাই তাঁর পথপ্রদর্শক। অপর দিকে বিদ্যাসাগর মূলতঃ আবেগবাদী, মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি। সে যাই হোক, রামমোহন বাংলা গদ্যকে তুচ্ছতার অবজ্ঞা থেকে রক্ষা করে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও মত-প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করেছেন এবং এই ভাষাকে গুরুতর ভারবহনক্ষম কর্মে প্রস্তুত করেছেন—এই জন্য তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

২. বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উনিশ শতকের গদ্য থেকে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে, পাঠকের বোধ-সৌকর্যের জন্য সেখানে আধুনিক বিরামচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দু'দশকের গদ্যে শুধু দাঁড়িচিহ্ন ছাড়া অন্য কোন বিরামচিহ্ন প্রায়ই ব্যবহৃত হত না।

রামমোহনের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য

১৭৭৮ সালে হলহেড 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য *The Grammar of the Bengal Language* লিখেছিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে বলেছেন, "I must observe, that Bengal is at present in the same state with Greece before the time of Thucydides; when Poetry was the only style to which authors applied themselves and studied prose was utterly unknown."

যাঁরা বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল নন, তাঁরা হলহেডের এই মত নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই মত শিষ্টজনের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছে। এতদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি যে, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য ছন্দাত্মক; সে যুগে নাকি কোথাও গদ্যের ব্যবহার ছিল না। সদাশয় মিসনারী সম্প্রদায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর দল, এবং রামমোহন বাংলা গদ্যের স্রষ্টা ও সংরক্ষক। কিন্তু গত তিন-চার দশকের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বাংলা গদ্য সম্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, যাতে হলহেডের মতামতের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত হত। বৈষ্ণবপদকারেরা এবং ভারতচন্দ্র কিছু কিছু অন্য ছন্দের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু পয়ার-ত্রিপদী ছন্দেই যাবতীয় গদ্যাত্মক বিষয় রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্য-জীবনগ্রন্থের অনেকটাই বিশুদ্ধ গদ্যধর্মী, কিন্তু তাও পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত। মধ্যযুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত না হবার কারণ—পয়ারছন্দ। পয়ারবন্ধ এতটা স্থিতিস্থাপক ও ভারসহিষ্ণু যে, স্বচ্ছন্দেই এতে

গদ্যনিবন্ধ রচিত হতে পারে। আমাদের অনুমান, পয়ারছন্দে যে-কোন সাহিত্যকর্ম নির্বাহ হতে পারত বলে সে যুগে গদ্যরীতির বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় নি। কিন্তু তাই বলে কি আমরা মনে করব, বাংলা গদ্য মিসনারী সম্প্রদায়ের দ্বারা জন্মলাভ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং লালিত হয় রামমোহনের দ্বারা?

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের যে ব্যবহার ছিল না, তা কখনই সত্য নয়। হলহেড অথবা কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুর মিসনের 'ভ্রাতৃগণ' পুঁথির গদ্য সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর রাখতেন না; তাই তাঁরা গোড়া থেকেই বাংলা গদ্য তৈরি করতে গিয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পেতেন যে, খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী থেকেই চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ, ক্রয়বিক্রয়পত্র প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে বাংলা গদ্য রীতিমতো ব্যবহৃত হত। ১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ অহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবের কাছে সাধুগদ্যেই চিঠি লিখেছিলেন। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে যে, ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা গদ্যের ব্যবহারযোগ্য পদবিন্যাসরীতি গড়ে উঠেছিল—"লেখনং কার্যাঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" এখানে লক্ষণীয় গদ্যের পদবিন্যাসরীতি এবং সুষ্ঠু অন্বয় ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি গড়ে উঠেছিল, চিঠিপত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছিল। কেরী সায়েবের দল এই রীতির খোঁজ রাখতেন না, বা পুঁথির গদ্য সম্বন্ধে কৌতূহলীও ছিলেন না। তাই তাঁরা ইংরেজী বা সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা গদ্য লেখার ও লেখাবার চেষ্টায় বহু পণ্ডশ্রম করেছেন। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতেও কয়েকখানি পত্রে পরিচ্ছন্ন বাংলা গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মধ্যযুগীয় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজদরবারে বাংলা গদ্য সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত

হত। চিঠিপত্র, হুকুমনামা, দলিলদস্তাবেজ—সমস্ত ব্যাপারেই বাংলা গদ্যের ডাক পড়ত। ১৭শ শতাব্দীর দিকে মুঘল দরবার ও আদালতের প্রভাবে মামলা ও জমি-জমাসংক্রান্ত লেখায় ফারসী শব্দের কিঞ্চিৎ বাহুল্য থাকত—এখনও আদালতী ভাষা থেকে ইসলামী বাংলার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ধান করে নি।

১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বকীয়া-পরকীয়া বাদবিসংবাদ-সংক্রান্ত যে দলিলটি পাওয়া গেছে, তার ভাষা বেশ স্বচ্ছ এবং পদবিন্যাসরীতিও মোটামুটি প্রশংসনীয়। জয়পুর মহারাজের সভাপণ্ডিত এবং স্বকীয়াবাদের পরিপোষক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য পরকীয়া মতের পরিপোষক ও বাংলার বৈষ্ণবসমাজের নেতা রাধামোহন ঠাকুরের কাছে স্বকীয়া-পরকীয়াবাদের দ্বন্দ্বে পরাজয় স্বীকার করে যে 'অজয়পত্র' লিখে দেন তার কিয়দংশ :

> "মালহাটি মোকামে তোমার নিকট (অর্থাৎ রাধামোহনের কাছে) স্বকীয়া পরকীয়া ধর্ম্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম।"

এ ভাষা তো আধুনিক কালের ভাষা। কেরী সায়েবের 'ধর্মপুস্তক'-এর ভাষা এর চেয়ে অনেক দুর্বল। তিনি গোড়ার দিকে বাইবেল অনুবাদের ভাষায় কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেন নি। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়াদের যে সমস্ত কড়চা-জাতীয় পুঁথি পাওয়া গেছে, তার গদ্য বাক্যগুলি সরল ও সংক্ষিপ্ত—পদবিন্যাসরীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয় নি। কেরী ও খ্রীস্টান 'ভ্রাতৃগণ' বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা বাংলা গদ্য তৈরি করেন নি; বরং তাঁদের অনেকে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক পদবিন্যাসকে অবহেলা করে একটা

কৃত্রিম রীতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন,—অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এদিক থেকে সার্থক ব্যতিক্রম। অনেকের ধারণা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীর দল এবং কেরী প্রভৃতি মিসনারীরাই সাধুভাষা নামক একটি কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করেছেন। এ মত একেবারে ভুল। সাধুগদ্য বাংলা দেশের নিজস্ব স্বাভাবিক রীতি। পয়ারছন্দের রূপান্তর হচ্ছে বাংলা গদ্য। মধ্যযুগীয় বাংলা পয়ারে যে ধরনের বাগ্‌বিন্যাস ও সাধুরীতি অনুসৃত হয়েছে (যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'), বাংলা গদ্যের বাক্যগঠন কতকটা সেই পথ ধরেছে। তাই সাধুভাষা আগন্তুক নয়, বা পণ্ডিতের কৃত্রিম সৃষ্টিও নয়। পুরাতন যুগ থেকে বাঙালী-মনের সঙ্গে পয়ারছন্দ ও সাধু গদ্যরীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্তুগীজ মিসনারীদের গদ্যরচনার চেষ্টাও আলোচনার যোগ্য।

১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে পর্তুগীজ 'হার্মাদ' আর পাদ্রীরা বাংলা দেশে আনাগোনা শুরু করেছিল। তারা পূর্ববাংলার অনেক গ্রামে গির্জা বা 'ধর্ম-ঘর' বানিয়ে হিন্দু ও মুসলমানকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিল, কিছুটা সফলও হয়েছিল। তারা কিছু কিছু গদ্য প্রচার-পুস্তিকা লেখারও চেষ্টা করেছিল। শোনা যায়, ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের দিকে দোমিনিক-দে-সুজা সোনার গাঁয়ের কাছে শ্রীপুরে বাংলা শিখেছিলেন এবং বাংলা গদ্যে দু'খানি পর্তুগীজ প্রচার-পুস্তিকার অনুবাদও করেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে দু'খানি প্রচার-পুস্তিকা পাওয়া গেছে, এই প্রসঙ্গে তার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। দু'জন পাদ্রী, দোম আন্তোনিও-দে-রোজারিও এবং মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও দু'খানি বিতর্কমূলক গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দোম আন্তোনিও বাঙালী হিন্দু ছিলেন, পরে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পর্তুগীজ নাম নিয়েছিলেন। তাঁর 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ' ১৮শ শতকের

তৃতীয়-চতুর্থ দশকে রচিত হয়েছিল, কিন্তু লেখা হয়েছিল রোমান হরফে। মানোএল সায়েব খাঁটি পর্তুগীজ পাদ্রী ছিলেন; তিনি ১৭৩৪ থেকে ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ঢাকা জেলার ভাওয়ালে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, গির্জা বানিয়েছিলেন। তিনি একখানি পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থও লিখেছিলেন (*Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez*)। তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (*Crepar Xaxtrer Orth Bhed*) প্রচারপুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় লেখা হলেও রোমান হরফেই মুদ্রিত হয়েছিল। ১৭৩৩ সালে তিনি ঢাকায় বসে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই পুস্তিকাটি লেখেন, ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবনে এটি রোমান হরফে ছাপা হয়। দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ' কিন্তু ছাপা হয় নি। এই দুটি গ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

১. "বলি বরো ধর্ম্মিষ্ঠ ছিলো মহাদাতা ছিলো, যে যাহারে চাহিত, তাহারে তাহা দিতো এ কারোণ পরমেশর বামন রূপে হইয়া একপদ দিয়া পৃথিবীতে, এক পদ পাতালে, আর পদ সর্গে এইরূপ বলি-রাজারে ছলিলেন।" ('ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ')

২. "তোলেদো শুহরে এক গৃহস্থের পুত্র আছিল, সে কুবন্ধুর লগে ফিরিল, কুকার্য্য শিখিয়া কুজন হইল। তাহার পিতা তাহারে শিক্ষা দিত, সে পিতার কথা না মানিত। পিতা একদিন তাহারে শাস্তি দিতে চাহিল: পুত্রে ক্রোধ করিয়া হাত তুলিয়া পিতার মুখেতে চড় মারিল।" ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ')

রোমানক্যাথলিক পাদ্রীদের চেষ্টায় বাংলা গদ্যের যে অনুশীলন হয়েছিল তাতে সাধু গদ্যরীতিই অনুসৃত হয়েছে। দোম আন্তোনিও ও মানোএল সায়েব ঢাকা অঞ্চলে বসে লিখেছিলেন, কিন্তু 'আছিল'

'লগে', 'তাহারে' বাদ দিলে আর কোথাও আঞ্চলিক প্রয়োগ নেই, বা মুখের বুলি অনুসৃত হয় নি। এখানে দেখা যাচ্ছে, বিদেশী ধর্মযাজকও সাধুরীতি অবলম্বন করেছিলেন।

১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ নন্দকুমারের পত্রে ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকলেও ভাষারীতিতে সাধুছাঁদই ব্যবহৃত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা শিখে যে-সমস্ত আইনগ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করেছিলেন, তার ভাষাভঙ্গিমা জড়তাপূর্ণ ও অনভ্যস্ত বটে, কিন্তু সাধুভাষার রীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয় নি।

এর পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত পণ্ডিত-মুন্সীদের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। ওয়েলেস্‌লি আহেলা বিলিতি সিভিলিয়ানদের দেশীয় ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতি শেখাবার জন্য ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের বাংলা, মারাঠী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরামপুর মিসনের সর্বাধিনায়ক রেভাঃ উইলিয়ম কেরী। কেরী ধর্মপ্রচারণার উদ্দেশ্য নিয়েই দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় যে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, তার মূলেও ছিল অনুদার সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব[৩]। বাইবেল সম্পর্কে ও খ্রীস্টানধর্ম প্রচারে যাজকসম্প্রদায় সাধারণতঃ যে-রকম অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, কেরী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ভাষার প্রতি তাঁর যেমন কৌতূহল ছিল, তেমনি ছিল ভাষা শিক্ষা করার স্বাভাবিক প্রবণতা। এই জন্য বাংলা গদ্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কাহিনী, ইতিহাস ও গালগল্পকে ভবারেশে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুব্যবস্থা করে এই

৩. কেরীর জীবনীকার স্মিথ সায়েব স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, "Against Vedas and Upanishadas, Brahmanas and epics he set the Sanskrit Bible."

বিদেশী ধর্মযাজক ব্যক্তিটি বাঙালীর চিরদিনের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন। তাঁর চেষ্টা, উৎসাহ ও সহায়তায় কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিত ও ফারসী-নবিশ মুন্সী বাংলা গদ্য-গ্রন্থ রচনায় প্রস্তুত হলেন, কয়েকখানি পুস্তিকা মুদ্রিতও হল। তার মধ্যে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থ বলেই এর খ্যাতি—যদিও বইটি ফারসী শব্দকণ্টকে এবং ত্রুটিযুক্ত অন্বয়ে প্রায় অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কেরী সায়েবের উৎসাহে কলেজের যে সমস্ত বাঙালী অধ্যাপক সায়েব-সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার জন্য লেখনী চালনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশীর চিত্তাকর্ষী হতে পারে অনুমান করে কেরী ইতিহাস, পুরাণের গল্প ও দেশী-বিদেশী আখ্যানের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

রামমোহনের পূর্বে কেরীর প্রবর্তনায় প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের গদ্যরীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকে বলেন যে, রামমোহন নাকি সর্বকর্মক্ষম গদ্যরীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। এ কথা যে যথার্থ নয়, রামমোহনের পূর্বেও বাংলা গদ্যের রূপ ও রীতি মোটামুটি গড়ে উঠেছিল—এটাই প্রমাণিত হবে এই পণ্ডিত-মুন্সীদের পুস্তিকার গদ্যরীতি বিচার করলে। অবশ্য এই পণ্ডিতের দল প্রায়শই সংস্কৃত অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন—বোধ হয় সংস্কৃতজ্ঞ কেরী সায়েবের অভিপ্রায়ে। বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দের বাহুল্য কেরী পছন্দ করতেন না[৪]।

৪. ১৮১৮-২৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে কেরী যে বিরাট অভিধান (*A Dictionary of the Bengalee Language*) মুদ্রিত করেন, তার ভূমিকায় তিনি বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার মোটেই সুদৃষ্টিতে দেখেন নি।

তাঁর পূর্বে হলহেড সায়েবও *The Grammar of the Bengal Language*-এ বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দের ব্যবহার নিন্দা করেছিলেন। যাই হোক, এই পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ফারসী-নবিশ ছিলেন, তাঁরা একটু বেশিমাত্রায় আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। কারণ তখনও দেশে কাজেকর্মে, আইন-আদালতে, সরকারী মহলে ফারসী ভাষার বেশ ব্যবহার ছিল। তা হলেও কেরী বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দ ব্যবহারের রীতি বোধ হয় পরবর্তী কালে একেবারে বর্জন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সী তারিণীচরণ মিত্র হিন্দুস্থানী ও উর্দূ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই কলেজে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁর 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'-এর (১৮০৩) ভাষায় কিছু কিছু ইংরেজী ধরনের পদবিন্যাস থাকলেও (উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক গিলক্রাইস্টের প্রভাবে হয় তো) কোথাও ফারসীর আতিশয্য নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'তে ('৮০৮) মুসলমান যুগের ইতিহাস বর্ণনায় কিছু কিছু ফারসী শব্দ থাকলেও ভাষার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। রামরামের প্রথম গ্রন্থে ('রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র') আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য আছে বটে, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'য় (১৮০২) ফারসী শব্দ যথাসম্ভব বর্জিত হয়েছে। বাংলা গদ্য থেকে ফারসী-আরবী শব্দ বিতাড়নে বোধহয় কেরীর প্রভাব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করেছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় সংস্কৃত-প্রাধান্য, ফারসী-শব্দানুকূলতা অথবা চলতি শব্দ—কোনটির অধিকতর প্রাধান্য থাকা উচিত, এ নিয়ে কেরী নিশ্চয় চিন্তা করেছিলেন। তাঁর প্রবণতা ছিল সংস্কৃত ও চলতি রীতির প্রতি। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের মতো বিরাট পণ্ডিতের গম্ভীর ও ক্লাসিক ছাঁদের বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যেও বলিষ্ঠ চলতি বুলি এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে-উজ্জ্বল বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যায়। গোলোকনাথ

শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশে'-ও গ্রাম্য বাংলার কিছু কিছু সতেজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কেরী সায়েবের নামে প্রচারিত 'কথোপকথন' (১৮০১) উল্লেখযোগ্য। এটি পুরোপুরি কেরীর রচনা নয়। তিনি খুব সম্ভব এটি সঙ্কলন করেছিলেন, পণ্ডিত-মুন্সীর দলই এর কথিকাগুলি লিখেছিলেন। পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল সায়েব কর্মচারীদের বাংলা কথোপকথন শেখাবার জন্য। তাই এতে কলকাতা ও শহরতলীর ইতরভদ্র, স্ত্রীপুরুষের মুখের ভাষার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—যদিও ভাষার মূল ছাঁদটি সাধুভাষাকেই অনুসরণ করেছে। এতে হিন্দুর সমাজ, পারিবারিক জীবন, দৈনন্দিন আচার-আচরণ প্রভৃতির যে জীবন্ত বর্ণনা আছে, তা কেরীর মতো কোন বিদেশীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মনে হয় এর অধিকাংশ রচনাই মৃত্যুঞ্জয়ের। কারণ এরকম চলিত বাংলায় তীব্র তীক্ষ্ণ সংলাপ রচনা সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া আর কেউ পারতেন না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী ও কেরী সায়েবের রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথা সপ্রমাণ হবে যে, রামমোহনের পূর্বে বাংলা গদ্যরীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা চলছিল। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

১. "এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লোক স্থানে স্থানে নিয়োজিত হইল। এ সকল কথা পরস্পর পুরী মধ্যে প্রচার হইলে রাজকন্যা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত, দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না। এইরূপ চিন্তাতে দিবাগত হইলে সাঙ্গত্য-ক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।"

(১৮০১ সালে ছাপা রামরামের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র')

২. ॥ মাইয়া কন্দল ॥

ক ॥ তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়াবেড়ানী? সাঁজের কাম কাজ কিছু মনে নাই বটে?

খ ॥ কি কামের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো ?

ক ॥ আমি কামে ঠেকি নাই, তুই সকল কামে ঠেকিয়াছিস ?

খ ॥ চক্ষুখাকী, তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না, এ সকল কাজ কে করিয়াছে ?

ক ॥ তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে ? একদিন কাম করিয়া এত কইস ? আমি তোর সকল জানি।

(১৮০১ সালে মুদ্রিত কেরীর 'কথোপকথন')

৩. "অবন্তী নামে নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজাপালন, দুষ্টের দমন এইরূপে পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপগুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।"

(১৮০২ সালে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন')

৪. "তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, মাথা হইতে ভার নামা; আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল, ওগো, আমি যাইতে পারিব না—আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে—দিব্য সার গুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে।······যা, শীঘ্র রাঁধা-বাড়া কর্, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে।······ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে, পিঠা করা বুঝি বড় সোজা ? জান না, পিঠা

আঠা ; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা শীঘ্র ছাড়ে না। কখনো তো রাঁধিয়া খাও নাই, আর লোকেরদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে।"

(মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা', ১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত)

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ রচনার পূর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির নানা স্থানে অন্বয় ও সজীবতা ফুটে উঠেছিল। রামমোহনের গদ্যরীতিও এত সরস ও সরল নয়। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, রামমোহনকে গদ্যের অন্বয়বন্ধন ও বাক্রীতি নির্মাণ করতে হয় নি। তিনি সুগম ও সুপরিচ্ছন্ন গদ্যই হাতে পেয়েছিলেন।

'বেদান্তগ্রন্থে'র (১৮১৫) 'অনুষ্ঠান' পত্রে রামমোহন বলেছিলেন, "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করা উচিত হয়। যে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয়, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ১ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া যাকে। ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না।" এই উক্তি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রামমোহন যখন সকলকে হাত ধরে গদ্য পড়তে শেখাচ্ছেন, তখন তাঁর পূর্বে বোধ হয় গদ্যের পদবিন্যাসপদ্ধতি বলে কিছু ছিল না। এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। রামমোহনের পূর্ববর্তী গদ্যের যে সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাতেই দেখা যাবে যে, ১৬শ-১৮শ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা

গদ্যের পদবিন্যাসরীতি ও অন্বয় গড়ে উঠেছিল। তবে রামমোহন এ কথা কেন বলেছেন? সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় বিরামচিহ্নহীন বাংলা গদ্যকে ভাবানুসারে ছেদ দিয়ে পড়তে অসুবিধে বোধ করত। পুরাতন বাংলা গদ্যে শুধু পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া আর কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হত না। ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত 'নীতিকথা' (২য়) পুস্তিকায় সর্বপ্রথম ইংরেজী যতিচিহ্নের পুরোপুরি ব্যবহার লক্ষিত হয়। অবশ্য কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির সঙ্গে ইংরেজী ফুল স্টপও বাংলা বইয়ে নির্বিবাদে ব্যবহৃত হত। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) এই রীতিতে ছাপা হয়েছিল। তাই বোধ হয় যতিপাতহীন ছাপা বাংলা গদ্যে অনভ্যস্ত বাঙালী পাঠককে রামমোহন গদ্যছত্র পাঠের রীতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এবার আমরা রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ ও গদ্যরীতির পরিচয় নিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করব, তাঁর গদ্যরীতির মূল বৈশিষ্ট্যই-বা কি, বাংলা গদ্য বিবর্তনের ইতিহাসে তাঁর দানই-বা কতটুকু।

রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ

প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে রামমোহন আধুনিক জীবন ও সাধনাকে বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন, তা আমরা সূচনায় বলেছি। কিন্তু বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তিনি যে বিশেষভাবে স্মরণীয়, সে কথাটাই বুঝে নেওয়া প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ভাষা শিক্ষায় তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল। তিনি অল্প বয়সেই আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন, ডিগ্‌বির কাছে ইংরেজী ভাষাতেও রীতিমতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন; এমন কি শ্রীরামপুরের মার্শম্যানের সঙ্গে ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টান ধর্ম নিয়ে বিতর্কের সময় হিব্রু ভাষায় লেখা মূল বাইবেল পাঠের জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হিব্রু শিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ও বলায় তাঁর

কতদূর নিপুণতা ছিল, তা বোঝা যাবে 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' নামক সংস্কৃত পুস্তিকা থেকে। অনেক সময় তাঁকে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বিতর্ক চালাতে হয়েছে। তাঁর ইংরেজী ভাষাও অতি পরিচ্ছন্ন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ দু'খণ্ডে রামমোহনের যে ইংরেজী রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই দেখা যাবে ইংরেজী ভাষার ওপরে রাজার দক্ষতা কতটা ব্যাপক ছিল। তিনি ইংলণ্ডে থাকার সময়ে জেরিমি বেন্থাম তাঁর লেখা ইংরেজী বই পড়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "Your works are made known to me by a book in which I read a style which, but for the name of a Hindu, I should certainly have ascribed to the pen of superiorly educated and instructed Englishman."

বেন্থামের এই প্রশংসাবাণী আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, রামমোহনের ইংরেজী রচনা বাংলার চেয়েও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, পরিমাণেও বাংলা রচনার চেয়ে বেশি। আরবী-ফারসী ভাষা ও মুসলমানী কৃত্য তিনি এত ভাল জানতেন যে, নিষ্ঠাবান মুসলমান সম্প্রদায়ও তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলভি' বলে সম্মান করতেন। তিনি প্রথমে আরবী-ফারসী ভাষায় একেশ্বরবাদী ধর্ম-প্রতিপাদক একখানি পুস্তিকা লেখেন—'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' (১৮০৩-১৮০৪ সালে প্রকাশিত)। এই 'জবরদস্ত মৌলভি' ফারসী ভাষায় 'মীরাৎ-উল-আখবার' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং নানা ভাষায় তাঁর কি রকম নিপুণ অধিকার ছিল তাহা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

রামমোহনের সমস্ত রচনা অনুবাদ, ব্যাখ্যান ও বিতর্কমূলক বলে কোন গ্রন্থেই বিশিষ্ট প্রবন্ধের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে নি। অনেকটা প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের ভঙ্গীতে তিনি আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর

হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই তাঁর বাংলা পুস্তিকাগুলিতে প্রচারধর্মিতার প্রভাব বেশি। তাই 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' বাদ দিলে তাঁর অন্যান্য পুস্তিকাগুলি প্রায়ই পুরো গ্রন্থের মর্যাদা পায় নি; এগুলির আকারও খুবই ছোট, কয়েক পৃষ্ঠার বেশি নয়। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-সংবলিত এই রকম আটটি পুস্তক-পুস্তিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে:— বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৬), তলবকার উপনিষৎ (কেনোপনিষৎ ১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯)।

কারো কারো মতে রামমোহন আধুনিক কালে নতুন করে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ চর্চা শুরু করেন। তার আগে মধ্যযুগে শাস্ত্রের ধারা বলতে শুধু ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি ও দ্বৈতবাদী দর্শন আলোচনা বোঝাত। কিন্তু সমাজে বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ভাষ্য বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয় না। তাই মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে পৌরাণিক ও স্মার্ত সংস্কারের প্রাধান্য। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ শিক্ষিতমহলে জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে গীতার তত্ত্বকথা আবার সুপ্রচারিত হয় এবং ১৯শ শতকের সপ্তম দশকের পর, ব্রাহ্মসমাজ অন্তর্বিরোধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লে স্মার্ত সংস্কার হিন্দুর চেতনাকে আবার অধিকার করল, গীতার সঙ্গে বেদান্তও গৃহীত হল। রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় ছিলেন এর প্রধান প্রচারক। সেইজন্য রামমোহনকে আধুনিক কালে বাংলা দেশের বেদান্ত-উপনিষদ প্রচারক বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ১৮শ শতকের মধ্যভাগে বলদেব বিদ্যাভূষণ দশখানি উপনিষদের টীকা রচনা করেছিলেন। রামমোহনের সময়েও কলকাতার পণ্ডিতদের টোলে বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা অজ্ঞাত ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

নিজেই তাঁর চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত ও উপনিষদ পড়াতেন। রামমোহনই তার উল্লেখ করেছেন: "ঐ সকল মূল উপনিষদ আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেতে আছে।"[৫]

বাংলা দেশে রামমোহন বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন, এ কথাও ঠিক নয়। মধ্যযুগে বাংলা দেশে বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী—উভয় আলোচনাই সুপ্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবসমাজে বেদান্তের দ্বৈতবাদী আলোচনা জনপ্রিয় হলেও অবৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাচীনযুগেও অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী ১৬শ শতকের কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পরে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতবাদের টীকাকার হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি "অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন" নামক অদ্বৈততত্ত্ব-সম্পর্কীয় একখানা মৌলিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রামানন্দ বাচস্পতি ঘোরতর অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের ওপর একাধিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। রামমোহন সেই ধারার অনুবর্তন করেছেন। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেদান্ত গীতা প্রভৃতির আলোচনা কখনও হ্রাস পায় নি; তবে তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজ জ্ঞানানুশীলনে বেদান্তের চর্চা করলেও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে স্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারা অধিকতর চালিত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ মৃত্যুঞ্জয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজীনবিশ না হলেও অনেক বিষয়ে আশ্চর্য উদারতার পরিচয়

৫ 'কবিতাকারের সহিত বিচার'

দিয়েছেন।[৬] তিনি বেদান্ত ও উপনিষদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হলেও রামমোহনের 'বেদান্তসারে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) লেখেন এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্রহ্মকে সগুণ ও সোপাধিক ভাবে, বা নানা নামরূপের মধ্য দিয়ে উপাসনা করলে হানি হয় না। তাঁর উক্তি: "অতএব যে যাহাতে যেকোন বিহিত ও যেকোন জ্ঞানে যাহাকে উপাসনা করে, তাহারা সকলেই ঐ এক ঈশ্বরের উপাসনা করে।"

রামমোহন 'বেদান্তগ্রন্থে' (১৮১৫) বেদান্তের সূত্রগুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে নিষ্কল ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করেন এবং 'বেদান্তসারে' (১৮১৬) উক্ত আলোচনাকে আরও সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ব্রহ্মের সগুণ উপাসনা, বিশেষতঃ পৌরাণিক দেববাদকে আক্রমণ করেন—অবশ্য মার্জিত ভাষায়। এর ফলে তাঁকে অনেকের বিরাগ-ভাজন হতে হয়েছিল—হওয়াই স্বাভাবিক। তখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হত বটে, কিন্তু দেশাচারে পৌরাণিক দেববাদ স্বীকৃত হয়ে আসছিল। ঐ পণ্ডিতেরা, যাঁরা বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন, তাঁরা ঘরের মধ্যে পৌরাণিক বহুদেববাদ মেনে চলতেন। তাঁরা মনে করতেন, বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়াবাদ বুদ্ধির ব্যাপার, এবং মুষ্টিমেয় তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যক্তিগত অনুশীলনের বস্তু,—তার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতত্ত্বের কোন বিরোধ নেই। ব্রহ্মই নানা নামরূপের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছেন। এই মত মৃত্যুঞ্জয়ের উক্তিতেই সপ্রমাণিত হবে: "অচিন্ত্যানন্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, তিনি

৬. মৃত্যুঞ্জয় সেকেলে পণ্ডিতী আদর্শে বাস করলেও সতীদাহপ্রথা আদৌ সমর্থন করেন নি। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলেও বিলেতে গিয়ে রাম-মোহন সতীদাহ ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয়ের মতকে প্রামাণিক হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন। (পরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

স্বশক্তিপ্রাধান্য-বিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ অষ্টভুজ দশভুজাদি রূপেতে ধ্যেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্য হন, ও স্বমাত্রপ্রাধান্য-বিবক্ষাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রেন্দ্রাদি নানা পুংদেবরূপেতে উপাস্য হন।" ('বেদান্তচন্দ্রিকা')

রামমোহন বেদান্তের একেশ্বরবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করলেও 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—ব্রহ্মবাদের এই তত্ত্বটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। জগতের যে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই, অতএব প্রাতিভাসিক জগৎচেতনা খপুষ্পের মতো অলীক—রামমোহনের মতো বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মানুষ একথা মানতে পারতেন না। এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। যে-রামমোহন বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে পরমোৎসাহী, তিনিই আবার বেদান্তের মায়াবাদকে অস্বীকার করে লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন, "Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta : in what manner is the soul absorbed in the Deity ? What relation does it bear to the Divine Essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore, the sooner we escape from them and leave the world the better." সাধারণ বৈদান্তিকের সঙ্গে রামমোহনের এইখানে মৌলিক পার্থক্য। তিনি যে বলেছিলেন, "I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not well

calculated to promote their political interest."- এতে তাঁর মত ও আদর্শ স্পষ্ট হয়েছে। সে যাই হোক, তাঁর উপনিষদের অনুবাদের অনেকটাই সাধারণ শিক্ষিতের পক্ষে সহজবোধ্য হয়েছে, তা স্বীকার করতে হবে। রামমোহনের অনুবাদ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তাঁর ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষিত হয় নি, এতে লালিত্যের অভাব আছে। কথাটা অযৌক্তিক নয়। এর কারণ তিনি ভাষা পরিমার্জনের বিশেষ অবকাশ পান নি; অনুবাদকে পুরোপুরি মূলানুগ করার জন্যই এই ভাষাতে খানিকটা জড়তা এসে গেছে। সেটুকু স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যানে বাংলা গদ্যকে নিয়োগ করেছিলেন বলেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটা বড় দিক খুলে গিয়েছে।

এ ছাড়া রামমোহনের কিছু বিতর্কমূলক রচনা আছে। সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি পুরাতনপন্থী পণ্ডিতসমাজের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন; দেশাচারের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে সাধারণ লোকেরও পুরোপুরি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে নি। তাঁর বিতর্ক-মূলক ও বিচার-সংক্রান্ত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (১৮১৮), ঐ দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ (১৮২১), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২), পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ (১৮২৩), পথ্যপ্রদান (১৮২৩), কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার (১৮২৩), সহমরণ বিষয় (১৮২৯)। বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব, বৈষ্ণব দ্বৈতবাদ ও সহমরণ—রামমোহনকে এই তিন ধরনের বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তার মধ্যে বেদান্ত ও ভক্তিদর্শন নিয়ে মতবিরোধ প্রধানতঃ পণ্ডিত-

মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সহমরণ-বিষয়ক বিতর্ক জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর কৌতূহল, কোথাও-বা প্রতিকূলতা সঞ্চার করেছিল। এই পুস্তিকাগুলি প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত হয়েছিল, কাজেই রচনার মধ্যে সাহিত্যগুণ ও পারিপাট্যের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। তবু এই সমস্ত আলোচনায় তিনি যে রকম সংযম ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

রামমোহনের প্রতিপক্ষেরা তাঁকে অনেক সময়ে ইতর ভাষায় কটূকাটব্য করেছেন, কিন্তু তিনি বিতর্কে আক্রমণাত্মক বা ঈর্ষা-প্রণোদিত তীব্র বাক্য ব্যবহার করেন নি। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো পণ্ডিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও বিতর্কের সময়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর 'পাষণ্ডপীড়নে' (১৮২৩) রুচির মুখ রক্ষা করাও প্রয়োজন বোধ করেন নি। মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্তচন্দ্রিকায়' রামমোহনকে "বেদান্তবৃষভ", "অগ্রাহ্য নামা-অমুক" ইত্যাদি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন, শাস্ত্রবিচারে অনুচিত পরিহাসেরও সাহায্য নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছেন, "পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়।" কাশীনাথ রামমোহনকে আরও তীব্র জ্বালাকর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। রামমোহন এই সমস্ত উত্তেজক বিতর্কের উত্তরে মাত্র দু-এক বার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ভক্তিবাদের কোন দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না। সেই জন্য প্রতিপক্ষ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী হলে তিনি ঐ মতের খোঁটা দিয়ে তাঁদের একটু সাম্প্রদায়িকভাবে আক্রমণ করতেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বৈষ্ণব মতকে তিনি ব্যঙ্গ করে 'পথ্যপ্রদানে' লিখেছিলেন, "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত যাঁহার শব্দব্রহ্ম, তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ

যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"

উদ্দেশ্যমূলক ও বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকা বাদ দিলে রামমোহন বিশুদ্ধ সাহিত্যধর্মী বা প্রবন্ধনিবন্ধ লিখবার অবকাশ পান নি। কলকাতায় আসার পর তাঁকে দিবারাত্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে লিপিযুদ্ধ করতে হয়েছে এবং সাময়িক পত্র সম্পাদনাও তাঁর অনেকটা সময় নিয়েছে।[৭] কাজেই ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গিমাকে পরিশীলিত করবার তাঁর সময়ই ছিল না। তাঁর প্রতিভা ও কর্মোদ্যম শুধু প্রাথমিক কাজে ব্যয়িত হয়ে গেছে; সেই জন্য তাঁর কাছ থেকে বাংলা গদ্যসাহিত্য যতটা উপকৃত হতে পারত, ততটা পারে নি। গণ্ডকী শিলার দ্বারা পেষণকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয়।

তাঁর বিচারবিতর্ক, প্রচারপুস্তিকা, ব্যাকরণ, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি বাদ দিলেও একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে কিছু কিছু সাহিত্যগুণ লক্ষ্য করা যাবে। 'পাদরি ও শিষ্যসম্বাদ' (১৮২৩) কথিকাটিতে "এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীন দেশস্থ শিষ্য ইঁহারদের পরস্পর কথোপকথন"-এর কাল্পনিক সংলাপের মধ্য দিয়ে ত্রিত্ববাদী (Trinitarian) খ্রীস্টান মতের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রামমোহন নিজে খ্রীস্টান ধর্মকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর বন্ধু ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারী জন্ ডিগ্‌বিকে একবার লিখেছিলেন, "I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any other which have come to my knowledge." কিন্তু তিনি খ্রীস্টান ধর্মের

৭. 'মীরাৎ-উল-আখবর' ও 'সম্বাদকৌমুদী'।

যুক্তিহীন আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করতেন না, বিশেষতঃ ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টানদের তিনি পৌত্তলিক হিন্দুদের সমতুল্য মনে করতেন। এই 'পাদরি ও শিষ্যসম্বাদে' মৃদু পরিহাসের সাহায্যে তিনি খ্রীস্টান রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এক খ্রীস্টান পাদরি তাঁর তিনটি চৈনিক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে ভাই, ঈশ্বর এক, কি অনেক?" তাদের একজন বলল, "ঈশ্বর তিন," আর একজন—"ঈশ্বর দুই," এবং শেষের জন বলল, "ঈশ্বর নাই।" পাদরি এই উত্তরে বিব্রত হয়ে বোঝবার চেষ্টা করলেন যে, ঈশ্বর তিনও নন, দুই-ও নন—তিনি এক। তখন প্রথম শিষ্য বলল, "আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোষ্ট অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনা মতে এক, এক, এক—অবশ্য তিন হয়।" দ্বিতীয় শিষ্য বলল, তিন ঈশ্বরের মধ্যে "পশ্চিমদেশের কোন এক গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন—ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।" তৃতীয় শিষ্য বলেছিল, "ঈশ্বর নাই"—সে তার যুক্তি বিশ্লেষণ করে বলল, "পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেক অন্য ছিলেন না, এবং ঐ খ্রীস্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন; কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?" এখানে রামমোহন খ্রীস্টান মতের অসঙ্গতি ও অযুক্তিকে ব্যঙ্গের দ্বারা হাস্যাস্পদ করেছেন। এই ছোট রচনাটিতে বাস্তবিক সাহিত্যগুণ সঞ্চারিত হয়েছে।

যাকে রসসাহিত্য বলে, এবং পরস্পরসমন্বিত চিন্তামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বলে, রামমোহন সেরকম বিশেষ কিছু লিখবার সুযোগ পান নি; কাজেই তাঁর গদ্যরচনা খুবই সীমাবদ্ধ ও বৈচিত্র্যহীন। তাঁর অধিকাংশ

লেখাই প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতো পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বাদানুবাদের ধারাক্রমে বিন্যস্ত। এ ধরনের গদ্যে বিতর্কের কাজ চলতে পারে, এমন কি বিবৃতির কাজও আংশিক ভাবে সমাধা হতে পারে; কিন্তু সৃষ্টিশীল কোন কিছু রচনা সম্ভব নয়। রামমোহন সমাজ, ধর্ম নীতির প্রয়োজনে কলম ধরেছিলেন, রসসাহিত্য সৃষ্টি, বা নিঃস্পৃহ জ্ঞানপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য তিনি polemic লেখকের প্রথম সারিতে বিরাজ করলেও সাহিত্যের খাসদরবারে বিশেষ কোন স্থান দাবি করেন নি। ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে তার সম্ভাবনাও ছিল না। তখন গদ্যকে যুক্তির শানপাথরে ঘষে ঘষে ধারালো করে তোলা হচ্ছিল, তখনও তাকে সাহিত্যকর্মে নিয়োগের কথা রামমোহন ততটা ভেবে দেখেন নি, বা প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, রামমোহনের সমকালের কোন কোন লেখকের (যেমন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার) রচনায় সাহিত্যরস সঞ্চারিত হয়েছিল। রামমোহনের প্রতিপক্ষগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের রচনায় অধিকতর সাহিত্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়, যা রামমোহনের লেখায় খুব সুলভ নয়।

রামমোহনের গদ্যরীতি

রামমোহনের গদ্যরীতি নিয়ে নানা বিতর্ক ও বিরুদ্ধ মত চলে আসছে। কেউ কেউ তাঁকে সাধু ও পরিচ্ছন্ন গদ্যের জনক বলে সম্মান করেন, কেউ আবার এ মত মানতে চান না। তাঁদের মতে রামমোহনের গদ্যরীতি প্রায়শই জড়তাগ্রস্ত। যথার্থ বাংলা গদ্যের সঙ্গে তাঁর গদ্যের বিশেষ পার্থক্য আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, রামমোহন বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেন নি, মিসনারী সম্প্রদায় বা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরাও বাংলা গদ্যের জন্মদাতা নন। তাঁদের পূর্বে

প্রায় তিন শ' বছর ধরে পুঁথিপত্রে ও দৈনন্দিন ব্যবহারে যে বাংলা গদ্য চলে আসছিল, তার সঙ্গে আধুনিক বাংলা গদ্যের পদবিন্যাস ও অন্বয়গত খুব একটা বিসদৃশ পার্থক্য নেই। স্বচ্ছন্দতা ও বহমানতা রামমোহনের গদ্যের প্রধান লক্ষণ। ভাষার মধ্যে মার্জিত মনোভাব ও সংযত যুক্তিবিন্যাস তাঁকে শ্রেষ্ঠ polemic লেখকে পরিণত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কেউ কেউ (যেমন মৃত্যুঞ্জয়) সাহিত্যের গদ্য লিখেছেন বটে, কিন্তু বিচার-বিতর্কের জন্য যে সংযত ও ভারবহ গদ্যের প্রয়োজন—রামমোহন সেই গদ্যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই ধরনের সংযত পরিচ্ছন্ন গদ্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

১. "দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদের মধ্যে, মানুষদের মধ্যে যে-কেহ ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন, তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে, সে দেবতার পূজ্য হয়েন—এমন শ্রুতিতে কহিতেছেন।" —'বেদান্তসার'

২. "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে, স্থান-মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে ; এব সূপকারের কর্ম বিনাবেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন২ নিয়মিত কালে করে……ঐ রন্ধন ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি কি কি

তিরস্কার না করেন। এ সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে…।"

—'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটিতে আধুনিক গদ্যের আভাস ফুটে উঠেছে; এখানে পদান্বয় বা শব্দযোজনায় বিশেষ কোন উৎকট আতিশয্য দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য তাঁর রচনার অনেক স্থানে 'যেঁহ', 'তেঁহ' 'করিবাতে', 'হইবাতে,' 'এহার,' 'তাহাদের' প্রভৃতি পুরাতন ধরনের বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যাবে। রামমোহনের সমসাময়িক কোন কোন লেখক এই রীতির অনেকটা বর্জন করেছিলেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের গদ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। গুপ্তকবি রামমোহনের গদ্যের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "দেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।" রামমোহন নব্যন্যায়ের শেষ উত্তরাধিকারী। তাই তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই ন্যায়ের ভাষার মতো যুক্তি-প্রতিযুক্তি স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। এ ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র তুলনায় "জলের ন্যায় সহজ"—তা ঠিক।[৮]

৮. ঈশ্বর গুপ্তের এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে' বলেছেন যে, তিনি রামমোহনের গদ্যে যথাযোগ্য যতিচিহ্ন দিয়ে দেখেছেন, "সে লেখা জলবত্তরল হয়েছে।" আবার তিনিই ১৩২২ সনে

মৃত্যুঞ্জয় থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

"আর শুন, উপাসনাপরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ কখন হয় না। নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য যে লৌকিক রাজাদের উপাসনা, তাহাই বিবেচনা করিয়া বুঝ। রাজাদির যে উপাসনা, সে কি তদীয় শরীর রূপগুণাদি সেবা স্তবাদি ব্যতিরেকে হয়? রাজার যে শরীর রূপগুণাদি সেই কি রাজা? কিম্বা তাহা হইতে অতিরিক্ত চেতনারূপী পুরুষ রাজা? যদি বল যে, শরীরাদি সেই রাজা, তবে কি মৃত রাজশরীর দাহতে রাজার দ্রোহ হয়? তাহা নয়।"

('বেদান্তচন্দ্রিকা')

রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থে'র তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের এ ভাষা কিছু গুরুভার, দার্শনিক পরিভাষায় কিছু কণ্টকিত, এবং অনধিকারীর কাছে এ ভাষা ও বক্তব্য যে হস্তামলকবৎ নয় তা অবশ্য স্বীকার্য। রামমোহন গুহাহিত শাস্ত্রকথাকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের এই মেদস্ফীত ভাষাকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন :

"সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে, সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয়। অতএব প্রার্থনা এই যে, দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য (মৃত্যুঞ্জয়)

উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে বলেছিলেন, "এ গদ্য, আমরা যাকে modern prose বলি, তাহা নয়।"

লিখেন, যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।"

মৃত্যুঞ্জয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। মার্শম্যান তাঁকে ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতসুলভ রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। গুহ্য শাস্ত্রকথাকে তিনি দেশভাষায় প্রকাশ করতে পরাঙ্‌মুখ ছিলেন; কারণ তা অদীক্ষিত ও অনুপযুক্তের হাতে পড়তে পারে। তাতে শাস্ত্রের অমর্যাদাই হবে। রামমোহন যখন সরল বাংলায় বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচার করছিলেন, তখন মৃত্যুঞ্জয় এই অনাচারে শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনের পরাঙ্‌মুখ হন, তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্‌মুখ হন।" অর্থাৎ ভট্টাচার্য শাস্ত্রাদিকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের খুঙ্গি-পুঁথির মধ্যে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলেন। রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদগোপ্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করছেন দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নিজেই 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় দিব্যি সরল বাংলায় ব্রহ্মতত্ত্ব ও মোক্ষপদ ব্যাখ্যা করেছেন। সে যাই হোক, বোধগম্যতার দিক থেকে বিচার করলে রামমোহনের গদ্য খুবই প্রশংসনীয়। তিনি সংস্কৃতগন্ধী জটিল শব্দবিন্যাস, সমাস-সন্ধির সমারোহ, অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দাড়ম্বর প্রভৃতি পণ্ডিতম্মন্যতা যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। তাতে সরসতা না থাকলেও সরলতা আছে।

কিন্তু আর একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, রামমোহনের গদ্য বোধগম্যতার দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও এর অন্বয়বন্ধন, শব্দযোজনা ও বাগ্‌বিন্যাস কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট ও স্খলদ্‌গতি। বরং

মৃত্যুঞ্জয়ের বাক্‌রীতি গুরুভার হলেও যথার্থ গদ্য হয়ে উঠেছে :

"বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয়, যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে, এবং কি খৃষ্টান, কি অখৃষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না—যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় না।"[৯]

রামমোহনের এই পংক্তিবিন্যাস কি স্বাভাবিক? এর মধ্য থেকে ন্যায়শাস্ত্রী রামমোহন উঁকি দিচ্ছেন। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তার যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না: "কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের রচনাপদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"[১০] রামমোহনের বিতর্কমূলক রচনা, বেদান্তগ্রন্থাদির টীকাভাষ্য ও অনুবাদের ভাষার মধ্যে এই ধরনের অনভ্যস্ততা ও জড়তা লক্ষ্য করা যাবে। তাঁকে যাঁরা "The pioneer of literary prose"[১১] বলে সম্মান দেন, তাঁরা যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে এই দিকটি ভেবে দেখেন না।

অবশ্য রামমোহনের যে রচনাগুলি কিঞ্চিৎ বিবৃতিমূলক, তার ভাষায় এই শাস্ত্রঘেঁষা পদবিন্যাসের ত্রুটি অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, যেমন—

৯. 'ব্রাহ্মণসেবধি'

১০. বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ, ১ম

১১. J. C. Ghosh—*Bengali Literature* (Oxford)

'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বা বিতণ্ডামূলক কিছু কিছু রচনা। 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তকের সম্বাদ', 'পথ্যপ্রদান'—এগুলির ভাষায় দ্বন্দ্বের আভাস, প্রতিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করবার এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে বলে রামমোহন শাস্ত্রমার্গের অনভ্যস্ত ভাষাভঙ্গিমা এই সমস্ত রচনায় সাধ্যমতো বর্জন করেছিলেন। এই রচনাটির স্বচ্ছতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় :

"প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয় ; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?" ('প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ')

এ ভাষাকে কিন্তু 'modern prose' বলতেই হবে। রামমোহনের শাস্ত্র-মার্গীয় রীতি বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত হয় নি বটে, কিন্তু এ ভাষা অধুনা-প্রচলিত রীতি থেকে কি পৃথক ? বাংলা গদ্যের ব্যবহার ১৬শ শতক থেকে চলে আসছে। রামমোহন এখানে সেই রীতিই অনুসরণ করেছেন। এই স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও সরল রীতি তাঁর সৃষ্টি নয়, তাঁর আগে থেকেই এর অনুশীলন চলে আসছে। তাঁর সময়েও অনেকে এই রীতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি', রামরাম বসুর 'লিপিমালা', কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন', গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (প্রমথনাথ শর্মা) 'নববাবুবিলাস' 'নববিবিলাস' ইত্যাদি পুস্তক-পুস্তিকাগুলি এই সাধুরীতিতে রচিত। এই সাধু গদ্যরীতি তৎকালীন যাবতীয় সাময়িক পত্রে (বেঙ্গল গেজেটি,

দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ, সম্বাদকৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা, বঙ্গদূত প্রভৃতি) ব্যবহৃত হত। তথাকথিত 'ইয়ংবেঙ্গল'গণ যে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশ করেছিলেন তাতেও এই সাধুরীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এই রীতিই স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর যখন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ করলেন, তখন তিনিও এই ভাষা অনুসরণ করেছিলেন। এই বিবৃতিমূলক গদ্যকে রসসমন্বিত করে বিদ্যাসাগর যুক্তিতর্কের সঙ্গে সরসতা, লালিত্য ও শ্রুতিসৌকর্য সৃষ্টি করে বাংলা গদ্যের যে রীতি নির্ধারণ করলেন, পরবর্তী কালে এক শতাব্দী ধরে বাংলা গদ্য সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করে চলেছে।

রামমোহনের যুগে সাধুরীতির সঙ্গে মাঝে মাঝে কেউ কেউ চলিত সংলাপের বাক্‌রীতি ও কিছু কিছু গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেরীর 'কথোপকথনে' কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত চলতি শব্দের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।। মৃত্যুঞ্জয় এই ধরনের ভাষায় আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন।[১২] তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় চলতি গ্রাম্য শব্দ, একটু অমার্জিত ও রুচিকটু হলেও, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়ও গ্রাম্য রসিকতাকে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যের পংক্তিভোজে সম্মানের আসন দিয়েছেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র (১৮২২) ভাষাতেও এই ধরনের সহজ সংলাপের (কিন্তু মার্জিত) রীতি অনুসৃত হয়েছে। সমসাময়িক সংবাদপত্রে জনরুচির অনুরোধে রসিকতাপূর্ণ তরল পরিহাস-সংবলিত হালকা রীতি ব্যবহৃত হত। কিন্তু রামমোহনের ভাষায় অনুচিত লঘু পরিহাস নেই বললেই চলে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করে লিখেছিলেন 'পাষণ্ডপীড়ন'। এঁর রুচি

১২. পরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

নিন্দনীয়, কিন্তু তাবার ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝ বিশেষভাবে উপভোগ্য। রামমোহন সেই কদর্য গালির জবাবে লিখেছিলেন—'পথ্যপ্রদান'। এতে কুরুচিপূর্ণ নিন্দা-বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই, এতে আছে প্রতিপক্ষের কুযুক্তি দেখিয়ে তাঁকে স্বমতে আনার চেষ্টা। তাই তাঁর ভাষা সংযত, স্থির—কিন্তু স্বাভাবিক উত্তাপবর্জিত। রামমোহন মদ্যমাংস সেবন সমর্থন করলে কাশীনাথ তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বললেন :

> "এ সকল কথা শুনিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ভালে, জিজ্ঞাসা করি, যদি এ সকল গর্হিত কর্ম্ম করিলেই লোকে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়িডোম চাঁড়ালমুচি—ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে? ইহাদিগকে কেন ব্রহ্মজ্ঞানী কহা না যায়? তাহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় সকল (রামমোহন ও তাঁর অনুচরবর্গ) হইতেও এই সকল কর্ম্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না।" (পাষণ্ডপীড়ন)

রামমোহন এর প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন যে, নীচ যদি দুর্বাক্য বলে, তা হলে সুজন কি তাতে দুঃখ পায়?—বরং তাতে হাসে। কাক-ভেক-গর্দভের চীৎকারে কেউ কি নগর ত্যাগ করে যায়? এ ব্যঙ্গ শালীনতাকে কোথাও লঙ্ঘন করে নি, অথচ ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তবে কাশীনাথের ব্যঙ্গের অম্লাক্ত তীব্রতা রামমোহনে অনুপস্থিত।

রামমোহনের গদ্যরীতি সংস্কৃত টীকাভাষ্যের খানিকটা ধার ঘেঁষে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং সেইজন্য এ গদ্য স্বচ্ছন্দরীতির বিরোধী। আমাদের মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র (১৮০৮) ভাষাতে বাংলা গদ্যের সেই প্রাণবস্তু ও রীতি যথার্থ অনুসৃত হয়েছে, যা দীর্ঘকাল ধরে বাংলা দেশে অনুশীলিত হয়ে আসছিল এবং যা পরবর্তী কালেও নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। রামমোহন যেখানে সেই রীতি অনুসরণ করেছেন, সেখানে ভাষা

অনেকটা স্বচ্ছন্দচারী হয়েছে। সুতরাং যাঁরা বলে থাকেন যে, রামমোহন সাধু বাংলা গদ্যের স্রষ্টা, তাঁদের এ মন্তব্য যে পুরোপুরি যুক্তিসহ নয়, তা আমরা ইতিপূর্বে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি। রামমোহন গদ্যকে বিতর্কবিচারে প্রয়োগ করে একটা নতুন দিক খুলে দেবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর ভাষা থেকে পুরনো সাক্‌রীতি ও সংস্কৃতানুসারিতা সম্পূর্ণরূপে যায় নি বলে এ রীতি বাংলা গদ্যে গৃহীত হয় নি। পরবর্তী কালে, দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ডাফ্ সাহেবের *India and India's Mission* গ্রন্থকে আক্রমণ করে ইংরেজীতে 'Vedantic Doctrines Vindicated' প্রবন্ধ লিখে এবং বাংলায় তার অনুবাদ করে ডাফের বেদান্ত-বিরোধী কুৎসাকে ছিন্নভিন্ন করেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলেছিল এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে সমর্থন করে এবং বহুবিবাহের বিপক্ষে যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন তাতেও এই বিতর্ক ও বিচারের রীতি অবলম্বিত হয়েছিল; কিন্তু সে ভাষা যথার্থ বাংলা গদ্যরীতিকেই অনুসরণ করেছে, তাতে সংস্কৃত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ভাষারীতির প্রভাব নেই। কিন্তু রামমোহনের ভাষার অনত্যাস্ত ছাঁদ থেকে পুরাতন ধরনের বচনবিন্যাস পুরোপুরি অপসৃত হয় নি, তা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে।

রামমোহন আধুনিক প্রাচ্যের প্রথম জাগ্রত মানুষ। জ্ঞানবাদ, যুক্তি, প্রয়োগবিজ্ঞান, উপযোগবাদ, প্রত্যভিজ্ঞামূলক আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি আধুনিক পূর্বহেতুকে অবলম্বন করে তিনি নবজীবনের নান্দী পাঠ করেছিলেন এবং প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতিকে যুগমানসের সঙ্গে অন্বিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। বাংলা গদ্য তাঁর হাতে আয়ুধে পরিণত হয়েছিল। সুললিত গদ্য তাঁর ততটা আয়ত্তে না এলেও গুরুতর তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের সংযত

ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এই জন্য তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করবেন।

অনুলেখ : মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন ও বেদান্ত

আমার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে শ্রীযুক্ত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮) পত্রে রামমোহন ও বেদান্ত সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। এখানে তাঁর মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

এই প্রবন্ধে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন এ দেশে এমন কিছু অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়। ষোড়শ শতক থেকেই বাংলার শিষ্ট সমাজে বেদান্তের অনুশীলন চলে আসছে। চৈতন্যদেবের প্রধান ভক্তদের অনেকেই প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে তাঁরা চৈতন্যপ্রভাবে দ্বৈতবাদী ভক্ত হয়েছিলেন। অদ্বৈত আচার্য, বাসুদেব ভট্টাচার্য (সার্বভৌম), স্বরূপ-দামোদর—সকলেই চৈতন্য-সংস্পর্শে আসবার পূর্বে অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। এ ছাড়া মধুসূদন সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, রামানন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদীরা ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং রামমোহন পূর্ব-ধারারই অনুবর্তন করেছেন—অবশ্য দেশভাষায়, দেবভাষায় নয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রথমতঃ রামমোহনের পূর্ববর্তী বাঙালী বৈদান্তিকেরা কেউ মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের সামনে বেদান্তের শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেন নি। ফলে সমাজের সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেকেই বেদান্ত কাকে বলে জানত না।" কিন্তু একটু সন্ধান করলেই দেখা যাবে, রামমোহনের পূর্বেও দেশের শিক্ষিত সমাজে বেদান্ত চর্চার রীতিমতো রেওয়াজ ছিল। চৈতন্যযুগে বা তারও পূর্বে শিষ্টসমাজে বেদান্তচর্চা তো ছিলই, এমন কি, সাধারণ শিক্ষিত-সমাজও বেদান্তের

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যকে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বেদান্ত-সূত্রের ভক্তিপন্থী ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সাধারণসমাজে, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজের সর্বত্র সপ্তদশ শতকের গোড়া থেকেই বেদান্ত সুপরিচিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর রচনার নানা স্থানে বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করেছেন—যথাসাধ্য ব্যাখ্যাও করেছেন। সুতরাং রামমোহনের পূর্বে বেদান্তের মূল কথাগুলি লোকসমাজে প্রচলিত ছিল না তা নয়। তন্ত্র, পুরাণ ও বেদান্তের ছিটেফোঁটা সাধারণ সমাজে যতটা জানা সম্ভব ততটাই প্রচলিত ছিল। কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে অনক্ষর লোকসমাজে বেদান্ততত্ত্ব যে প্রচারিত হয় নি, তাও জোর করে বলা যায় না। তবে পূর্বতন বৈদান্তিক ও রামমোহনের মধ্যে একটি বড় রকমের পার্থক্য আছে যেটি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ততটা লক্ষ্য করেন নি। পূর্বতন বৈদান্তিকেরা পুরাণ ও বেদান্তকে অবিরোধে গ্রহণ করতেন। তাঁরা জানতেন যে, পৌরাণিক দেবতত্ত্ব এবং বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব—উভয়ই হিন্দুর কাছে গ্রহণযোগ্য। ধর্মাচরণে যে নিম্নাধিকারী, শুধু কাম্যকর্মেই তার অধিকার। কিন্তু যিনি ধর্ম জগতের অনেকগুলি সোপান অতিক্রম করেছেন, শুধু তিনিই বেদগোপ্য ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী। অর্থাৎ বেদান্ত পুরাণবিরোধী নয়, উভয়ের মধ্যে সহজেই সহাবস্থান চলতে পারে। রামমোহন কিন্তু পৌরাণিক মতকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে পুরাণ ও বেদান্তের মধ্যে নিত্যবিরোধ বর্তমান। বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত করেছিলেন বোধ হয় ইসলামীয় 'মুওয়াহিদ্দিন' মতের আদর্শে। বেদান্তে তিনি শুধু একেশ্বরবাদ পেয়েছিলেন। তাই বহু-দেবদেবীর-বর্ণনায় পূর্ণ পুরাণকথাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না। তাঁর মতে, পুরাণ সম্পূর্ণরূপে অতিরঞ্জিত, ভ্রান্ত দুর্নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল একেশ্বরবাদী বেদান্তই একমাত্র শরণ্য। ইতিপূর্বে

বাংলা দেশে এ ভাবে কেউ পৌরাণিক ধর্ম, আচার ও আদর্শের বিরুদ্ধে এতটা প্রতিকূলতা করেন নি। চৈতন্যদেব পুরীধামে বাসুদেব ভট্টাচার্যের (সার্বভৌম) সঙ্গে এবং কাশীধামে প্রকাশানন্দের সঙ্গে বেদান্তের ভাষ্য ও তাৎপর্য নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে শঙ্করাচার্য-ব্যাখ্যাত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ও মুমুক্ষা—উভয়কেই প্রত্যবায় বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর কাছে বেদান্তসূত্রের একমাত্র অর্থ—শুদ্ধা ভক্তি। রামমোহন কিন্তু পৌরাণিক মত ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে রফা করেন নি। তাই তদানীন্তন সমাজে তিনি এতটা তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন।

অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় আমহার্স্ট্‌কে লেখা রামমোহনের চিঠি সম্বন্ধে বলেছেন, "আসলে লর্ড আমহার্স্ট্‌কে লেখা রামমোহনের পত্রটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা, এ থেকে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মত জানবার চেষ্টা করা বৃথা। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৩) পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক, এই ছিল বড়লাট সকাশে রামমোহনের প্রার্থনা, এবং নিজের বক্তব্যকে দৃঢ় করবার জন্য রামমোহন প্রাচীন হিন্দু দর্শনের প্রায় সমস্ত বিভাগের, এমন কি বেদান্তেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি" ('সমকালীন', অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮)।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—রামমোহন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমহার্স্ট্‌কে পত্র দিয়েছিলেন, তা ঠিক বটে। কিন্তু যে-বেদান্তের ওপর রামমোহনের সমস্ত সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে আছে, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাকেও তিনি আক্রমণ করলেন—এর দ্বারা রামমোহনের চিন্তালোকে প্রচ্ছন্ন একটা সূক্ষ্ম স্ববিরোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না কি? ধর্মাচার বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন 'কাল্‌ট্‌' প্রতিষ্ঠা করতে উন্মুখ হন নি; জীবনে ও আচরণে অতিশয় তীক্ষ্ণ 'প্র্যাগম্যাটিক' রামমোহন ধর্মের

পরিবর্তন ও ঐক্যসাধনের জন্য রাজনীতি ও সমাজনীতিকেই অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন। ১৮২৮ সালে লেখা একখানা চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে, অন্ততঃ রাজনীতি ও সমাজকল্যাণের জন্যও হিন্দুর সমাজধর্মের পরিবর্তন প্রয়োজন—"It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort." পূর্বতন বেদান্তবাদী ও আধুনিক রামমোহনের মধ্যে এইখানেই প্রভেদ। রামমোহন বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা ও বেদান্ত-প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদ (বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদ এক বস্তু নয়, উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।) প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এর মূল কারণ মানুষের ভৌম জীবনের কল্যাণসাধন এবং ইহজীবনের সুখসংবিধান—পরত্র তাঁর অন্বেষার বাইরে। কাজেই বেদান্ততত্ত্ব ছিল তাঁর মস্তিষ্কজীবী সত্য, জীবনচর্যায় অত্যাবশ্যক ছিল না। তিনি বেদান্তের নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেও ধর্মচর্চার জন্য গিরিদরী-বনভূমিতে গিয়ে সুকঠোর তপশ্চর্যার প্রয়োজন বোধ করেন নি।* আবার আবেগপ্রবণ ভক্তের মতো ঈশ্বরের লীলারসে ডুবে গিয়ে মর্ত্যসত্তা বিস্মৃত হওয়াও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বেদান্ত উপনিষদের কথা পুনঃ পুনঃ বললেও তিনি শঙ্করাচার্য নন, রামানুজ-নিম্বার্ক-মধ্ব-বল্লভাচার্য নন। এক কথায় তিনি মধ্যযুগীয় সাধক ছিলেন না, প্রাচীন যুগের নিষ্কল ব্রহ্মবাদীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের মানববাদী, হিউম্যানিস্ট। তাঁর প্রধান অবলম্বন *l'uomo universale*—মানবসত্তার সমগ্রতা, বিশ্বমানবতা। (১৩৬৮)

* স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন, সে বিষয়ে 'বিবেকানন্দের বেদান্তবাদ' প্রবন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখনকার পাঠকসমাজে যে বিষয়ে কোন কৌতূহল সঞ্চারিত হয় না, কিছুকাল আগে তাই নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠেছিল। যে-গদ্য অধুনা আমাদের মনের ধাত্রী, যাতে রসসাহিত্য ও জ্ঞানসাহিত্য—উভয়ই অবলীলাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে, এক সময় তার জনকত্ব নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সাধারণভাবে যাঁরা গদ্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের জনকত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; যাঁরা আর একটু বেশী জানতেন, তাঁরা রামমোহনকে সমস্ত গৌরবের অগ্রভাগ দিতে চাইতেন। "এইরূপ জনক-বিভ্রম অথবা বহুজনকত্বের কারণ ইহাই অনুমান করা যায় যে, বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইতে আধুনিক প্রসার পর্যন্ত ইতিহাস সমগ্রভাবে এতদিন দেখা হয় নাই; খণ্ডশঃ দেখিতে গিয়া কখনও কেরী, কখনও রামরাম, কখনও রামমোহন প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।"[1] বাংলা গদ্য উনিশ শতকের অভিনব পদার্থ নয়, তা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেই জানেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাষাণচত্বরে বাংলা গদ্যের জন্ম হয় নি, বা উক্ত কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা "অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে"[2] এই গদ্যের জাতকর্ম করেন নি। অন্ততঃ ষোড়শ শতক থেকেই দৈনন্দিন কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, হিসাব-নিকাশ, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র—সব ব্যাপারেই বাংলা গদ্য চলত। তিন-চার শতকের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য খুব যে দুর্বোধ্য বা অন্বয়হীন বিশৃঙ্খল বাক্‌পুঞ্জে পরিণত হয়েছিল, তা নয়। উনিশ শতকের

১. মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
২. 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র শেষাংশ।

পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতির ওপর নির্ভর করে বাংলা গদ্যের সাধুরীতির আদল সারা দেশেই প্রচলিত ছিল। এই জন্য কিছুকাল পূর্বে বাংলা গদ্যের জনকত্ব নিয়ে যে কৌতুকজনক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আধুনিক পাঠকের কাছে হাস্যকর বলেই মনে হবে। অবশ্য নানা উপাদান বিচার করে আজ এ কথা বলতে বাধা নেই—বাংলা গদ্যের এক-জনকত্বই হোক, আর বহু-জনকত্বই হোক, এর শ্রীছাঁদ এবং সহজ অন্বয়ের যথার্থ রূপটি প্রথম ধরেছিলেন একজন সেকেলে পণ্ডিত। ইনি বিদ্যাসাগরের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ঐ মেদিনীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন, নাম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (চট্টোপাধ্যায়)।

গদ্য কেবল গদ্ ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন নয়, তারও একটা বিশেষ রূপ-রীতি আছে—যা মূলতঃ চিন্তাবাহী, যার অন্বয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করে। গদ্যের উৎপত্তি জিহ্বাগ্রে হলেও অধিষ্ঠান মস্তিষ্কে। গদ্যের সাধনা তাই দুরূহ। গদ্যকে কবিপ্রতিভার নিকষ পাথর বলা হয়েছে—কথাটি নিতান্ত অযথার্থ নয়। বুদ্ধি যেখানে মূল উপাদান, মনন যেখানে স্বভাবধর্ম, পরম্পর চিন্তাবিন্যাস যার প্রধান অবলম্বন, তাকে লেখক-প্রতিভার নিকষ পাথর বলা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা দেশের প্রথম গদ্যশিল্পী, নিকষ পাথরে অম্লান স্বর্ণরেখা।

মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয়

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে (১৭৬২—১৮১৯ খ্রীঃ অঃ) কেউ কেউ অবাঙালী এবং ওড়িয়া বলেছেন। যে-মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে আশ্চর্য প্রতিভাধর বলে বর্ণনা করেছেন, তিনিও তাঁকে 'এ নেটিভ অব্ ওরিষ্যা' বলেছেন। তাঁর পর থেকে অনেকেই এ কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। 'দি লাইফ্ অব্ উইলিয়ম কেরী' গ্রন্থের রচয়িতা জর্জ স্মিথও বলেছেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ও ওড়িয়া উভয়

ভাষাতেই অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি নাকি ওড়িয়া ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন এবং ওড়িয়া ভাষাই ছিল তাঁর মাতৃভাষা। কিন্তু এই ওড়িয়া বাইবেলের অনুবাদ মৃত্যুঞ্জয় করেন নি। ইনি হলেন পুরুষরাম নামে একজন ওড়িয়া পণ্ডিত। ইনি ওড়িয়া ভাষায় 'নিউ টেস্টামেন্ট' অনুবাদ করলে কেরী সাহেব মূল গ্রীকের সঙ্গে এর তুলনা করে সংশোধন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ১৮০৫ সালের ২০এ সেপ্টেম্বরের কার্যবিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মৃত্যুঞ্জয় ওড়িয়া নন, তিনি মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তখন মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি। এই ভুলটি প্রথমে ধরিয়ে দেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। ১২৯৫ সালের 'নবজীবনে'র মাঘ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, "১৭৬২-৬৩ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবং মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল; সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে একভাগ বাঙলা, একভাগ হিন্দী, একভাগ উড়িয়া এইরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। এই কারণে মার্শম্যান সাহেব মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িষ্যাজাত বলিয়াছেন, এবং অদ্যাপি অনেকে মৃত্যুঞ্জয়কে উড়িয়া বলিয়া জানেন। বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, খণের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান। মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম মেদিনীপুর, বিদ্যাশিক্ষা নাটোরের সভাপণ্ডিতের নিকটে, নাটোরে।" অক্ষয়চন্দ্র এ সমস্ত সংবাদ পেয়েছিলেন কলিকাতানিবাসী বিহারীলাল চট্টো-পাধ্যায়ের নিকট। বিহারীলাল মৃত্যুঞ্জয়ের পৌত্র। মৃত্যুঞ্জয় মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন বলে ওড়িয়াও জানতেন। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময় কলকাতায় কেটেছে।

১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন—বিলেত থেকে আমদানি করা আহেলা সিভিলিয়ানদের এ দেশের ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেবার জন্যই কলেজের

স্থাপনা। এর সংস্কৃত-বাংলা-মারাঠী বিভাগের ভার পেয়েছিলেন শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদ্রী উইলিয়ম কেরী। সহকারীদের বেছে নেবার ভারও তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তখন কলকাতায় মৃত্যুঞ্জয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮০১ সালে মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৮০৫ সালে সংস্কৃত বিভাগে আর একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। কেরী তাঁকে ঐ পদে নিয়োগ করার জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর নাম সুপারিশ করে লেখেন :

"I take the liberty to recommend Mritoonjoya Vidyalunkuru who till the present time has been first Pandit in the Bengalee language, to be the Sanskrit Pandit under the new arrangement. He is one of the best Sanskrit scholars with whom I am acquainted". (*Proceedings of the College of Fort William*)

সে যুগে এবং তার পরেও তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা বাংলা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কেরী, মার্শম্যান দু'জনেই তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন। মার্শম্যান তাঁকে অতিশয় ভক্তি করতেন। তাঁকে ডঃ জনসনের সঙ্গে তুলনা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

"He bore a strong resemblance to our great lexicographer, not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanskrit classics was unrivalled, and his Bengalee compositon has never been surpassed for ease,

simplicity and vigour". (*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I*).

সে যুগে যাঁরাই মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরাই তাঁর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও উদারতার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর যেমন বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গ সমাজে অতিশয় মান্য হয়েছিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ও তাঁর সময়ে কিয়দংশে সেই রকম খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি আদৌ ইংরেজী জানতেন না, এবং পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু ইংরেজী না জানলেও গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশীয় পাণ্ডিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা মৃত্যুঞ্জয়কে উপস্থাপিত করতে পারি। বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের মতো ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকার থাকলে আমরা রামমোহনের পূর্বেই একজন প্রতিভাধর বাঙালীকে বাংলা সাহিত্যে ও সমাজের প্রধান নেতৃরূপে পেতাম।

১৮০১ সাল থেকে ১৮১৬ সাল পর্যন্ত তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮১৬ সালের দিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জজপণ্ডিতের পদে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অতঃপর মৃত্যুঞ্জয় কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টের জজপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। সুপ্রিম কোর্টে তখন দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমা নিত্য লেগে থাকত। বিচারপতিরা বিদেশী—এ দেশের আচার, রীতিনীতি ও ব্যবহার-বিদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তাঁদের সাহায্য করবার জন্য ভারতীয় ব্যবহার-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী দেশীয় পণ্ডিত নিযুক্ত হতেন। তাঁকে বলা হত জজপণ্ডিত। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে জজপণ্ডিতের পদ লাভ করেন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার ফ্রান্সিস্ ম্যাকনটেনের অধীনে কাজ করে নিজের যোগ্যতা সুপ্রমাণিত করেন। ১৮১৬ সালের শেষাংশ থেকে ১৮১৮

সালের শেষের দিন পর্যন্ত—মোট দু-বছর তিনি এই পদে পরম গৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দু-বছরে তিনি এই ধর্মাধিকরণে বহু ধনীকে এ্যাকুইটি মামলায় সর্বস্বান্ত হতে দেখেছিলেন। সে যুগে "সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল। বিশেষতঃ সুপ্রিম কোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে উহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইতেন, আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইতেন না" (সমাচার দর্পণ, ১৮২৯, আগস্ট)। মামলাপ্রিয় বাঙালীর এ সুনাম বোধ হয় এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। মৃত্যুঞ্জয় এই দু-বছরে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ধনিসমাজ সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি বলতেন, "ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিম কোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই।" প্রবীণ বয়সে তিনি কলকাতার নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোগসভায় তিনি অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটিরও তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮১৮ সালের শেষ ভাগে চার মাসের ছুটি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় তীর্থদর্শনমানসে গয়া কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ দর্শনের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় সাতান্ন বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

মৃত্যুঞ্জয় যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টের জজপণ্ডিত হয়েছিলেন, তখনই রামমোহন কলকাতায় এসে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। রামমোহনের বেদান্ত অনুবাদ ও প্রচার মৃত্যুঞ্জয় ভালো চোখে দেখেন নি। কাজেই উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে মনান্তর ঘটেছিল। অবশ্য রামমোহন 'ভট্টাচার্যে'র অনেক মত না মানলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই পুরাতনপন্থী পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং

তাঁর কোন কোন মত মেনেও নিয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় যে নিজের বাসায় ছাত্র রেখে বেদান্তাদি পড়াতেন, এ খবর রামমোহনই দিয়েছেন ('কবিতাকারের সহিত বিচার' দ্রষ্টব্য)। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিরোধকল্পে ১৮২৯ সালে গৃহীত সরকারী প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে পুস্তিকা লেখেন, তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের সতীদাহ-নিরোধক অভিমতকে নিজপক্ষের যুক্তি হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন। সে যুগে মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' তাঁকে "পাণ্ডিত্য বিষয়ে অদ্বিতীয়" আখ্যা দিয়েছিলেন। ইংরেজী-বাংলা অভিধানের প্রসিদ্ধ সঙ্কলক দেওয়ান রামকমল সেন তাঁকে বলেছিলেন "দি মোস্ট এমিনেন্ট" এবং জন ক্লার্ক মার্শম্যান বলেছিলেন "কলোসাস্ অব লিটারেচার।" —এ কথা কিছু মাত্র অত্যুক্তি নয়। মৃত্যুঞ্জয় রাম-মোহনের ছায়াতলে পড়ে গেছেন ; উপরন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতায় রামমোহনপন্থী, হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-শিষ্য 'ইয়ংবেঙ্গল'গণ এবং ধর্মসভার রাধাকান্ত দেববাহাদুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যপার নিয়ে যে মতানৈক্যের ধূলিঝড় উঠেছিল, তার ফলে অনেকেই এই অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তিটির পরিচয় ভুলে গেছেন। অথচ তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অনেক দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। তাঁর পৌত্র বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৮৯ সলে 'রাজাবলি'র ৫ম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। এতে মনে হয় তাঁর গ্রন্থ অনেক দিন জনপ্রিয়তা রক্ষা করেছিল। কিন্তু নবজীবনের প্রবল স্রোতে মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সংস্কৃত সাহিত্য-অলঙ্কার-ন্যায়-দর্শন-মীমাংসায় ভূয়োদর্শী বাঙালী পণ্ডিত লোকস্মৃতির বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এবার আমরা তাঁর গদ্য গ্রন্থাদির কিছু পরিচয় নেব।

মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থ-পরিচয়

মৃত্যুঞ্জয় সেই শ্রেণীর লেখক, যিনি সামান্য লিখে সুগভীর ছাপ রেখে যান; অথচ পরবর্তী কালে সে ছাপ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যায়। ১৮০২ সাল থেকে ১৮১৩—মোট ন'বছরের মধ্যে চারখানি গ্রন্থ লিখে এবং ১৮১৭ সালে আর একখানি গ্রন্থ বেনামে প্রচার করেই তাঁর সাহিত্য-জীবনে ছেদ পড়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করার সময়ে উইলিয়ম কেরীর অনুরোধ তিনি বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রথম গ্রন্থেই একটি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ মনের পরিচয় দেন। মনে রাখতে হবে তখনও বাংলা গদ্যে রামমোহনের আবির্ভাব হয় নি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীর দল তখন বাংলা গদ্যের রীতি নির্ধারণে হিমসিম খাচ্ছেন। উনিশ শতকের পূর্বে নানা কার্যে গদ্যের ব্যবহার থাকলেও, সাহিত্যে গদ্যবন্ধের প্রয়োগ উক্ত শতকের পূর্বে বড় একটা দেখা যায় না। কেরী সায়েব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিভিলিয়ান ছাত্রদের বাংলা শেখাবার জন্য অনুবাদমূলক ও কাহিনীকেন্দ্রিক পুস্তিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন—যার দ্বারা বিদেশীরা বাংলা ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারে এবং কিছু কিছু লিখতেও পারে। কেরী সায়েব অসাধারণ ভাষাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষার শিল্পবোধ সম্বন্ধে তিনি ততটা অবহিত ছিলেন না—বিদেশীর পক্ষে সেরকম অভিজ্ঞতা লাভ ততটা সহজসাধ্য নয়। কেরী ও শ্রীরামপুরের মিসনারীরা এবং ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা—যাঁরা কিছু কিছু বাংলা চর্চা করতেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা গদ্যকে হয় ধর্মপ্রচারে, আর না হয় রাজকার্যে ব্যবহার। ভাষাকে শিল্প করে তোলার দিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না—ইচ্ছাও ছিল না। এঁদের মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় যথার্থ প্রাণরস, শিল্পরূপ, অন্বয়, বাক্-

বিন্যাসপদ্ধতি এবং ইডিয়মের যথাযথ প্রয়োগ—এক কথায় গদ্যের রূপ ও রীতির প্রথম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের সংখ্যা মোট পাঁচখানি :

১. বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)

২. হিতোপদেশ (১৮০৮)

৩. রাজাবলি (১৮০৮)

৪. প্রবোধচন্দ্রিকা (রচিত—১৮১৩, প্রকাশিত—১৮৩৩)

৫. বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭)

'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় তাঁর নাম ছিল না। রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে' মুদ্রিত মন্তব্যের প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় নিজ নাম গোপন করে এই পুস্তিকা লিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর রচিত বা তাঁর সাহায্যে রচিত আরও দু-খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৫৫ সালে লং সায়েব "ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ" সঙ্কলন করেন। তাতে তিনি মৃত্যুঞ্জয়-অনূদিত 'দায়রত্নাবলী'র (উত্তরাধিকার বিধি) কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এই গ্রন্থ নাকি ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর কোন মুদ্রিত কপি বা অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত বলে আর একখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুদের আচারব্যবহার-সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ মৃত্যুঞ্জয় রচনা করেছিলেন এবং তা মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তার মূল বিষয় ছিল—"A View of the Manners and Customs of the Hindoos, as they exist at the present time." এই গ্রন্থখানি শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল কি না জানা যাচ্ছে না। আর একখানি গ্রন্থ রচনায় মৃত্যুঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। তাঁর পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের নামে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস থেকে 'সাংখ্যভাষা সংগ্রহ' নামক সাংখ্যদর্শনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদে পিতাপুত্র

উভয়েই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মনে হয় এর অনেকটাই মৃত্যুঞ্জয়ের অনুবাদ।

॥ বত্রিশ সিংহাসন ॥ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য ১৮০২ সালে মৃত্যুঞ্জয় 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদ করেন, শ্রীরামপুরের মিসনারীদের ছাপাখানায় তা কেরীর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। কেরী সায়েব বুঝেছিলেন, হৃদয়গ্রাহী গল্প-আখ্যান না হলে সিভিলিয়ান সায়েবরা বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হবেন না। তাই কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা তাঁর নির্দেশে সংস্কৃত, ইংরেজী, ফারসী এবং হিন্দুস্থানীতে রচিত গল্প-উপাখ্যানকেই প্রথমে বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' একদা কিছু জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ ১৮১৮ সালের মধ্যে এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে ১৮১৬ সালের সংস্করণ 'লন্দন নগরে চাপা' হয়েছিল। ১৮৩৪ সালেও আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে কোন মুদ্রণ হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

১৮১৩ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা অনেকগুলি অনুবাদ করেছিলেন। গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের "ওরিয়ান্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্সীর "তোতা ইতিহাস" (১৮০৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণির 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫) প্রভৃতি পুস্তিকা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কেরী গ্রন্থ নির্বাচনে কতটা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আখ্যান-আখ্যায়িকা এবং দেশের ইতিহাসকে অবলম্বন করে কাহিনী লেখার জন্য তিনি এই সমস্ত পণ্ডিত-মুন্সীদের অনুপ্রেরণা দিতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর অব্যবহিত পূর্বে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) মুদ্রিত হয়। রামরামের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা' ১৮০২ সালে

প্রকাশিত হলেও রচিত হয়েছিল ১৮০১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে। কেরীর 'ডায়ালোগ' বা 'কথোপকথন' ১৮০১ সালের দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য এই 'কথোপকথন' পুরোপুরি কেরীর রচনা কিনা তাতে রীতিমতো সন্দেহ আছে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত রামরাম বসু ও কেরীর পুস্তিকায় বিশেষ কোন 'রীতি' অনুসৃত হয় নি। রামরামের প্রথম গ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর ভাষার অনভ্যস্ত জড়তা, ফারসী-আরবী শব্দের বাহুল্য এবং অন্বয়ের বিশৃঙ্খলা এমন বিচিত্র যে, এতে বিশেষ কোন রীতিই অনুসৃত হয় নি। অবশ্য তাঁর 'লিপিমালা'র ভাষার অন্বয় মোটামুটি সাধুভাষার অনুগামী। কেরীর 'কথোপকথনে' চলিত বাক্‌রীতির ধারা ও বৈশিষ্ট্য অনুসৃত হয়েছে। এর নাটকীয়তা বাদ দিলে এ রীতিকে কিছুতেই শিষ্ট রীতি বলা যায় না। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসনে' সর্বপ্রথম একটা ক্লাসিক সাধুরীতির স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা'র কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়। কে এর রচনাকার তা জানা যায় না। যথারীতি কালিদাসের স্কন্ধে এর ভার অর্পিত হয়েছে। একদা সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের আদি-রসাশ্রিত ও অদ্ভুত ঘটনাসংবলিত আখ্যায়িকা খুব প্রচলিত ছিল। পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথা, দশকুমারচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কথাগ্রন্থ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাংলা গদ্যের গোড়ার দিকেও হিতোপদেশ, দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা প্রভৃতি সংস্কৃত উপকথার অনুবাদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সে জনপ্রিয়তা গোটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিদ্যাসাগরও প্রথম যে গ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন, তা হল 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। অবশ্য তারও আগে তিনি 'বাসুদেব চরিত' রচনা করে-ছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'র আরম্ভেই দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণদেশের

ধারা রাজ্যে যজ্ঞদত্ত নামে এক কৃষকের ক্ষেত্রে মাটির তলা থেকে একটি রত্ন সিংহাসন পাওয়া গেল—"প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্নসিংহাসন উঠিলেন।" ধারা নগরীর অধীশ্বর ভোজরাজ সেই সিংহাসনটি মহা সমারোহে নিজ রাজধানীতে এনে তাতে উপবেশনের উপক্রম করতেই একটি পুত্তলিকা কথা কয়ে উঠল, "হে রাজন্, শুন। যে রাজা গুণবান অত্যন্ত ধনবান, অতিশয় দাতা, অত্যন্ত দয়ালু, অতিবড় শূর, সাত্ত্বিক স্বভাব, সদা উৎসাহশীল, প্রবলপ্রতাপ হন, সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য—অন্য সামান্য রাজা উপযুক্ত নয়।"* রাজা ভোজ বললেন যে, তিনিও অতিবড় দাতা, জ্ঞানী ও গুণী। তখন সেই পুত্তলিকা রাজাকে ব্যঙ্গ করে বলল, "বড়লোক সেই, যাহার গুণ অন্যে বর্ণন করে, আপনার গুণ আপনি বর্ণন করণেতে কিছু ফল নাহি, পরন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে।" ভোজরাজ পুত্তলিকার স্পষ্টবাদিতায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়ে বললেন, "হে পুত্তলিকে, এ সিংহাসন কাহার ও কিরূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ।" পুত্তলিকা কহিলেন, "মহারাজ, সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন।" এর পর গল্প আরম্ভ হল। এক একটি পুতুলের গল্প শেষ হয়, আর তারা সিংহাসনের মালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের অদ্ভুত জ্ঞান-বুদ্ধির প্রশংসা করে বলে, "হে ভোজরাজ, যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু, সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত।" ভোজরাজের সে গুণ নেই, অতএব তিনি "এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।"

সর্বশেষ পুত্তলিকা শেষ গল্পে (৩২শ) বিক্রমাদিত্যের সদাশয় ধর্মভীরু

* মূল গ্রন্থে পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া আর কোন বিরামচিহ্ন ছিল না। এখানে পাঠকের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বিরামচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অতঃপর অন্যান্য উদ্ধৃতিতেও এই রীতি অনুসৃত হবে।

চরিত্র বর্ণনা করে অন্যান্য পুত্তলিকার সঙ্গে বলল, "হে ভোজরাজ, শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোষ্টস্তে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ, তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম। এ সকল গুণ যার থাকে, সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্য রাজা বসিলে তাহার অমঙ্গল সমূহ হয়। অতএব তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম।"

বত্রিশ পুতুলযুক্ত এ সিংহাসন ইন্দ্র গুণের জন্য বিক্রমাদিত্যকে দান করেছিলেন। এই দিব্য সিংহাসনে যে বসবে, সেই মহৎ ধীশক্তি-সম্পন্ন হবে, শ্রেষ্ঠ রাজগুণের অধিকারী হবে। বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসনে উপবেশন করে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে শাসন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ সিংহাসনটিকে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। ভোজরাজ বহুকাল পরে মাটি খুঁড়ে সেই সিংহাসনকে খুঁজে বার করেন, এবং তাতে বসতে গিয়ে লজ্জা ও বিড়ম্বনা ভোগ করেন। যাই হোক বত্রিশটি পুতুল নিজেদের কাহিনী ও বিক্রমাদিত্যের অপূর্ব চরিত্রকথা বলে মুনিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সিংহাসন সহ অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এ কাহিনী এদেশে বহুকাল ধরে সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের মনোরঞ্জন করে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় এর অনুবাদে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ও সংস্কৃতে তাঁর সমান অধিকার ছিল বলেই কেরী তাঁকে এই ভার দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' বা 'হিতোপদেশে'র মতো এতে আদিরসের উগ্রতা অত্যন্ত অল্প। স্ত্রীলোকের চরিত্রহীনতা, লম্পটের কদাচার প্রভৃতি এতে খুব সংক্ষেপে ও স্বল্পপরিসরে নামমাত্র উল্লিখিত হয়েছে। একটা সুস্থ ও সুনীতিযুক্ত জীবনাদর্শ গল্পগুলির ফলশ্রুতি। কিন্তু 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' অধিকতর চিত্তাকর্ষী। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'র গল্পগুলি কৌতূহলজনক হলেও বিস্ময়রসে কিঞ্চিৎ ন্যূন, তা স্বীকার

করতে হবে। তবে এ দোষ মূল গ্রন্থের, অনুবাদকের নয়। সংস্কৃত ভাষায় পরম প্রাজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় এই অনুবাদে যে রীতি ব্যবহার করেছেন, তাই হচ্ছে সাধু বাংলা গদ্যের যথার্থ রীতি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীদের অনেকেই এ রীতি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি, রামমোহনের গদ্যরীতিও এতটা সহজ ও সাবলীল নয়। পরবর্তী কালে বাংলা দেশে যে সাধু গদ্যরীতি শিষ্টসমাজ ও সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে 'বত্রিশ সিংহাসনে' মৃত্যুঞ্জয় তার প্রথম সূচনা করেন—এই জন্য এই অনুবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ হিতোপদেশ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়। বিষ্ণুশর্মার নামে প্রচারিত হিতোপদেশের অন্তর্গত চারটি আখ্যানকে (মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি) মৃত্যুঞ্জয় সাধু বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন। এই ধরনের গল্পের চাহিদার জন্য তাঁর পূর্বেই কলেজের অন্যতম পণ্ডিত গোলোকনাথ শর্মা হিতোপদেশের প্রথম অনুবাদ করেন (১৮০২)। ১৮০৮ সালে কলেজের আর এক পণ্ডিত হিতোপদেশের আর একখানি অনুবাদ প্রকাশ করে এ ধরনের গ্রন্থ যে কতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। খ্রীঃ নবম শতকের দিকে নারায়ণ নামক এক বাঙালী লেখক বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের গল্পকে একটু আধটু রদ-বদল করে এবং অপেক্ষাকৃত সরল সংস্কৃতে হিতোপদেশ প্রচার করেন। এ উপদেশমালার উদ্দেশ্য—জড়বুদ্ধি রাজপুত্রদের গল্পের মারফতে সংসার, নীতি ও জীবন সম্বন্ধে উপদেশ দান। গোলোকনাথের রচনাটি সরল হলেও সাহিত্যধর্মী নয়, উপরন্তু এতে মূল কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বোধ হয় কেরী সায়েব যোগ্যতর পাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের ওপর বিস্তারিতভাবে হিতোপদেশের অনুবাদের গুরুভার অর্পণ করেছিলেন। এর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সাহিত্যগুণ প্রশংসনীয়। কিন্তু 'বত্রিশ সিংহাসনে'র

চেয়ে এর বাগ্‌বিন্যাস একটু বেশী সংস্কৃতানুসারী।

"অনন্তর রাজা কহিলেন, ভো ভো পণ্ডিতেরা, আমার কথা শ্রবণ করুন। আছে কেহ এমন পণ্ডিত যে নিত্যবিপথগামি অবিদিতশাস্ত্র আমার পুত্রেরদের এখন নীতিশাস্ত্রোপদেশ দ্বারা পুনর্জ্জন্ম করাইতে সমর্থ হয়?"

এ ভঙ্গী সংস্কৃত ধরনের পণ্ডিতী বাংলা। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় হিতোপদেশের গোড়ার দিকের ভাষায় কিঞ্চিৎ সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি ব্যবহার করলেও পরে সাধু বাংলা রীতিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন।

নীতিকথা-সম্পর্কিত এই গ্রন্থে উগ্র আদিরস, দুর্নীতি, স্ত্রীলোকের অসতীত্ব ও পুরুষের চাতুরীর বর্ণনা আছে—সংস্কৃত ভাষায় লেখা মূল গ্রন্থেই এই দোষ প্রকট হয়েছে। অবক্ষয়ী সমাজের পটভূমিকায় এই ধরনের রচনা সম্ভব। প্রাচীন কালের ভারতীয় সমাজে এই শ্রেণীর গল্পগ্রন্থের খুব চাহিদা হয়েছিল, ভারতের বাইরেও হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রের বহুল প্রচার দেখতে পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয় অনুবাদের সময় আপত্তিকর গল্পগুলিকেও বাদ দেন নি। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর অশ্লীলতার জন্য হিতোপদেশকে ছাত্রপাঠ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী মনে করেছিলেন এবং রচনাকারের রুচির নিন্দা করেছিলেন।

"আর নির্জ্জন স্থান থাকে না, এবং অবকাশ কাল থাকে না, এবং প্রার্থনা কর্ত্তা মনুষ্য থাকে না। হে নারদ, সে নিমিত্ত স্ত্রীরদিগের সতীত্ব হয়। যেমন গরু সকল বনেতে নূতন ২ ঘাস প্রার্থনা করে, সেইরূপ নূতন ২ পুরুষ প্রার্থনা করে।… এবং স্ত্রী ঘৃতকলসের তুল্য, পুরুস তপ্তাঙ্গারের তুল্য। এই হেতুক বিজ্ঞ লোক ঘৃত ও আগুন একত্রে রাখিবে না। নারীদের সতীত্ব হওনের কারণ লজ্জা নয়, বিনীতিত্বও নয়, কর্ম্মনৈপুণ্য নয়, ভীরুতা নয়—কেবল প্রার্থনার অভাবই কারণ। অপর, বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করে, যৌবনাবস্থাতে

ভর্তা রক্ষা করে, বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রেরা রক্ষা করে—যেহেতুক স্ত্রীকর্তৃত্বকে কখনও অর্হে না।"

এ ভাষা স্বচ্ছন্দ নয়, তাৎপর্য অতি কুৎসিত। অবশ্য এর পরে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা থেকে সংস্কৃতগন্ধী জড়তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো বিচক্ষণ ভাষাশিল্পী কেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে ভাষার পশ্চাদ্‌গামিতার পরিচয় দিলেন তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় কেরীর নির্দেশে এই অনুবাদকার্যে অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশে মূলকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা হয় নি, গল্পটি অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে ভাষাকে রীতিমতো আড়ষ্ট ও কৃত্রিম করে ফেলেছেন। গোলোকনাথ যেখানে লিখেছেন—"কাহার মুখে দুই শ্লোক শুনিলেন," মৃত্যুঞ্জয় সেখানে লিখলেন, "কাহারও কর্তৃক পাঠামান শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করিলেন।" এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটি মুখের বাক্‌রীতির অধিকতর অনুগত, দ্বিতীয়টি পুঁথির ভাষার কৃত্রিম গুরুভার বহন করছে।

॥ রাজাবলি ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের তৃতীয় গ্রন্থটি হিতোপদেশের অল্প পরে একই বৎসরে (১৮০৮) প্রকাশিত হয়। এটি অনুবাদ বা আখ্যান নয়—"কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।" গ্রন্থটির পুষ্পিকায় 'রাজাবলি'র স্থলে লেখক 'রাজতরঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।* বোধ হয় তিনি প্রথম দিকে গ্রন্থটিকে 'রাজতরঙ্গিণী'র আদর্শে 'রাজতরঙ্গ' নামে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেরীর নিদেশে বা অন্য কোন কারণে

* "পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।"

টাইটল পেজে 'রাজাবলি' নাম মুদ্রিত হয়েছিল। ভারতীয়ের লেখা আধুনিক কালের কোন ইতিহাস ইতিপূর্বে ঠিক ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করে নি। পৌরাণিক যুগ, হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ (পাঠান ও মুঘল) এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের প্রারম্ভ ভাগ পর্যন্ত—এ ইতিহাসের কালসীমা বিস্তৃত। মৃত্যুঞ্জয় কিছুমাত্র ইংরেজী জানতেন না। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "He was himself wholly unacquainted with the English Language."[৩] 'রাজাবলি' রচনায় মাত্র বিশ-পঁচিশ বছর পূর্বে ইংরেজ লেখকেরা ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছিলেন। সুতরাং ইংরেজী-অনভিজ্ঞ এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতটি যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হলেন, তখন উপাদান হিসেবে পুরাতন গালগল্প ও পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন যথার্থ তথ্য অতি অল্পই হাতে পেলেন। মুসলমান যুগ ও আধুনিক কালের ঘটনাকে আলোচনায় গ্রহণ করে মৃত্যুঞ্জয় পৌরাণিক ও প্রাচীন সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন—এ কম প্রশংসার ব্যাপার নয়। হিন্দু যুগের বর্ণনায় তিনি অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত পৌরাণিক ট্র্যাডিশন ও লোকশ্রুতিকে পুরানো রীতি অনুযায়ী গ্রহণ ও ব্যবহার করেছিলেন, হিন্দুযুগের বর্ণনায় তিনি বিক্রমাদিত্য, ভর্তৃহরি, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি রাজাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সবটাই যে ইতিহাসসম্মত—এমন কথা বলা যায় না। বল্লাল সেনের ডোমকন্যা সংগ্রহের গল্পটি তিনি সালঙ্কারে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ মিতবাক—সম্ভবত: মিনহাজ উদ্দিনের 'তবকৎ-ই-নাসিরী' তখনও পাঠকসমাজে প্রচারলাভ করে নি। জয়চন্দ্র ও পৃথীরাজের বৃত্তান্তকে তিনি

৩. "He was himself wholly unacquainted with the English Language". (*Calcutta Review*, July, 1845)

ইতিহাসের আকারে বিবৃত না করে আখ্যানের ধারা অনুসরণ করেছেন। পাঠান ও মুঘলের বর্ণনাতে তিনি পৃথক ও বিশদভাবে এই দুই জাতির শাসনপ্রণালী ও ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে তিনি যা বলেছেন, তা অপ্রচুর হলেও অনৈতিহাসিক নয়:

"এই বাঙ্গালাতে পূর্ব্বে আদিশূর রাজার বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। তারপর বল্লাল সেনের বংশেরা স্বতন্ত্র রাজত্ব করিয়াছেন। পরে হোসেন শাহের বংশেরা এই বাঙ্গালায় বাদশাহী করিয়াছেন। ইহারা কেহ দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন না। তারপর আকবর শাহ বাদশাহের আমল অবধি এই বাঙ্গালা দিল্লীস্থ বাদশাহেরদের অধিকৃত হইল এবং তদবধি বাঙ্গালা দেশের জিন্নতুল বিলায়ৎ নাম হইল, এবং আকবর শাহ বাদশাহ বাঙ্গালাকে এক সুবা করিয়া তাহার সুবেদার আপন সাক্ষাৎ হইতে মোকরর করিলেন।"

পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজের পরিণামও খুব সংক্ষেপে নিঃস্পৃহভাবে বর্ণিত হয়েছে:

"পরদিবস রাজমহলের নিকট পহুঁছিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথাতে নৌকা লাগাইয়া কিছু খাদ্যসামগ্রীর নিমিত্তে একজন চাকরকে নৌকা হইতে নামাইয়াছিলেন। তথাতে এক ফকীর ছিল। সে পূর্ব্বে মুরশিদাবাদে একজন মর্দ্দ আদমি ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলা কোনহ অপরাধে গাধার প্রস্রাবে তাহার মোচ মুড়াইয়াছিলেন। এই অপমানে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপরিত্যাগ করিয়া ফকীর হইয়া তথাতে ছিল। সেই ফকীর নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকরকে দেখিয়া অনুসন্ধানে কিছু বুঝিয়া ঐ চাকরের সহিত কপট প্রীতি ব্যবহার করিয়া তাহাকে কহিল যে, তুমি এইখানে থাক।

আমি বাজার হইতে সামগ্রী আনিয়া অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে রুটি করিয়া দিই। নবাব সিরাজদ্দৌলার চাকর তৎকালোপযুক্ত সেকথা ভাল বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। ফকীর সামগ্রী আনিবার ছলে বাজারে আসিয়া নবাব যিরাজদ্দৌলা যে পলাইতেছেন একথা প্রকাশ করিল।"

লেথক সিরাজদ্দৌলার দুঃশীল চরিত্রকে নিন্দা করলেও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, যারা সিরাজের সঙ্গে 'নিমখারামি' করেছিল, সকলেই ঈশ্বরের কাছে যথোচিত শাস্তি পেয়েছিল। মীরন "রাজমহল মোকামে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামি করাব ফলস্বরূপ বজ্রাঘাতে মরিলেন।" মিরজাফরও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেলেন না, বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ "গলৎকুষ্ঠরোগে অতিশয় ব্যামোহ পাইয়া মরিলেন।" মৃত্যুঞ্জয় লর্ড ক্লীব (ক্লাইভ), হেস্টিংস প্রভৃতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'বড় সাহেব'দের প্রশংসার ত্রুটি করেন নি। "নবাবেরদের ও তাহারদের চাকর লোকেরদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থানের বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে ঐ হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ" 'কম্পানি বাহাদুরের' আগমন হয়েছে—একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পরেও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত আমরা সেই আশাবায়ুতে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কেরী সায়েব সম্ভবতঃ দেশীয় ইতিহাসের বিষয়ে পুস্তিকা লিখতে কলেজের পণ্ডিত মহাশয়দের অনুরোধ করেছিলেন। তার ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের আগে দু-খানি ইতিহাসাশ্রিত রূপকথা রচিত হয়। একটি—রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), অপরটি—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)। এই দু-খানি পুস্তিকাতেও ইতিহাসের উপাদান আছে, কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'কে অবশ্য পুরোপুরি ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কিন্তু যথার্থ ইতিহাস-

চেতনা বলতে যা বোঝায়, তার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য একমাত্র এই গ্রন্থেই আছে। প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের লেখা ভারতের হিন্দু-মুসলমান যুগ থেকে শুরু করে হেস্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত সুদূর-বিস্তারী ঐতিহাসিক কালের বিবরণ আধুনিক পাঠকের নিকট নিশ্চয় বিশেষ কৌতূহলজনক মনে হবে।

আর একটি কথা—রামরাম বসুর প্রথম গ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' আরবী ও ফারসী শব্দের অযথা বাহুল্য ছিল, কিন্তু কেরী বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দের দৌরাত্ম্য একেবারে পছন্দ করতেন না। মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতসুলভ একান্ত নিষ্ঠা ছিল, তাই তিনি ভাষায় যথাসম্ভব যাবনিক সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা—'রাজাবলি'তে মুসলমান শাসন বর্ণনা করার সময় তিনি অসংখ্য ইসলামী শব্দ ব্যবহার করেছেন। কয়েকটির উদাহরণ: মোকরর, খেতাব, ওগয়রহ, উমদা, কয়েদ, সুবে, নেয়াবৎ, তজবীজ, তাজতক্ত, দাদনি, ওজর, দরমাহি, বিরাদর হাবেলি, চুগল, খেদমত, গুজারি, জিম্বা, কিল্লা, পেসকোস, ফতে, আন্দিজ প্রভৃতি। এ সমস্ত ইসলামী শব্দের প্রতি তাঁর যে কোনরূপ শুচিবাতিক ছিল না, এই জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য।

॥ বেদান্তচন্দ্রিকা ॥ ১৮১৭ সালে নাম গোপন করে মৃত্যুঞ্জয় এই প্রতিবাদপুস্তিকা রচনা করেন রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' প্রকাশের প্রায় দু' বছর পরে। হিন্দু পৌরাণিক ধর্মকে শাস্ত্রসম্মত বলে এবং বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে বেদান্তের অবিরোধী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তিনি ইংরেজী অনুবাদসহ এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বলাই বাহুল্য ইংরেজী অনুবাদ তাঁর নয়। মুদ্রিত গ্রন্থে কোন বাংলা আখ্যাপত্র ছিল না। 'An Apology for The Present System of Hindoo Worship—written

in the Bengalee language, and accompanied by an English translation'—এই ইংরেজী আখ্যাপত্রসহ ইংরেজী-বাংলা পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ শেষে 'ইতি বেদান্ত চন্দ্রিকা সমাপ্তা' এই উল্লেখ আছে বলে পুস্তিকাটি 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে পরিচিত হয়েছে। ১৮১৯-২০ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির তালিকায় এই পুস্তিকার বিবরণ এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে : Vedanta-Chondrica……on the Vedant System ; (in defence of Hindoo Idolatry, against the observation of Rammohan Roy)……Mrityonjoy Bidyaloncar. এই গ্রন্থটির নাম যে, 'বেদান্তচন্দ্রিকা', এর রচনাকার মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহনের একেশ্বরবাদী 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে'র প্রতিবাদ-কল্পে এ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসের 'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে "বেদান্তিজিম হোয়াট্ ইজ্ ইট্?" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছিল এবং তাতে এই পুস্তিকাকে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বলা হয়েছে। রামমোহন এই পুস্তিকার প্রতিবাদে ১৮১৭ সালের মে মাসে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' পুস্তিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের রাজকর্ম করার জন্য তাঁকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে লেখেন, "আপনি রাজসংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহারদের রাজসংক্রান্ত কর্ম্ম নাই, তাঁহাদের কি দিনপাত হয় না?" তখন মৃত্যুঞ্জয় সুপ্রিম কোর্টের জজপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামমোহন ছদ্মবেশী লেখককে ধরে ফেলেছেন—এই ব্যঙ্গের তাই হচ্ছে তাৎপর্য। সে যুগে সকলেই 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ছদ্মবেশী লেখককে চিনতেন।

১৮১৫ সালে রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রকাশিত হয়। 'বেদান্ত সূত্রে'র ব্যাখ্যাই এর মূল অবলম্বন। এই একই বৎসরে (কারও মতে, তার পরের বৎসরে) রামমোহন আরও সংক্ষেপে 'বেদান্তসার'

প্রকাশ করে একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক বেদান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রুতির 'আত্মৈ বেদং নিত্যাদেবোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসিত ধীরঃ'—এই উক্তি অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"এই যে আত্মা, কেবল তাহার উপাসনা করিবেক। কোন অন্য বস্তুর উপাসনা জ্ঞানবান লোকের কর্ত্তব্য না হয়" ('বেদান্তসার')। উক্ত দু-খানি গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রচলিত হিন্দু সংস্কারের পক্ষ অবলম্বন করে মৃত্যুঞ্জয় এই 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রচার করেন। এতে কিন্তু তিনি বেদান্তের ব্রহ্মোপাসনাকে অস্বীকার করেন নি, আবার অধিকারী-ভেদে সগুণ সোপাধিক ব্রহ্মের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতত্ত্বকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয়—উভয়ের যুক্তিই প্রণিধানযোগ্য। তবে মৃত্যুঞ্জয় ভাষার মধ্যে অনেক সময় শিষ্টাচারবিরোধী মন্তব্য প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, রামমোহনের মতো "অগ্রাহ্যনামা রাগান্ধ তত্ত্বজ্ঞানি-মানিরদের" হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ অতিশয় অকর্তব্য। তাই সমাজ, সম্প্রদায় ও আনুষ্ঠানিক সদাচারের পক্ষ থেকে তিনি রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যাকে নানা ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। ভাষাতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত ন্যায়-শাস্ত্রের বাগ্‌বিন্যাসের রীতি অবলম্বিত হলেও, বহুস্থলে সরস পরিহাস (একটু স্থূল হওয়া সত্ত্বেও) বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় বেদান্ত আলোচনায় লঘু হাস্যপরিহাস আমদানি করায় রামমোহন যথার্থ বলেছিলেন, "পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু-ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়।" শাস্ত্রালোচনায় লঘু রসের আমদানি ঔচিত্যের হানি করে কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা না করেও বলা যায় যে, মৃত্যুঞ্জয়ের এই পুস্তিকার অনেক স্থলে উতরোল হাস্যপরিহাস আছে, ভাষার মধ্যে তরল সহজবোধ্যতা আছে—যদিও মাঝে মাঝে তিনি সংস্কৃত ধরনের বাক্য ব্যবহার করে ভাষাকে একটু স্থাবর করে ফেলেছেন। 'অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায়' অর্থাৎ অশ্বচিকিৎসার নিয়ম

মানুষের চিকিৎসায় প্রয়োগজনিত হাস্যকর বিভ্রান্তি প্রভৃতি ছোট ছোট আখ্যায়িকায় তিনি স্থূল হাস্যপরিহাসের সাহায্যে রামমোহনের মতামত নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এতে রামমোহন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ক্ষোভ এই জন্য যে, শাস্ত্রালোচনায় দুর্বাক্য প্রয়োগ কুরুচির পরিচায়ক। আধুনিক কালের কোন কোন লেখক রামমোহনের পক্ষ অবলম্বন করে মৃত্যুঞ্জয়ের রুচির নিন্দা করেছেন।[৪] একথা অবশ্য যথার্থ। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষারীতি যে রামমোহনের গ্রন্থ দু-খানির ভাষার চেয়ে কোন কোন দিক থেকে অধিকতর সুখপাঠ্য, তা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

"ঐ বিদ্যা প্রথমত নারায়ণ সূর্য্যদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সূর্য্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এতদ্রূপ গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমাগত ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিলেন। মধ্যে কিছুকাল কর্ম্মকাণ্ড বাহুল্য হওয়াতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। পরে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগারম্ভে কৃষ্ণরূপী ঐ পরমেশ্বর অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের এ ভাষা অতি সহজ, এর গতি সাবলীল এবং অন্বয়ও অবাধিত। অবশ্য এই পুস্তিকার উপসংহারে দেশভাষায় মোক্ষবিদ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে তিনি যা বলেছেন, তা নিশ্চয় আধুনিক পাঠকের মনঃপুত হবে না:

"আর যেমন মণি পথে-ঘাটে পড়িয়া থাকে না, কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া

৪. ডঃ সুশীল কুমার দে-র মতে—"It is marked by a deplorable tone of violence and personal rancour." (*Hist. of the Bengali Lit. in the 19th century*, 1st edition p. 203, foot note).

রাখেন, তেমনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না, কিন্তু সুপক্ব বদরী-ফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থ বোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্‌মুখ হন, তেমনি সালঙ্‌কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।"

অবশ্য কৌতুকের বিষয়, মৃত্যুঞ্জয়ের এই 'নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক-ভাষা'ই 'বেদান্তচন্দ্রিকা' আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮০২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসনে'ও ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায়[৫] এই 'লৌকিক ভাষা'ই গৃহীত হয়েছিল। সেকালের শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মতো বোধ হয় তিনি মনে করতেন, মোক্ষবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে অধিকারীভেদ আছে, অদীক্ষিত ও অনধিকারীর নিকটে এই বেদগুহ্য তত্ত্বকথা সর্বথা গোপ্য। রামমোহন বাংলা ভাষায় তার অবতারণা করে 'হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান' বিতরণ করছেন দেখে তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—তাই এই উগ্র অশোভন আক্রমণ।

॥ প্রবোধচন্দ্রিকা ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনাশক্তি ও সাহিত্যবোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ এই 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। তাঁর অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা অল্পকালের মধ্যে লোকচক্ষু থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেলেও এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত থাকার জন্য এর গৌরব ও প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। সর্বোপরি এর ভূমিকায় মার্শম্যান যে-রকম স্তুতিবাদ করেছিলেন, এ পর্যন্ত কোন শ্বেতাঙ্গ আধুনিককালের কোন দেশীয় লেখকের গ্রন্থ

৫. মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী – ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪৭-৪৮

সম্বন্ধে সে রকম নির্জলা প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন নি। কিন্তু পরের যুগে অনেকেই মৃত্যুঞ্জয়কে অত্যন্ত নিন্দা করেছেন শুধু এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ উদ্ধার করে। বাস্তবিক মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞান, বিদ্যা, রসবোধ, মৌলিক চিন্তা, ভাষা-সাহিত্য-নীতি-ন্যায়-ব্যবহার-দর্শন এবং সর্বোপরি পরিহাসরসিকতা বিচার করলে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'কে বিদ্যাসাগরের পূর্বে রচিত গদ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে। এমন কি এর রচনাসমুৎকর্ষ রামমোহনকেও ম্লান করে দেবে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় মার্শম্যান বলেছিলেন, "Any person who can comprehend the present work, and enter into the spirit of its beauty, may justly consider himself master of the language".

একথা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। মৃত্যুঞ্জয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের আশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। নানা স্থান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি ৪ স্তবকে এবং ২১টি কুসুমে (অধ্যায়) এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১৩ সালের দিকে বোধহয় 'প্রবোধচন্দ্রিকা' সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৮৩৩ সালে শ্রীরামপুর মিসন যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। তারপর নানা সময়ে এ গ্রন্থের অনেকগুলি সংস্করণ হয়েছিল।

হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্রের আদর্শে এ গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে—বিক্রমাদিত্যের পুত্র রাজা বৈজপাল তাঁর চঞ্চলমতি পুত্র শ্রীধরাধরের শিক্ষার জন্য আচার্য প্রভাকর নামে এক পরম পণ্ডিত শিক্ষককে নিযুক্ত করেন। প্রভাকর ছাত্রকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করলেন। সেই অধ্যাপনার বিষয় বর্ণনাই এই গ্রন্থের প্রধান কলেবর। বর্ণ, ভাষা, গদ্য, কাব্যের স্বরূপ, বাক্যের লক্ষণ, নানা হিতকর নীতিকথা, খলচরিত্র, দুশ্চরিত্র, স্ত্রীচরিত্র, বেণরাজার কাহিনী নানা শ্রেণী-উপশ্রেণী ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ইত্যাদি নানা বিষয় এতে সবিস্তারে

বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখক নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের বাংলা শেখান। বিদেশীদের কৌতূহল আকৃষ্ট হতে পারে, মৃত্যুঞ্জয় সেই রকম বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন। প্রয়োজন স্থলে তিনি সংস্কৃত শ্লোকাদির অনুবাদ করে দিয়েছেন, কোথাও-বা পুরাতন বর্ণনায় আধুনিক বাস্তব দৃশ্য যোগ করে দিয়েছেন। এতে অক্ষর, ভাষা ও বাক্যের বৈয়াকরণ ও দার্শনিক আলোচনা আছে প্রচুর। সে যুগের "অভিনব যুবক সাহেবজাত" সিভিলিয়ানদের কেমন লাগত জানি না, কিন্তু এ যুগের সাধারণ পাঠকের কাছে এর অনেকটাই অত্যন্ত নীরস ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। ন্যায়, নীতিকথা, বেদান্ত ও অলঙ্কার—এগুলির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল, এই সমস্ত রচনায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য তিনি আধুনিক ধরনের পণ্ডিত ছিলেন না, সুতরাং এর মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব আছে। অন্ততঃ প্রথম 'স্তবকে'র পাঁচটি 'কুসুম' সাধারণ পাঠকের কাছে কিছু চিত্ত-বিক্ষেপজনক মনে হতে পারে। বিশেষতঃ "In the technical or philosophical portion again the style sometime assumes a peculiar stiffness and learned tone."[৬] একথা অযৌক্তিক নয়। তবে একথাও স্মরণীয় যে, 'টেকনিক্যাল' ও পারিভাষিক ব্যাপার সাধারণের কাছে দুরূহ ও শুষ্ক মনে হবেই। যেখানে মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়শাস্ত্র এবং শব্দের অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জণা-স্ফোট প্রভৃতি বৈয়াকরণ তত্ত্ব আলোচনা করেছেন তা সাধারণ কেন, পণ্ডিত লোকের কাছেও দুরূহ মনে হবে। অবশ্য এতে এমন কতকগুলি আখ্যান ও নীতির গল্প সংযোজিত হয়েছে, যাতে সকলেরই মনে

৬. S. K. De—Op. Cit. p. 220,

প্রীতি সঞ্চারিত হবে—যেমন, অন্ধ-গোলাঙ্গুল ন্যায়, লাজাবদ্ধ ন্যায়, কোচবিহারের শক্রমর্দন রাজার গল্প, কাশ্মীরতুরঙ্গিণীর কাহিনী, কালিদাস ও ভোজরাজের উপাখ্যান, অষ্টাবক্র মুনির গল্প, ঘৃতভোজনে অন্ধ ব্রাহ্মণের দুর্গতির গল্প,—এবং আরও অনেক গল্প। এই গল্পগুলিতে তিনি সরস পরিহাস-কৌতুক ও বিচক্ষণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন সংস্কৃত নীতিকাহিনীর আদর্শে তিনি এই আখ্যানগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। নাটকীয়তা, সরস পরিহাস, বাস্তবতা প্রভৃতি বিচার করলে এই গল্পগুলি অতিশয় রমণীয় ও কৌতূহলজনক মনে হবে। এক কৃষক ধূর্ত শিয়ালকে জব্দ করতে গিয়ে কীভাবে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিল, তার সরস আখ্যান (তৃতীয় স্তবক, তৃতীয় কুসুম) লেখক চমৎকার সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ধূর্তশিরোমণি শিয়াল কৃষকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরের কাহিনী :

> "চাষা বাপ রে২, মলাম রে২, ওলো মাগি, দৌড় লো২, চক্ষু গেল২, এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয়ে চক্ষুদ্বয় মর্দ্দন করিতে২ শৃগাল অমনি ঝটিতি ধড়পড় করিয়া উঠিয়া চাষার পাচায় এক কামড় দিয়া এবং চক্ষে ধূলা দিয়া চলিয়া গেল। চাষা হাবা হইয়া ইস্‌উস্‌ করিতে থাকিল।"

এর কৌতুকরস স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক, যদিও আধুনিক রুচির কাছে কিছু গ্রাম্য মনে হবে। এর 'ভাল্‌গারিটি' সম্বন্ধে মার্শম্যান যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his view of original humour." কিংবা সেই 'দশম ন্যায়'-এর গল্পটি। দশজন লোক নদী পার হচ্ছিল। পার হয়ে গুণতি করতে গিয়ে প্রত্যেকেই নিজেকে বাদ দিয়ে গুণতে লাগল, ফলে প্রত্যেকেই দশজনের স্থলে ন'জনকে

গুণে পেল। তারা প্রত্যেকেই মনে করল, আর একজন নিশ্চয় খোয়া গেছে।

> "অনন্তর সকলেই হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, 'ওহে দশম, কোথা আছ, শীঘ্র আইস। আমরা সকলেই তোমাকে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইতেছি। তোমাকে পাইলে সুখী হই। অতএব যেথা থাক শীঘ্র আইস।"

কিন্তু দশম ব্যক্তির সাড়া পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তারা প্রত্যেকেই আত্মবিস্মৃতির বশে নিজেকে বাদ দিয়ে গুণেছে। তখন তারা এই সিদ্ধান্ত করল:

> "বুঝি আমারদের সঙ্গে পরিহাস করিয়া এই বনে লুকাইয়া আছে। চল, সকলে বনের মধ্যে গিয়া তত্ত্ব করি। শ্যালা বড় দুষ্ট। যদি পাই তাহার বাপের বিয়া দেখাইব।"

এই আখ্যানে লেখক একটা গূঢ় তত্ত্বকথাই বলতে চেয়েছেন—মানুষ এত আত্মবিস্মৃত যে, সে জগদ্ব্যাপারে নিজেকেও ভুলে বসে থাকে—বোধ হয় এই রকম একটা তত্ত্ববাদ এই 'ন্যায়ের ফাঁকি'র উদ্দেশ্য। কিন্তু লেখার সরসতার ফলে গম্ভীর তত্ত্বকথাও কৌতুকরসে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতি

বাংলা গদ্য ভাষার বিবর্তন লক্ষ্য করিলে এ সম্পর্কে আর কোনই সন্দেহ থাকবে না যে, মৃত্যুঞ্জয়ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যশিল্পী। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এমন একটা কুসংস্কার জন্মে গেছে যে, এই 'ভাষাচতুর' গদ্যশিল্পীকে দুর্বোধ্য ভাষার লেখক বলে অনর্থক তাঁর পরিবাদ করে এসেছি। মার্শম্যান তাঁর গদ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "His knowledge of the Sanskrit classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never

been surpassed for ease, simplicity and vigour."[৭]

একদা একথা অনেকের কাছেই অত্যুক্তি মনে হয়েছিল। কেরী ও মার্শম্যান মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট বাধ্য ছাত্রের মতো ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। অনেকে ভাববেন—এই প্রশংসাবাণী বোধ হয় তাঁদের সেই কৃতজ্ঞতাপ্রসূত।[৮] এই ভ্রান্ত ধারণার বশে রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার ত্রুটি ধরেছেন। রামগতি নিজে একজন সংস্কৃত-ব্যবসায়ী হয়ে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এ মন্তব্য করতে বিরত হন নি, "তিনি যে সময়ের লোক, এবং যেরূপ শিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে উহা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর ভাষা বহির্গত হইবে, এরূপ আশা করা একপ্রকার অসঙ্গত।" এঁদের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র একটি বাক্য—"কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।" এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যপংক্তিটি শুধু দুরূহ নয়, হাস্যকরও বটে। কিন্তু এটি মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা নয়। তিনি 'মধামপ্রাণাক্ষরবহুলা বাণী'র দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এটি রচনা করেছিলেন। উপরন্তু এটি তাঁর নিজস্ব রচনা নয়, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে'র একটি পংক্তির অনুবাদ :

কোকিলকলালাপবাচালো মামেতি মলয়ানিলঃ।
উচ্ছলচ্ছীকরাত্যাচ্ছনির্ঝরাম্ভ কণোক্ষিতঃ॥

অনুবাদটি সুখপাঠ্য হয় নি, তা অবশ্য স্বীকার্য। লেখক ব্যাকরণ ও শব্দশাসন আলোচনা করতে গিয়ে এই রকম নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

৭. *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* vol. I

৮. "Mr. Carey sat under his instruction two or three hours daily when in Calcutta."—Ibid.

যেমন—অল্পপ্রাণাক্ষর শ্লিষ্ট বাক্যের দৃষ্টান্ত—"ভ্রমদ্‌ভ্রমরালিঙ্গিত মালতীমালা লোলালিকুলকলিতা।" অপ্রসিদ্ধ অপবাক্য—"অনর্জুনাজন্মে সদৃক্ষাঙ্ক বলক্ষগুতে লক্ষ্মীকার।" বিশেষণযুক্ত উদার বাক্য—"নীলোৎপল ক্রীড়াসরোরুহ হেমাঙ্গ পীনপয়োধর-সুধাংশুমুখী মদঘূর্ণিতলোচনা মদনমদালসবিলাসিনী স্তনভারনমিতাঙ্গী গুরুনিতম্ব-ভারমন্থরা মলয়নন্দনগন্ধবাহ কোকিলকলকুজিত বসন্তকুসুমামোদ-সুরভীকৃত দিঙ্‌মুখ।" বলা বাহুল্য মৃত্যুঞ্জয় নানা রকম বাক্‌রীতির দৃষ্টান্ত হিসেবেই এই সমস্ত উৎকট বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। তাই দুরূহ-অন্বয়, পদবন্ধহীন ও অসমঞ্জস বাংলা গদ্য রচনার পুরোপুরি দোষটা মৃত্যুঞ্জয়ের স্কন্ধে আরোপ করা যায় না। আমাদের তো মনে হয়, মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যরীতি সম্বন্ধে রীতিমতো চিন্তা করেছিলেন, নানা ধরনের বাক্‌রীতি নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা করেছিলেন। ঠিক এই রকম রীতিসচেতন গদ্য লেখবার কোন চেষ্টা রামমোহনের রচনায় দেখা যায় না, বিদ্যাসাগরের পূর্বে প্রায় কারও ভাষাতেই এ ধরনের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে নি।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতিকে মোটামুটি কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। ১. বিশুদ্ধ সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি, বিন্যাসপদ্ধতি ও অন্বয়; ২. সাধু, পরিচ্ছন্ন ও বিবৃতিধর্মী গদ্য; ৩. চলিত, বাস্তব ও নাটকীয় সংলাপপদ্ধতি।

। 'সংস্কৃতঘেঁষা বাক্‌রীতি'॥ সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনে পরম পারঙ্গম মৃত্যুঞ্জয়ের কিছু কিছু রচনায় ও বাক্‌রীতিতে সংস্কৃত গদ্যের বিন্যাসপদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে। শব্দযোজনা, পদান্বয়, সমাসসন্ধির দ্বারা সংহত বাক্যাংশ গঠন, পুরাতন ধরনের শব্দপ্রয়োগ, শব্দের অভিধেয়ার্থকে ছেড়ে অন্বিতার্থের দিকে অধিকতর আকর্ষণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই রীতির প্রধান লক্ষণ। একটি দৃষ্টান্ত

নেওয়া যাক :

"যেমন এক মহাপটের একদেশেতে ঘট্টিত মসীলিখিত বর্ণাপূরিতাবস্থাত্রয়ে ঐ এক মহাপটের স্ত্রীপুরুষাদি বিচিত্র নানাকারতা প্রাপ্ত হয়, ও ঐ অবস্থাত্রয় লোপে শুদ্ধৈক-মহাপটস্বরূপাবস্থান হয়, তন্ন্যায় এক ভূমব্রহ্মের একদেশে ঘটজননানুকূল মৃত্তিকাচৈকণ্য-শক্তির ন্যায় স্বশক্তি ও সূক্ষ্মতৎকার্য্য ও স্থূল তৎকার্য্য সাকল্যরূপ ত্রিতয় সম্বন্ধ-কৃতাবস্থাত্রয় ভেদে মহাপটস্থলাভিষিক্ত ঐ এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্য্যামী ও হিরণগর্ভ ও বিরাট ও তদন্তর্গত ব্রহ্মাদি দুর্গাদি নানা দেবদেবী ও আর আর চরাচর জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হন।" ('বেদান্তচন্দ্রিকা')

আর একটি দৃষ্টান্ত :

"অতএব অস্মদাদি ভাষা চতুর্ব্বাহরূপে প্রবর্ত্তমানভাষাত্বহেতুক পূর্ব্বোক্তক্রম হট্টস্থ পুরুষভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষভাষার চতুর্ব্বাহরূপত্ব নিশ্চয় হয়। তবে সে অস্মদাদি ভাষায় যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি, সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতা প্রযুক্ত উপর্য্যধোভাবাবস্থিত কোমলতর বহুল কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত।" ('প্রবোধচন্দ্রিকা')

এখানে বাক্যগঠন দীর্ঘ, সমাসসন্ধি অনাবশ্যক এবং শব্দযোজনায় সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের পাণ্ডিত্য অতিপ্রকটিত—বাংলা ভাষায় এ রীতি অনভ্যস্ত ও অস্বাভাবিক। মৃত্যুঞ্জয় নানা রকম রীতির ব্যবহার জানতেন, নানা পরীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু এই দুরূহ সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতি যে বাংলা ভাষায় চলতে পারে না, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। কেন না পরিণত ও পরবর্তী রচনাতেও তিনি এই উৎকট রীতি পরিত্যাগ করতে পারেন নি। অবশ্য এর জড়তা ও দুরূহ শব্দবিন্যাস আপত্তিকর হলেও দেড় শ' বছর আগে এ ভাষা একজন

সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের লেখনী থেকে বেরিয়েছিল, এজন্য তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার্য। কিন্তু এখনও কি আমরা ভাষাগত দুরূহতার প্রলোভন ছাড়তে পেরেছি? আজকাল নবীন লেখক-সম্প্রদায় যে-রকম জটিল-কুটিলবাক্য ও শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তাতে মনে হয়—'পরা', 'পশ্যন্তি' 'মধ্যমা' ও 'বৈখরী' বাক্‌রীতির মধ্যে অতি-আধুনিক কোন কোন লেখক শেষোক্ত 'বৈখরী' রীতিকে মহানন্দে শিরোধার্য করেছেন। সাম্প্রতিক গদ্য রচনার একটু নমুনা দেওয়া যাক:

"প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিতে সম্প্রতি তারুণ্যের উন্মাদনা বিবশ অনিকেত; উন্মুক্তির প্রত্যক্ষ উপায় যেহেতু অবর্তমান, বাধ্যত অবদমন কখনো বিকৃত আপজ্ঞাতো চীৎকৃত, কখনো অসহায় নিরুদ্বেগে তমসালীন স্ফুরিত বিষাদ। সামাজিক সুস্থিতি তারুণ্যের স্বভাবী বিদ্রোহের স্বপ্নকে প্রতিহত করে এবং অধুনা সমাজ যেহেতু ক্রমঅপস্রিয়মান জরাগ্রস্ত পরিশ্রম যৌবনের সফল প্রয়াস, প্রকল্পনা বিচ্যুতি বিরোধের অপনয়নে নিঃসঙ্গ পর্বতের সামর্থ্য অথবা মহীরুহের শঙ্কিত একাকী।"

('সম্প্রতি', ১ম বর্ষ, ২য় সংকলন, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৮)

এর পাশে মৃত্যুঞ্জয়ের 'অস্মদাদি'কে নিতান্তই হামাগুড়ি-দেওয়া অপোগণ্ড বলে মনে হবে। যাই হোক সংস্কৃতগন্ধী বাক্‌রীতিই যদি মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র ভাষা হত, তাহলে তাঁকে আমরা সহজেই বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে চিরনির্বাসন দিতে পারতাম। এ রকম কৃত্রিম ভাষা ছেড়ে দিলেও, তাঁর পরিচ্ছন্ন সাধুভাষা বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যটি সুচিন্তিত ও যুক্তিগ্রাহ্য—"ফলতঃ এ সকল তর্কালঙ্কার (বিদ্যালঙ্কার) মহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার (বিদ্যালঙ্কার) মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার

গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।...নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙ্গালা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেন না, তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক —অপর দিকেও তিনি তেমনি চলিত ভাষারও আদর্শ।"

॥ সহজ সাধুভাষা ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের যথার্থ ভাষা হচ্ছে স্বাভাবিক সাধু বাংলা গদ্য। যে রীতিটি বিদ্যাসাগরের হাতে পরিণতি লাভ করেছে, এতদিন ধরে যে ভাষাতে বাঙালীর জীবন, মনন ও সাধনা ধীর-গতিতে বয়ে চলেছে, মৃত্যুঞ্জয় সেই সাধুভাষাকেই সর্বপ্রথম সার্থক-ভাবে ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর প্রাচীন সাহিত্য, মুখের বাক্‌রীতি ও পুঁথিপত্রে যে ধরনের সাধুভাষা পশ্চিমবঙ্গীয় বাচনভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় তার প্রথম শ্রীছাঁদ অবধারণ করেন। একটি দৃষ্টান্ত:

> "এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এ রাজ্য অরাজক কেন? মন্ত্রীরা কহিলেন, রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন; আমরা রাজারক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি, রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন।"
>
> ('বত্রিশ সিংহাসন')

এই হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের যথার্থ আপন ভাষা। তাঁর অধিকাংশ রচনাই এই ধরনের পরিমিত বাক্য গ্রহণ করেছে, পরবর্তী কালে এই সাধুরীতি বাংলা দেশের একমাত্র সাহিত্যের ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাধু-গদ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী চলিত ভাষার শক্তিসামর্থ্য আজকাল বিশেষ-ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু উনিশ শতকের গোড়া থেকে

বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত—প্রায় দেড়শ বছর ধরে এই সাধু-রীতিই বাংলার সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় এই রীতিটিকে বিশেষভাবে অনুশীলন ও ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর 'রাজাবলি' ও 'বত্রিশ সিংহাসনে'র মূল কাঠামো এই রীতিকেই অনুসরণ করেছে। 'হিতোপদেশে'র ভাষা অবশ্য কিঞ্চিৎ গুরুভার এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষায় শাস্ত্রবাক্যানুসরণের চিহ্ন আছে। কিন্তু 'প্রবোধচন্দ্রিকা'য় তিনি নানা রকম রীতির ব্যবহার করেছেন। তাঁর হালকা চালের সংলাপী ধরনের সাধু-রীতিও অতীব উপভোগ্য :

> "অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল, ভাই, তোমার নাম কি? সে কহিল, আমার নাম বিশ্বভণ্ড। উহা শ্রবণমাত্র হী হী করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, তবে তো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল, তোমার কি এই নাম? ইহাতে সে কহিল, না ভাই, আমার নাম বিশ্ববঞ্চক। দোঁহার নাম শব্দতঃ সমান না হউক, অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজি অবধি আমাদের বন্ধুতা হইল। ('প্রবোধচন্দ্রিকা')

এখানে লক্ষণীয় ভাষার ঠাটটি মোটামুটি সাধুভাষার অনুরূপ হলেও চলতি ইডিয়ম ও বাক্‌রীতি ভাষাকে নাটকীয় ও আখ্যানধর্মী করে তুলেছে। বস্তুতঃ নাটকীয় সংলাপ, বাস্তব চরিত্রচিত্র, একটু স্থূল ধরনের পরিহাস—এবং সর্বোপরি কল্পনার বস্তু-তদেকাত্ম ভাব (objectivity) বিচিত্র আকার ধারণ করেছে।

॥ চলিত রীতি ॥ মৃত্যুঞ্জয়ের মতো সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত মাঝে মাঝে অত্যন্ত গ্রাম্য এবং বাস্তবধর্মী নাটকীয় সংলাপের মতো যে সমস্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন, তার জন্য তিনি অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য। অবশ্য তাঁর ভাষাভঙ্গিমা মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় বাস্তব-রীতিকে অনুসরণ করেছে বলে আধুনিক কালের পাঠক তাতে কিঞ্চিৎ

বিব্রত বোধ করতে পারেন। তাঁর মতো পণ্ডিত ও ভূয়োদর্শী ব্যক্তির মনেও একটি কৌতুকপূর্ণ লঘুচপল মানুষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হত। তখন তিনি রুচির শুচিতা ভুলে, নিজ পদমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে অট্টহাস্যের কলরোলে মেতে উঠতেন। এ হচ্ছে সেই উনিশশতকী হিউমার—যা রুচির শালীনতা, সামাজিকতা ও ভব্যতার বড় একটা পরোয়া করত না। তাঁর এই ধরনের পরিহাস ও কৌতুকরস আধুনিক রুচিকে আঘাত করতে পারে আশঙ্কা করে আমরা এখানে অপেক্ষাকৃত নিরীহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এক ধূর্ত শিয়াল বাঘের অনুপস্থিতির সুযোগে ভীরু বাঘিনীর কাছে গিয়ে তর্জন-গর্জন আরম্ভ করেছে :

> "ওলো ছেঁচড়া লক্ষ্মীছাড়া মাগী, তোর ভাতার অলক্ষণে ছেঁচড় বেটা কমনে গেল ?···দুঃশীল বালীক বেটাকে প্রায় একমাস হইলো আমি প্রত্যহ খুঁজিতেছি, দেখাই পাওয়া যায় না। আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয়, বসিয়া আছি—তাহার খোঁজ-খবর নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া নাভিতে তেল দিয়া আমার দত্ত মাংস ভোজনে মাগুকে চিক্কণা করিয়া পিণ্ডীশূর গেহনর্দ্দী বেটা বসিয়া আছে। আন্ মাগী, আজি বেবাক সকল মাংস লইব, তবেই উঠিব।" ('প্রবোধচন্দ্রিকা')

দৈবগতিকে বাঘ গাছের ডালে গলা আটকে মারা পড়ল। শিয়াল নিশ্চিন্ত হয়ে সগর্বে বাঘিনীর কাছে এসে বড়াই করতে লাগল :

> "ওলো লো মাগী, কেমন, এখন হইল ? যেমন মতি তেমনি গতি। ভাতারের গরবে পা ভুয়ে পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে ? আয়, দেখসিয়া, কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল।···যা দেখ গিয়া, তোর মহাবলাক্রম পতিকে হরিকাঠ দিয়া হরি ভজাইয়া এই মর্দ্দারাম, জাজ্জ্বল্যমান বসিয়া আছেন।···যা না, দেখ গিয়া, তাহাকে···ঘুষড়িয়া লইয়া কান

মুচড়িয়া ঘাড় মুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি। বাবাজী চক্ষু তড়ঙ্গিয়া দাঁত বিদ্‌ড়িয়া পড়িয়া আছেন, বাহাদুরি ঘুবড়িয়া গিয়াছে।" ('প্রবোধচন্দ্রিকা')

এখানে হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্র ও ঈসপের গল্পের জীবজন্তুর মতো এরা মানুষের ভূমিকা অভিনয় করেছে। এর নাটকীয়তা, কৌতুক, অসঙ্গতিজনিত হাস্য-পরিহাস পরবর্তী কালের দীনবন্ধুর নাটককে স্মরণ করিয়ে দেয়। চলতি, গ্রাম্য, অভবা শব্দকে এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর পরেই বা ক'জন ব্যবহার করতে পেরেছেন ?

তাঁর এই জাতীয় রচনার আর একটা বৈশিষ্ট্য কথকতাসুলভ দীর্ঘ বাগ্‌বিস্তার। সাধুভাষা ও চলতিভষাতেও তাঁর এই মুদ্রাদোষ ছিল। দু-একটি উদাহরণই যেখানে যথেষ্ট হত, সেখানে তিনি দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতেন। এখানে আমরা একটি সাধুভাষা, আর একটি চলতিভাষার উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

১. যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা—"আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্র২ রথী, অযুত২ গজারূঢ়, লক্ষ২ অশ্বারূঢ়, নিযুত২ উষ্ট্রারূঢ়, কোটি২ অশ্বারূঢ়, অর্বুদ২ ধনুষ্ক, বৃন্দ২ অগ্নিযন্ত্র, খর্ব২ খড়্‌গচর্মধারী, শত২ কশ, তূণ, বাণ, ধনু, ঢাল, তরোয়ার, খড়্গ, বরশা, কাটার টাঙ্গি, বন্দুক, কামান, নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র পুরিয়া চালান করিলেন।"

২. "চাকরাণীরা মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেত্র, কেহ সম্মার্জনী অর্থাৎ খেঙরা, কেহ চর্ম্মপাদুকা হস্তে করিয়া ইতস্ততো অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে দেখিতে পাইয়া গর্জন তর্জন ভর্ৎসন করতঃ, 'রে রে ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার, স্ববংশ-পাংশুল, রণকাতর, যুদ্ধপরাঙ্‌মুখ নির্লজ্জ খট্বারূঢ় ব্যলীক, নিঃসাহস, সহিস কুড়িয়া বেটা, তোর নিমিত্ত আমারদের ভীম মা ভাই স্ত্রী-পুত্র খুড়া-খুড়ী, জ্যেঠা-জ্যেঠী,

ঝি-জামাই, মামা-মামী, পিসা-পিসী, মাস্থয়া-মাসী, শ্বশুর-শাশুড়ী, বেহায়ী-বেহানী, শ্যালা-শ্যালী, ভাইজ-ভাইবহু, ভাএড়াভাই, তাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নির্ম্মম নিঃস্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালনধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমুদ্যত হইয়াছেন।"

এ সমস্ত বর্ণনা বিগত যুগের কথকতার রীতি অনুসরণে পরিকল্পিত হয়েছিল, কিছুটা কৌতুকরসের দিকেও লেখকের লক্ষ্য ছিল। বাংলা দেশের বাক্‌রীতি ও ইডিয়মকে অত্যন্ত কৌশলে ব্যবহার করে এবং চলতি শব্দের গ্রাম্যতাকে ঘৃণা না করে এই পরম প্রাজ্ঞ পণ্ডিত গদ্য রচনায় একটি প্রশংসনীয় ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। "আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই", "চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরের মার গলায় গলগণ্ড", "আমানি খাইতে দাঁত ভাঙ্গিল সিঁদুর পরিব কিসে" প্রভৃতি বাংলা কৌতুক-প্রবচনগুলিকে তিনি চমৎকার ব্যবহার করেছেন। নানা রীতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, মূলতঃ সাধু-ভাষার কাঠামো নির্মাণ ও ব্যবহার করলেও, চলতি, ইতর ও গ্রাম্য শব্দ এবং বাক্যরীতিকে সাহিত্যে ঠাঁই দিয়ে তিনি কৌতুক-পরিহাস-প্রিয়তার যে পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যই তিনি বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বলে চিরদিন শ্রদ্ধা লাভ করবেন।

সতীদাহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়

১৮১৭ সালের দিকে কলকাতায় সতীদাহ প্রথা নিয়ে কিছু কিছু আন্দোলন চলছিল। ঐ সনে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারক সহগমন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান জানবার জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে অনুরোধ করেন। মৃত্যুঞ্জয় অনুরুদ্ধ হয়ে সংস্কৃতে একটি প্রতিবেদন পত্র রচনা করেন, তাতে তিনি সহগমনের চেয়ে বৈধব্য-জীবনকে অধিকতর সমর্থন করেছিলেন। বেদান্ত প্রচার বিষয়ে তাঁর ঘোরতর

প্রতিবাদী রামমোহনও একখানি পুস্তিকায় ('Some Remarks in vindication of the resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifice in India') মৃত্যুঞ্জয়ের অভিমতকে প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ সালে মৃত্যুঞ্জয় এই উদার মত ব্যক্ত করেন। রামমোহনের সহমরণবিরোধী গ্রন্থ তার পরের বছর (১৮১৮) প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত রচিত মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিবেদনখানি পাওয়া যায় নি, কিন্তু তাঁর অভিমতের সারমর্ম ১৮১৯ সালের *Friend of India*-র অক্টোবর সংখ্যায় ইংরেজীতে সংক্ষেপে মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিবৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের জজপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় প্রধান বিচারকের নির্দেশে বহু লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং ৩০ খানি অতিপ্রামাণিক স্মৃতিসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্র বিচার করে সহগমন সম্বন্ধে অভিমত দিয়েছিলেন। মনু, হারীত, বিষ্ণুমুনি প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, হয় সহগমন, আর না হয় বৈধব্য—শাস্ত্রে এই দুই ব্যাপারের সমর্থন আছে। কিন্তু স্বামীর চিতার সঙ্গে স্ত্রীকে বেঁধে জোর করে পোড়ানো তাঁর মতে অত্যন্ত অন্যায়—নারীহত্যার সামিল। এর জন্য তিনি 'সুধীকৌমুদী' ও 'নির্ণয়সিন্ধু'র মত উদ্ধৃত করেন। তারপর তিনি বলেন, শাস্ত্রে সহগমনের উল্লেখ থাকলেও এযুগে সে নির্মম বিধি কিছুতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি উপসংহারে যা বলেছিলেন সংক্ষেপে তার মর্ম : অনেক গ্রন্থ পাঠ করে আমার মতামত হচ্ছে এই—মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর অনুগমন অতীব অকর্তব্য, স্বামীহীনা স্ত্রীলোকের সঞ্জীবন ও বৈধব্যজীবন যাপনই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শাস্ত্রে সহগমনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উল্লেখ থাকলেও বৈধব্যকে সব শাস্ত্রই মান্য করেছে।

এই আশ্চর্য ঋজু মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে রামমোহনের প্রতিস্পর্ধী,

শাস্ত্রজ্ঞ, পুরাতনপন্থী এবং রক্ষণশীল মৃত্যুঞ্জয় সতীদাহ বিষয়ে রামমোহনের পূর্বেই অতিশয় উদার মতের পরিচয় দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য।

বেদান্ত ও মৃত্যুঞ্জয়

অনেকের ধারণা এদেশে রামমোহনই সর্বপ্রথম বেদান্তের চর্চা শুরু করেন। একথা ঠিক নয়। উনিশ শতকের আগে থেকে এদেশে রীতিমতো বেদান্তের অনুশীলন হত। উপনিষদ ও বেদান্ত বাংলা দেশে ষোড়শ শতক বা তার পরেও পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এ বিষয়ে আমরা পূর্বের প্রবন্ধটিতে কিছু আলোচনা করেছি (দ্রষ্টব্য : পূর্ব প্রবন্ধের 'অনুলেখ')।

এখন মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তানুশীলন সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাক। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, রামমোহনের বেদান্ত-সংক্রান্ত দু'খানা গ্রন্থ (বেদান্তগ্রন্থ—১৮১৫ ; বেদান্তসার—১৮১৫) প্রকাশের পর কলকাতায় যখন তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছিল, তখন কোন কোন পুরাতনপন্থী পণ্ডিত তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীনাথের পুস্তিকা রামমোহনের ব্যক্তিগত কুৎসাতেই পূর্ণ, শাস্ত্রবিচার ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের প্রতি অনুচিত পরিহাসবাক্য নিক্ষেপ করলেও মূলতঃ তিনি বেদান্ত ও পৌরাণিক ধর্মের তত্ত্বকথাকে রীতিমতো শাস্ত্রীয় বিচারপদ্ধতি অনুসারে আলোচনা করেছেন। তিনি রামমোহনের প্রতিবেশী হলেও বেদান্তের পরিবাদ করেন কিন্তু রামমোহনের উক্তি থেকেই ('কবিতাকারের সহিত বিচার'—১৮২০) দেখা যাচ্ছে যে, ১৮২০ সালে কলকাতা শহরের পণ্ডিত-অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ীতে ঈশ,

কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য উপনিষদের পুঁথি ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য ছিল। ওয়ার্ডের গ্রন্থে[১] আছে যে, ১৮১৭ সালেই বাগবাজারে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে বেদান্তাদি অধ্যয়নের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তিনি যে রামমোহনের দেখাদেখি বেদান্ত অনুশীলন করেছিলেন তা নয়। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসনে' স্পষ্টতঃ বেদান্তের প্রতিধ্বনি আছে :

"তিনি এক পরমেশ্বর। তাঁহার স্বরূপ এই---সর্ব্বজ্ঞ, সার্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ-ব্যাপার সাক্ষী। পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ, এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী, নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী, শ্রোত্রহীন সর্ব্ব-শ্রোতা। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না; সর্ব্বত্রস্থিত, কিন্তু সকলেরি দুর্ল্লভ। তাঁহার কেহ আধার নয়, তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ।"

মৃত্যুঞ্জয়ের এ গ্রন্থ রচনার প্রায় সমকালে রামরাম বসুর 'লিপিমালা'র (১৮০২) ভূমিকায় বলা হয়েছে—"সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।" তখন রামমোহনের কোন বাংলা গ্রন্থ রচিত হয় নি। 'লিপিমালা' ও 'বত্রিশ সিংহাসন' প্রকাশিত হবার বছর দুই পরে রামমোহনের একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক ফারসী গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতুল মুয়্‌অহাদীন' প্রকাশিত হয়। কাজেই রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদান্ত চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন, তা ঠিক নয়। তবে তিনি এই তত্ত্ব নিয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন—এইখানে তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব।

১. *A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos*—Vol. IV

মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্তচন্দ্রিকা'য় বেদান্তকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মসংস্কার (অর্থাৎ পৌরাণিক আদর্শ) ত্যাগ করেন নি। তাঁর পুস্তিকার প্রথমেই তিনি রামমোহনকে আক্রমণ করে বলেছেন, "বকধূর্ত্তদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে অনাস্থা না হয়"—কেবল এই জন্যই তিনি 'বেদান্তচন্দ্রিকা' লিখতে প্রবৃত্তি হয়েছেন। তিনি প্রথমে বেদের সকাম উপাসনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তারপর 'অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ' অর্থাৎ বেদান্ততত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—"তোমরা যদি সাংসারিক সুখাভিলাষী হও তবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষেচ্ছারূপ মহাবৃক্ষাগ্রারোহণ কদাচিৎ করিও না।" স্ব স্ব দেবতার বিহিত পূজার পর অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণান্বিত হলে তবেই মোক্ষপদ পাওয়া যায়। যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠতে গেলে আগে মূল থেকে শুরু করতে হয়, তেমনি ধীরে ধীরে কাম্যকর্মের সোপান ধরে পরমপদে আরোহণ করতে হয়। তাঁর মতে, "জ্ঞানার্থ নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দৈকরস পরমাত্মা ও তজ্ জ্ঞানানুকূলোপাসনার্থে সগুণ ব্রহ্ম এই দুইতে বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য……। অচিন্ত্যানন্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, তিনি স্বশক্তিপ্রাধান্যবিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ, দশভুজাদি রূপেতে ধ্যেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্য হন।"

ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ রূপানুশীলনই যথার্থ বেদান্তধর্মের প্রতিপাদ্য, এই হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ের বেদান্তবিষয়ক সিদ্ধান্ত। এককথায় উত্তর-বৌদ্ধ যুগ থেকে পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজে যে ধরনের দেবোপাসনা প্রণালী চলে আসছিল, মৃত্যুঞ্জয় সেই পন্থানুবর্তী ছিলেন। তিনি বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বকে পুরুষার্থের চূড়ান্ত ও পারমার্থিক পরিণাম বলে মানলেও পৌরাণিক সংস্কারকে সেই উচ্চতম পদবী আরোহণের অতিপ্রয়োজনীয় সোপান বলে মনে করতেন। রামমোহন এই

দিক থেকে নঙর্থক মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে বেদান্ত-উপনিষদ-আশ্রয়ী একেশ্বরবাদই যথার্থ আর্যধর্ম, পরবর্তী কালের স্বার্থগৃধ্নু ব্রাহ্মণসমাজের একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণতা ও পৌরাণিক সংস্কারের অবক্ষয়ী হীনাদর্শের জন্য এই পরম কাম্য ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্টসমাজে হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। তাকে পুনরুদ্ধার করে হিন্দুসমাজের শ্রেণী-জাতিসম্প্রদায়গত অলাতচক্র ভেঙে দিয়ে এক এবং অদ্বিতীয় যে পরমদৈবত, তাঁকেই একমাত্র উপাস্যরূপে প্রমাণ, প্রচার ও গ্রহণের জন্য রামমোহন একান্তভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মনে করতেন, “উপাস্য সগুণব্রহ্ম বস্তুতঃ নিরাকার হউন, তথাপি অনির্ব্বচনীয় স্ব-শক্তির আবেশ প্রযুক্ত যোগীরদের যোগবলেতে নানাকারতার ন্যায় ঐ মহাযোগী মহেশ্বর জগদাকারে বিবর্ত্তমান হইয়াছেন।” ব্রহ্ম নিরাকার-নির্গুণ-নিরুপাধিক, না সাকার-সগুণ-সোপাধিক—এই প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বলেন যে, যে-কোন ব্যক্তি নিজ নিজ শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করতে পারেন। তাঁর মতে, “আর শুন, ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু। ঘটপটাদিবৎ লৌকিক বস্তু নয়। কেবল শাস্ত্রেতে ব্রহ্ম জানা যায়। কায়িক বাচিক মানসিক ব্যাপাররূপ যে তাঁহার উপাসনা, সেও কেবল শাস্ত্রীয়।...যার যে শাস্ত্রেতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে, তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয়।” গীতার “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেন, “ঈশ্বরোপাসনা অনীশ্বরবাদী ব্যতিরেকে সর্ববাদিসম্মত।” এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মতামত নিয়ে দীর্ঘ দিন বিতর্ক চলতে পারে, বহুকাল ধরেই চলে আসছে, এবং সম্ভবতঃ আরও অনেককাল ধরে চলবে। এ সম্বন্ধে কোন এক-পক্ষের মতামতকে চূড়ান্ত বলে রায় দেওয়া যায় না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের তুলনায় নিতান্ত নির্বুদ্ধি মূঢ় টুলো পণ্ডিত ছিলেন না, এই জন্যই এত কথা বলতে হল।

যাঁরা অতীতকে গতায়ু বলে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের পৈতৃক চিহ্ন বজায় রাখতে সঙ্কুচিত হন না, তাঁরা সেকালের এই পণ্ডিত মানুষটিকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না। (১৩৬৯)

রবীন্দ্রনাথ ও উনিশ শতক

সংস্কৃতি ও জীবনসাধনা ক্ষয়হীন মর্মর-প্রাসাদ নয়। প্রাণের ধর্ম বিকশিত হওয়া, বিবর্তিত হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া। মানুষের জীবধর্মী প্রাণসত্তা সূক্ষ্মতর চৈতন্যকে অবলম্বন করে সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়। প্রাণধর্ম ও সংস্কৃতির ধর্ম মূলতঃ এক ; উভয়ের নানা রূপান্তর ও ভাবান্তরের বিকাশপরম্পরা জাতি ও মানসকে আশ্রয় করে। তাই জাতি ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়মূল ঐতিহ্যেরও রূপান্তর হতে পারে। কারণ সংস্কৃতির অর্থ—নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বহমান জীবনচেতনার নিগূঢ় নির্যাস। আমাদের বাংলা দেশের উনিশ শতকের জীবন ও সাধনার সামান্য পরিচয় নিলে একথাটাই সপ্রমাণ হবে যে, বাংলার যে-সংস্কৃতি উত্তরাপথের উত্তরাধিকার থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করেছে, সেই সংস্কৃতিই গত শতাব্দীর প্রথম দিকে রূপান্তরের সম্মুখীন হল এবং দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম সমুদ্রতীরের লবণাক্ত বায়ুবেগে বাংলার পূর্বতন ঐতিহ্যের জীর্ণ প্রাসাদ প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে পড়ল। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তখন মুঘল রাজমহিমার উজ্জ্বল দীপশিখা নিভে আসছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সহস্র-এক রজনীর রূপকথার দ্রুত অপসরণ হল এবং বহির্ভারতীয় বৈশ্যতন্ত্র রাজতখ্‌তে আসীন হল। তার পরের কথা ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু উনিশ শতকেই বোঝা গেল যে, এত দিন ধরে 'শক-হুন-দল পাঠান মোগল' ভারতীয় আর্যসভ্যতার যে মিশ্ররূপ দিয়েছিল, তার পরিবর্তন আসন্ন।

পরিবর্তন এল। রাষ্ট্রের আকার-আয়তন বদলাল, রাষ্ট্রচেতনার আমূল রূপান্তর হল, সমাজজীবনও অটুট রইল না। জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমা বাড়ল ; জম্বুদ্বীপের বাইরে যে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা রয়েছে, তার সঙ্গে

প্রথম পরিচয় হল। মধ্যযুগীয় সমাজ, ধর্ম ও ঐতিহ্যচেতনা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলেবর পরিত্যাগ করে যখন নব বেশে আবির্ভূত হল, তখন বাঙালী-মানসের জন্মান্তর হয়েছে। মধ্যযুগীয় গ্রামীণ জীবনাদর্শ ভেঙে পড়ছে, নব সভ্যতার আভ্যপীঠ কলকাতা তখন বণিক-ধনিক-মুৎসুদ্দি-আমলা-মামলার কলরবে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সুতোনুটী-গোবিন্দপুর-কলকাতার হোগ্‌লার বন যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় রাতারাতি লোপ পেল এবং রম্যা নগরী রঙ্গসজ্জা করে নতুন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হল। সে আলাদিন—শ্বেত বণিক। ধীরে ধীরে কলকাতার চার পাশ ঘিরে একটি বৈশ্য সভ্যতা গড়ে উঠল, নাগরিকতার সৃষ্টি হল। এখন আর লক্ষ্মণাবতী, গৌড়, টাঁড়া, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ নয়; এ হল কলকাতা—যার অদূরে নীল সমুদ্র, যে সমুদ্রের সঙ্গে গৈরিক গঙ্গার মিতালি, যে গঙ্গা নাগরিক সভ্যতার বাণিজ্যবাহিনী। সেই গঙ্গার তীরে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টম পুত্র, প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, দর্পনারাণ ঠাকুরের বংশধর রবীন্দ্রনাথের জন্ম হল।

১.

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দ থেকে উনিশ শতকের শেষভাগের মধ্যে বাংলা দেশের ওপর দিয়ে যে বিচিত্র পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে, তার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য-স্বীকার্য; কিন্তু বাঙালীর সমগ্র চেতনার আমূল রূপান্তরই অধিকতর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। কাজকর্মের সুবিধার জন্য ইংরেজ বণিক যৎসামান্য বিলেতী বিদ্যার চাষ আরম্ভ করেছিল। মনের উর্বর মাটিতে সামান্য আবাদ করতেই সোনা ফলল। ইংরেজী বিদ্যা বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কারকে প্রচণ্ড আঘাত দিল। ইংরেজী ভাষার মারফতে সারা পশ্চিমী সভ্যতাকে আমরা এক নজরেই চিনে নিতে

পারলাম। ঐহিক লাভ তো হলই ; সব চেয়ে বড় লাভ, দীর্ঘকালের তন্দ্রাজড়িমাকে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে আমরা জাগ্রত জীবনের রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। আম্রবনচ্ছায়াশীতল গ্রামজীবনের নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের কাল ক্রমেই হ্রস্বতর হয়ে এল। তখনও বাউল-কীর্তন-ভাটিয়ালি গানে বাংলার কুটীর ও প্রান্তর মুখরিত ছিল বটে ; কিন্তু উনিশ শতক থেকেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিমা মানবমুখী হতে আরম্ভ করল। এতদিন দেবতা, দেবতার অবতার বা ভক্ত-মানুষের কথা সাহিত্য ও জীবনে প্রধান হয়েছিল ; কিন্তু পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী য়ুরোপের জীবনবাদী সভ্যতাকে আপন বলে বেছে নিল। সুতরাং জীবনসম্মুখ তত্ত্বকথা অধিকতর জনপ্রিয় হল, রাষ্ট্রশাসন ও রাজনীতি জীবনের প্রান্তে হানা দিল, নিদ্রাতুর অজগর-সমাজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠল, স্থাবর ও স্থাণুবৎ নিশ্চল হল জঙ্গম ও গতিশীল। জীবনের বহিরঙ্গ, বাস্তব প্রয়োজন, পার্থিব আকাঙ্ক্ষা সদাসন্তুষ্ট চিত্তপ্রবাহকে কল্লোল-মুখর করে তুলল, জীবনের মূল্যমানেরও রূপান্তর হতে শুরু হল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামমোহন, ডিরোজিও-গোষ্ঠী ও 'ইয়ং বেঙ্গল', এবং বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি মনীষীদের আত্ম-নিয়োগের ফলে প্রবহমান জীবনধারাকে নতুন করে পরীক্ষা করা শুরু হল। এতদিন ধরে নির্বিচারে সবকিছুকে উদাসীনভাবে স্বীকার করা হত। এইবার এল বাদ-প্রতিবাদের যুগ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটা সমন্বয়ের রেখা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

বিচিত্র প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যেই আত্মার মুক্তি, ছন্দের পাখায় ভর করে চিদাকাশে তাঁর মহাসঞ্চরণ। সব সাহিত্যই অল্পাধিক সমাজের সঙ্গে অন্বিত। কিন্তু গীতিকবিরা আপন ব্যক্তিচেতনার হর্ম্যচূড়ায় স্বেচ্ছাবন্দী। তাই তাঁরা অনায়াসে দেশকালের বন্ধন

ছাড়াতে পারেন। অবশ্য তাঁদের কাব্যে যে দেশকালের পরিবেশ রচিত হয়, তা তাঁদেরই চেতনাসৃষ্ট দেশকাল। সুতরাং গীতিকবি যদি "সমাজ-সংসার মিছে সব" বলে পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রতীতিকে পাশ কাটিয়ে যান, তা হলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ গীতিকবি। গীতিকবির আত্মকেন্দ্রিক মনোধর্ম তাঁর অন্যান্য রচনাতেও কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-বা পরোক্ষভাবে ছায়া ফেলেছে। কিন্তু তিনি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের যে দেশকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার প্রভাব তাঁকেও যে কতখানি চঞ্চল ও কর্মব্যাকুল করে তুলেছিল, তা সেকালের সামান্য পরিচয় নিলেই জানা যাবে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ার উদ্দাম গতি অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে ; সাহিত্য, জীবন, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে খানিকটা স্থায়ী বিকাশ পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করেছে। সেই পরিমণ্ডল রবীন্দ্রনাথকেও আবিষ্ট করল। বাতাসের মধ্যে বাস করে বায়ুচাপের বাইরে যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাস করে শতাব্দীর বাণী ও বার্তার বাইরে যেতে পারেন নি। সমকালীন দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র-আন্দোলন, ঐতিহ্যচিন্তার সংঘাত-সংঘর্ষ তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় নি। তাঁকেও উনিশ শতকের ঝঞ্ঝাবাতাসে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল। তাঁর উক্তি :

> "আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচেপড়া তলোয়ারখাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটামোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতির বাইরে পড়ে গেছি। আমি

এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সত্ত বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌঁছয় নি।'

এ ১৮৬১ সালের কথা। ঠাকুরবাড়ীর সদর দেউড়ি পার হয়ে আগন্তুক পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। ইতিপূর্বে কলকাতার ইংরেজী-জানা মহলে এই নতুন কাল এসে গেছে। ঠাকুরবাড়ীতে তখন একদিকে চলেছে ঔপনিষদিক সাধনা, আর একদিকে স্বাদেশিকতার দীক্ষামন্ত্র এবং শেকস্পীয়র, ওয়াল্টার স্কটের সাহিত্যরসসম্ভোগ। তারই মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর কনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। এখন সমসাময়িক ঘটনার একটু নিরিখ নেওয়া যাক।

সিপাহী বিদ্রোহের পর রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় তিনবৎসর আগে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীনে গেল (১লা নভেম্বর, ১৮৫৮)। এর সামান্য কিছু পরে ১৮৫৯ সালে বাংলার যশোহর, খুলনা, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের রায়তেরা জমিতে নীল চাষ করতে অস্বীকার করল। ফলে মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে নীলকর সায়েবদের বিরুদ্ধে সংহত প্রতিরোধ সৃষ্টি হল। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *Hindu Patriot* পত্রে নীল আন্দোলন উপলক্ষ করে তীব্র ব্রিটিশবিরোধিতা শুরু হল। এই কৃষাণবিদ্রোহ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করল, নাটকে ছড়াগানে তার প্রভাব সঞ্চারিত হল। হরিশ মুখোপাধ্যায় নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করে শ্বেতাঙ্গরোষে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। এই সময়ে ১৮৫৯ সালের গোড়াতেই কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু হল এবং প্রায় একই সময়ে রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও প্যারীচাঁদ আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্রনাথের ছয় বৎসর বয়সের সময়ে ঠাকুরবাড়ীর তরুণেরা নব-নাট্যান্দোলনে যোগ দিলেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ,

যত্নাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী সেন (কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা), অক্ষয় চৌধুরী—এঁরা মিলিত হয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' অভিনয়ে (১৮৬৭) প্রস্তুত হলেন। এর আগেই দেশের মধ্যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন (১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়) প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮৬৫ সালের পর বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, ১৮৬৭ সালে 'Bengal Social Science Association-'এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই বছরেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 'Indian Association for the Cultivation of Science' স্থাপন করেছেন। ১৮৫৭ সালের মিউটিনির বৎসরে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দশ বছরের মধ্যে ১৮৬৭ সালের দিকে ইংরেজী-শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। একদল চাকুরীকামী মধ্যবিত্ত যুবক তখন ডেপুটি-স্বর্ণমৃগের প্রতি মহোল্লাসে ধাবমান। ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে তখন নানারকম আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করেছে। ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ত্যাগ করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ('নববিধান') গঠন করেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ শেষ পর্যন্ত ভক্তিভাবের অতিরেক ত্যাগ করতে পারলেন না। ফলে তরুণ ব্রাহ্মেরা তাঁর কথা ও কাজকে শিরোধার্য করতে অক্ষম হলেন। তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে পরিত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করলেন (১৮৭৮)। তখন রবীন্দ্রনাথ সতের বৎসরের উত্তর-কিশোর। ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত হলে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে পুরাণশ্রয়ী হিন্দু ঐতিহ্য আবার জেগে উঠল। 'বঙ্গদর্শন', 'সাধারণী', 'নবজীবন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রে বঙ্কিম ও তাঁর শিষ্যদের পরিকল্পিত ও প্রচারিত নব্য হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত হিন্দুর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করল। আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন দিনই হিন্দু ঐতিহ্যকে সর্বপ্রকারে

বর্জন করে নি। রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭) পুস্তিকায় একটি উদারতর পটভূমিকায় হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের সমন্বয়ের কথা প্রচারিত হল। কেশবচন্দ্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতারা সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেও উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে শিক্ষিত হিন্দুসমাজে বঙ্কিম-প্রচারিত তত্ত্বকথা ও ধর্মাদর্শ অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অবশ্য তার জন্য শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই দায়ী নন। তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য মূলতঃ যুক্তিবাদকে আশ্রয় করেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মে'র ভোজবাজিতে তিনি কিছুকাল সম্মোহিত হয়ে থাকলেও অচিরে নিজের যুক্তিবুদ্ধিকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি কোঁতের সঙ্গে গীতার, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, যুক্তির সঙ্গে ভক্তির সমন্বয়চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে ছিল প্রবল স্বাদেশিকতা—যে স্বাদেশিকতা বুদ্ধি-কেন্দ্রিক হলেও দেশের বহমান সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান, ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও বুদ্ধিকে কেন্দ্র করেই এঁদের চিত্তজগতে অভিযান শুরু হল। মহর্ষি শান্তভক্তির উপাসক হলেও অক্ষয়কুমারের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত বেদের অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করে নির্মোহ যুক্তি-বুদ্ধির গৌরব স্বীকার করলেন।

বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন আর একটি ব্যাপারে নতুন জীবনপ্রত্যয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালী সমাজে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করলেন। পরমহংসের উদার ধর্মমত ও মানবজীবনের সুখদুঃখের প্রতি অসীম মমতা এবং স্বামীজীর প্রচণ্ড পৌরুষ, জ্ঞানকর্মের বজ্রনির্ঘোষ এবং পতিত মানুষের প্রতি অখণ্ড প্রত্যাশা

ধর্মকলহজর্জর হিন্দুসমাজে নতুন প্রত্যয়ের অনির্বাণ আলোক পিপাসা সৃষ্টি করল।

ইতিপূর্বে ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় এবং নবগোপালের অদম্য উৎসাহে হিন্দুমেলার (চৈত্রমেলা) বার্ষিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই জাতীয়তা বা 'ন্যাশনাল' কথাটি শিক্ষিতসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করল। যদিও পাশ্চাত্যের আদর্শে চারিদিকে 'ন্যাশনালে'র ছড়াছড়ি পড়ে গেল, কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই হিন্দুমেলা থেকেই গঠনমূলক স্বাদেশিকতার যথার্থ আরম্ভ হল। এই মেলার কর্তৃপক্ষ শুধু উত্তেজনার আগুন সৃষ্টি না করে জাতির শিল্প, সাহিত্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। যখন এই মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসরের শিশুমাত্র। এই হিন্দুমেলার স্বাদেশিক আন্দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের অনেকটা অতিবাহিত হয়। একটু সন্ধান করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে, পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে হিন্দুমেলার ঐতিহ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনিশ শতকের শেষাংশের রাষ্ট্র-আন্দোলন বিশুদ্ধ রকমের রাজনৈতিক আন্দোলন। বহুদিন এই আন্দোলন একচক্ষু হরিণের মতো রাজনৈতিক উত্তেজনাকে রাজনৈতিক চেতনা বলে মনে করত। কিন্তু হিন্দুমেলার প্রধান ভূমিকা ছিল জাতির সর্বাত্মক জাগরণ সূচিত করা।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচেতনার কৌলীন্য কিন্তু অন্যপ্রকার। দেশের সামগ্রিক জাগরণ ও বিকাশকেই তিনি যথার্থ রাষ্ট্র-আন্দোলনের মূল্য দিয়েছেন; এর প্রথম শিক্ষা হয় হিন্দুমেলা থেকে। মেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৫) চৌদ্দ বৎসরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

কবিতাটির গুণাগুণ বিচার না করেও বলা যায় যে, রাজনৈতিক উদ্দীপনা, পরাধীন ভারতের জন্য লজ্জা এবং মাতৃভূমিকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দেশবাসীকে একসূত্রে মিলিত করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল একটি চতুর্দশবর্ষীয় কিশোরের কণ্ঠ থেকে। তখন চারিদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনার উন্মত্ততা শুরু হয়েছে। ক্ষুব্ধ সুরেন্দ্রনাথ ('সারেণ্ডার নট্') বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী—এঁরা ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) স্থাপন করেছেন। এঁরাই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতকে রাজনীতির দিক থেকে একসূত্রে বাঁধবার পরিকল্পনা করেন। ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ-তহবিলে সঞ্চিত টাকা আফগান যুদ্ধে ব্যয় করায় দেশে ভয়ানক অসন্তোষ দেখা দিল, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ মুখর হয়ে উঠল। এর প্রতিবিধানে পাস হল ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (১৮৭৮) : দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হল। এই বৎসরেই অস্ত্র-আইন জারি হল। সরকারের সমালোচনা বা আত্মরক্ষার ক্ষীণতম প্রচেষ্টাও রাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হল। ১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিল নিয়ে 'কালাধলা'র মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ ঘনিয়ে এল। ১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন, অস্ত্র-আইনের প্রত্যাহার, সিভিল সার্ভিসের বাধা দূর ও সংস্কার প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হল। এই ১৮৮৫ সালেই বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রথম অধিবেশন শুরু হল।

এই উত্তেজক রাজনৈতিক আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হয়েছিলেন, তার কিছু কৌতূহলজনক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মাৎসিনির 'কার্বনারি' (*Carbonari*) গুপ্তসভার অনুকরণে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ এবং ঠাকুরবাড়ীর তরুণের দল ঠনঠনের পড়ো বাড়ীতে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সভা স্থাপন করলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সভার

একটি গুপ্ত নামও দিয়েছিলেন—'হামচুপামুহাফ্'। এর কাজকর্ম হত সাঙ্কেতিক ভাষায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সেই সাঙ্কেতিক ভাষার উদ্ভাবন করেন। 'হামচুপামুহাফ্' এবং এর সাঙ্কেতিক ভাষা শুধু এই সভার দীক্ষিতেরাই জানতেন। বেদপাঠ, মড়ার খুলি, মন্ত্রগুপ্তি প্রভৃতির দ্বারা সভার উদ্যোক্তারা বেশ লোমহর্ষক অভিচারের আয়োজন করেছিলেন। "যেদিন নূতন কোন সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় (রাজনারায়ণ বসু) লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি)। উত্তরকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই সভাপর্বের রোমহর্ষক রহস্যময়তাকে কৌতুকহাস্যের দ্বারা লঘু করে বলেছেন, "অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।" কিন্তু বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ১৮৭৬-৭৭ সালের দিকে গুপ্তসমিতির পরিকল্পনা পঞ্চদশ বর্ষের কিশোরের মনেও বাসা বেঁধেছিল। অবশ্য ১৮৭১ সালে ওয়াহবি নেতা আবদুল্লা কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কলিকাতা টাউনহলের সামনে হত্যা করলেও তখনও হিন্দুসমাজে গোপনীয় ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র সংঘর্ষকে কার্যসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করা হয় নি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের গুপ্তমন্ত্রকে বিশেষ স্বীকৃতি দিতে সম্মত হন নি—'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' তার প্রমাণ। কৈশোর জীবনের উত্তেজক রাজনৈতিক আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথকে আরও কয়েকবার বিক্ষুব্ধ করেছিল। ১৮৭৬ সালে লর্ড লিটনের দিল্লী দরবারের অন্তঃসারশূন্যতাকে আক্রমণ করে কিশোর কবি লিখলেন একটি দীর্ঘ কবিতা; সেটি তিনি আবৃত্তি

করলেন হিন্দুমেলার অধিবেশনে ('রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়')। দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে নতজানু রাজন্যবর্গকে ধিক্‌কার দিয়ে লেখা কবিতাটিতে কবির যে অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত হল, তার কাব্যমূল্য যাই হোক, কবির কিশোর মনে এই ঘটনা যে কতটা তীব্র অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত করেছিল, তা আমরা এখন অনুমান করতে পারি।

২.

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত ও বাগ্‌বিতণ্ডা রবীন্দ্রনাথকে যে কীভাবে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করল, তা সমসাময়িক ঘটনার সামান্য পরিচয় নিলেই দেখা যাবে। ১২৮৮ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার স্বরূপ এবং শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নিয়ে নিতান্ত তরুণ বয়সে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন, তাতে তাঁর গঠনপন্থী ও ক্রিয়াবান মন ও প্রাণের বলিষ্ঠ স্বরূপ ফুটে উঠল। পাশ্চাত্য জাতির লোভলোলুপতা সারা বিশ্বে যে কিরকম মারণযজ্ঞের আয়োজন করছিল, ঐ বৎসরের 'ভারতী'তে তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। ১২৮৮-৮৯ সালের মধ্যে 'ভারতী' পত্রে তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৩ সালে (১২৯০) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। উপন্যাসটির শিল্পকলার বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজন নেই। কিন্তু কবি যে কৈশোরের 'সঞ্জীবনী সভা'র উত্তেজনা কাটিয়ে উঠে উদ্ধত জঙ্গী মনোভাবের প্রতি বিরূপ হয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই উপন্যাসে—প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে তিনি যা বলেছেন, তা থেকে তাঁর মতটি পরিস্ফুট হবে—"স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলা দেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি যে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে

ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।···আমি যে সময়ে এই বই অসঙ্কোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।" কথাটা ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে অতিশয় সত্য। উদ্ধত, সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে এই সময় থেকে প্রবল হতে থাকে—এখানে তার সূত্রপাত। এই একই কারণে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না।*

শাসকশক্তির মূঢ়তার ফলে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমেই উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠল। আবেদন-নিবেদনের ভাষাও শানিত হল। ইলবার্ট বিলের ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ অগ্নিবর্ষী বাগ্মিতার গুণে চারিদিকে উত্তেজনা সঞ্চার করেছিলেন। ভারত সরকার মিথ্যা অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথকে কয়েদ করলেন। তখন সারা কলকাতার ছাত্র ও যুবসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অথচ বিস্ময়ের বিষয় রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'ভারতী' পত্রে রাজনৈতিক প্রবন্ধের সূচনা করলেও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেফতার প্রসঙ্গে নীরব রইলেন। জনসমুদ্রের জোয়ার যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। এই সময়ে উনিশ শতকের উত্তপ্ত আন্দোলন থেকে তিনি যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার অবশ্য মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কলকাতায় ছিলেন না বলেই এই রাজনৈতিক উত্তেজনার খবর রাখতেন না। "তখন তিনি কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট বাস করিতেছিলেন, কলিকাতার ছাত্রজনতার উত্তেজনা তিনি দেখেন নাই, দেখিলে কবির স্পর্শচেতন মন নিশ্চয়ই সাড়া দিত।" (রবীন্দ্র-জীবনী

* বিপিনবিহারী গুপ্ত—'পুরাতন প্রসঙ্গ'

—১ম)। আমাদের কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ হয়। ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করে কলকাতার জনবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক 'এ্যাজিটেশন'-এর প্রতি সম্ভবতঃ কবি আকৃষ্ট হন নি। ১২৮৯ থেকে ১২৯৩ সনের মধ্যে তিনি এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈষৎ আক্রমণ করেছিলেন। প্রতিবাদ ক্রমে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর উক্তি, "আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।...ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।" কবি প্রথম যৌবনে উনিশ শতকী রাষ্ট্র-আন্দোলনের কোটালের জোয়ারে ভেসে না গিয়ে দেশচেতনার বিরাট পটভূমিকায় সমগ্র জাতিমানসের নবজাগরণের পরিকল্পনা করলেন। কৈশোরে সঞ্জীবনী সভা-প্রসঙ্গে "উত্তেজনার আগুন পোহানো" ('জীবনস্মৃতি') একদা তাঁর কাছে কৌতুকজনক মনে হয়েছিল ; যৌবনে রাজনৈতিক তাণ্ডবের দিনে তাতে বিতৃষ্ণা এল। বাক্‌সর্বস্ব আন্দোলন, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং ইংরেজবিরোধিতার দ্বারা জাতি যে কোন দিক দিয়েই লাভবান হবে না, রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে সুদৃঢ় স্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করলেন। 'স্বদেশী সমাজ'-এ তিনি পরবর্তী কালে যা বলেছেন, প্রথম যৌবনে স্পষ্ট করে সেই কথাটাই উচ্চারণ করলেন : "ছোট কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ডমূর্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র। আমাদের চারিদিকে আমাদের আশেপাশে আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্র।" রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে যে ধরনের জাতি, জীবন ও রাজনীতির সর্বাঙ্গীণ মূর্তি অঙ্কন করেছেন—'আত্মশক্তি'তে যার যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে, উনিশ শতকের অষ্টম দশকের দিকেও সেই আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। পরবর্তী কালে বড়লাটের মন্ত্রীসভায় ভারতীয় নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ ('মন্ত্রী অভিষেক'—ভারতী, ১২৯৭) রচনা করলেন, কিন্তু এর ভাষা যথেষ্ট প্রখর হল না। ইংরেজ সরকারের

প্রতি অভিযোগ থাকলেও তাতে তখনও অবিশ্বাস বা ঘৃণা সঞ্চারিত হয় নি।

কিন্তু ক্রমেই বিতৃষ্ণা এল। 'সাধনা'য় (১৩০১) 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি দেখালেন যে, ক্রোধের বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রয়োগ না করে সমগ্র জাতি ও মানসের উন্নয়ন সাধনই যথার্থ রাজনৈতিক চেতনা। 'সাধনা' পত্রে তিনি নানা প্রবন্ধে রাজনৈতিক জীবনের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন। 'রাজা-প্রজা' গ্রন্থে সেই সমস্ত প্রবন্ধ সঙ্কলিত হল। তিনি দেখলেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন আবেদন-নিবেদন ও মান-অভিমানের পালা ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারে নি। আমরা উচ্চশিক্ষিতেরা বিদেশী শাসকের কাছ থেকে চাকুরী ও খেতাব আদায়ের জন্য দল বেঁধে আন্দোলন করেছি, সমস্ত দেশকে ডাকতে পারি নি। কংগ্রেসের অধিবেশনে আলাপ-আলোচনা—সমস্তই ইংরেজিতে হত। সুতরাং সে প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন মূলতঃ কাদের জন্য? রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে—'আত্মশক্তি' গ্রন্থে সেই কথাটা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তিলকের কারাবরণ উপলক্ষ করে সারা দেশে যে আন্দোলন সৃষ্টি হল, রবীন্দ্রনাথ তার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারলেন না। 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধে তিনি সরকারী অন্যায়ের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করলেন, প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিলেন, তাতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কিন্তু কেবলই তাঁর মনে হতে লাগল, "কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না।" উনিশ শতকের শেষার্ধের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে তিনি যেন মনে মনে ক্লান্ত হয়ে উঠছিলেন। শঙ্কার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, সরকারী চণ্ডনীতির প্রতিক্রিয়ার বশে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রকাশ্য পথ ছেড়ে সুড়ঙ্গপথে ভীষণের অভিসারে যাত্রা করতে উন্মুখ। হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে উনিশ

শতকের যাবতীয় স্বাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, মনে-প্রাণে স্বদেশসেবার ব্রত নিয়ে তিনি এই ধরনের নির্জলা রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কবি সারা জীবন ধরে যে-কথা প্রচার করেছেন, তা হল জীবনের সর্বাঙ্গীণতা, সম্পূর্ণতা—মানবতার অখণ্ড অবিভাজ্য গোটা রূপ। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজ, জীবন, সাধনা ও ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে শুধু উত্তেজনাময় উত্তাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল দেখে তিনি মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। এর পরে বিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশবিভাগ নিয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হল, কবি তাকে একটা সামগ্রিক দেশচেতনার বিশাল রক্তশতদলে স্থাপন করতে অভিলাষী হলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বাঙালীর উজ্জীবন নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করলেন। অবশ্য এর পরেও এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি কতটুকু যোগাযোগ রাখতে পারলেন, তার ইতিহাস এখানে আলোচনার অবকাশ নেই; তবে এইটুকু লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ-পরম্পরার সঙ্গে নিবিড় যোগ রেখেছিলেন; কোথাও তার পক্ষ নিয়ে, কোথাও-বা তার বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে উনিশ শতকের জাগ্রত চেতনাকে নিজ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৩.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী-মানসের আর একটি স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। প্রাচীন ঐতিহ্য ও পুরাণ-সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনের বাতায়নে বসে নিরীক্ষণ করা এই সময়ের বাঙালীর সাহিত্য ও চিন্তার একটা সাধারণ লক্ষণ। ইতিপূর্বে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ বেদ, উপনিষদ ও বেদান্তের আদর্শ সম্বন্ধে নিজেরাও অবহিত হয়েছিলেন, দেশবাসীকেও অবহিত করতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধের সুযোগে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আবার প্রাধান্য অর্জনে প্রস্তুত হল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ যে নব্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বলে পরিচিত হয়েছে, সেটি কিছু অযৌক্তিক নয়। হিন্দুধর্মের এই পুনর্জাগরণকে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদ্‌গামিতা বলে উনার্থক মন্তব্য করেছেন। আমরা সে-সব মতবিরোধের জল্পনা ছেড়ে দিয়ে সহজদৃষ্টিতে দেখতে পাব যে, হিন্দুধর্মের স্বাতন্ত্র্যলাভের এই যুগে একটি ভক্তি-আশ্রয়ী, আর একটি জ্ঞান-আশ্রয়ী মতবাদ শিক্ষিত মহলে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন এবং শিশিরকুমার ঘোষ বৈষ্ণব ভক্তিবাদকেই একটু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দর্শন করলেন। আধুনিক বলতে পুরাতনী ভক্তির সঙ্গে আধুনিক মানবতন্ত্রবাদের সাযুজ্য-সাধন বুঝতে হবে। কেশব-চন্দ্রের মনেও এই ভক্তিবাদ একদা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মতো তিনিও সদলবলে নগ্নপদে খোল করতাল সহ নগরসংকীর্তনে যেতেন, তাঁর ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হত :

> "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
> যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার।"

অবশ্য তিনি কৃষ্ণের মানবতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অনুচর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় তাঁরই প্রভাবে 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মে' (১৮৮৯ খ্রী: অ:) কৃষ্ণের ভাগবত ধর্মকে আধুনিক, ঐতিহাসিক ও মানববাদী আদর্শের স্বরূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যেরা হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার অনুকূলে ব্যাখ্যায় অগ্রসর হলেন। অবশ্য 'বঙ্গবাসী', 'সাহিত্য', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটা উগ্র ধরনের হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ ও স্মার্ত আচার-আচরণ-প্রণালী শিক্ষিত সমাজে জনপ্রিয় হবার প্রয়াসী হল। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটা ক্রান্তিকারী ঘটনা। এঁদের আবির্ভাবের ফলে ভক্তি,

যুক্তি ও মানবপ্রেমকে একসূত্রে বিধৃত করার চেষ্টা যুবসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সার্থক হল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, উনিশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর আত্মজাগরণের গৌরবকে নিজ চিন্তা ও কর্মে গ্রহণ করেছিলেন। তেমনি এই যুগের সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনের অনেকটা তাঁর প্রীতিকর না হলেও এদিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেন নি। কবি বাল্যকাল থেকেই আদি ব্রাহ্মসমাজের শান্ত-স্থিতধী ঔপনিষদিক ভক্তিরসে লালিত হয়েছিলেন; এটাই ছিল তাঁদের কৌলিক আদর্শ। তাঁর এই উক্তিটি তাঁদের পারিবারিক আদর্শকে এক নিরিখেই ফুটিয়ে তুলেছে:

> "উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি।"

এই নিরুদ্বেগ ধর্মবোধের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ দু'হাত পেতে নিলেও সমকালীন বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের উত্তাপকে তিনি যে একেবারে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তা মনে হয় না। উনিশ শতকের মানবীবাদ ও যৌক্তিকতা তাঁর কাছে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজ যখন অন্তর্বিরোধের ফলে দ্বিধা হয়ে যাচ্ছিল এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ বালকমাত্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও নব্য ব্রাহ্মদের মতান্তরের সময়ে (১৮৭৮) রবীন্দ্রনাথ নবীন যুবক। তিনি উত্তরকালে নব্য ব্রাহ্মদের হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব বোধহয় সমর্থন করতে পারেন

নি—যেমন পারেন নি, 'সাধারণী', 'নবজীবন', 'প্রচার'-এ বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের পৌরাণিক হিন্দুমতের অকুণ্ঠ অনুসরণ। তাঁর অভিমতটি উদার ও যুক্তিপূর্ণ—"হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলা-গুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র" ('ভারতী', শ্রাবণ, ১২৯১)। চন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর গুরুর (শশধর তর্কচূড়ামণি) অযৌক্তিক 'আর্যামি'র হাস্যকর অভিমান রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হল। ঊনপঞ্চাশী পবনের উন্মত্ততার সময় স্থিতপ্রজ্ঞ হবার সাধনা করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে ব্রাহ্ম-হিন্দুর কলহ এবং 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী'র তর্কযুদ্ধের মলিনতার মাঝখানে কিছুকাল আটক হয়ে পড়েছিলেন। হিন্দুর পৌরাণিক সনাতন ধর্মের জয়গান করতে গিয়ে সমকালীন সাহিত্যরথীদের অনেকের কণ্ঠস্বর ক্রমেই তালেবেতালে চৌদুনে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী আধুনিক মনোভাব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জঙ্গী প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হল। শশধর তর্কচূড়ামণি-পরিবেশিত বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম নামক 'দিল্লীকা লাড্ডু' অনেকেই মহানন্দে চর্বণ করতে লাগলেন। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১২৯০ সনের দিকে সহসা অবতারত্ব লাভ করে সমস্যা আরও জটিল করে তুললেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ভূ-ভার হরণের জন্য কল্কি-অবতার হয়ে তিনি গৌড়ধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সমস্ত আর্যামির জ্যাঠামি রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসহ মনে হল। তিনি বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে এই বিষয় উল্লেখ করে একটি ব্যঙ্গপত্র লিখলেন:

"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।"

এই সময় পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম হঠাৎ শক্তি অর্জনের চেষ্টায় যা কিছু প্রাচীন এবং পুঁথিগত, তাকেই শিরোধার্য করে উদ্ধত আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। চন্দ্রনাথ বসুই ছিলেন এই দলের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠাবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি তথাকথিত সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিটি অক্ষরকে আধুনিক কালে প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সেই উত্তেজনার দিনে রবীন্দ্রনাথ কবিতার দ্বিরদহর্ম্যে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না—'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং চন্দ্রনাথ বসুকেই বোধ হয় ব্যঙ্গ করে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় 'দামু ও চামু' কবিতা লিখে অনর্থক বাদানুবাদের সম্মুখীন হলেন। কবিতাটির ব্যঙ্গের সুর তীব্র হয়েছে এবং সর্বত্র সুরুচির মান রক্ষিত হয় নি। অবশ্য 'হিং টিং ছট', কিছু ব্যঙ্গনাটিকা, 'মানসী'র কিছু কবিতায় পরোক্ষে এবং 'ভারতী'তে প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর আদর্শের পক্ষ থেকে এই সমস্ত হিন্দুয়ানীর বুদ্ধিহীন উগ্রতাকে তিনি আক্রমণ করলেন। সে যুগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সবচেয়ে মান্য করতেন। সেই বঙ্কিমচন্দ্রই যখন এই পাগলামির বিরুদ্ধে যথোচিত কঠোর হতে পারলেন না, তখন তরুণ কবির মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হল। ক্ষোভ অনেক সময়ে সত্যদৃষ্টি কেড়ে নেয়। এই মতামতের ধূলিঝড়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অস্বচ্ছদৃষ্টি হয়ে পড়েছিলেন। বাল্যবিবাহ, লয়তত্ত্ব, নিরামিষ-আমিষ আহার ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তিনিও সমান তালে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দ্বৈরথে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। চন্দ্রনাথের মানসিক একগুঁয়েমি ও যুক্তিহীনতাকে নমনীয় করিতে গিয়ে তরুণ কবি অনর্থক কালিকলম ও সময়ের অপব্যয় করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁকে বিপরীত পথের প্রতি কিছু অনুকূল হতে দেখে সাভিমানে বললেন, "বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন একথা মুহূর্তকালের জন্যও

প্রণিধানযোগ্য নহে” ('সাধনা', পৌষ, ১২৯৮)।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন কোঁতের ধ্রুববাদের বিশেষ ভক্ত এবং কোঁৎ ও গীতার সমীকরণের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। এই নিয়ে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্কিমের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎকে হিন্দু বানাবার চেষ্টা 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীতিকর হয় নি। এই পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎ-সংক্রান্ত মতের প্রখর সমালোচনা করলেন। ফলে হিন্দুসম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' এবং ব্রাহ্মমতের মুখপত্র 'সঞ্জীবনী'তে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে কলহ ঘনিয়ে এল। ১২৯১ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার এবং রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হলেন। ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাদপ্রতিবাদ করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মতের সাক্ষাৎভাবে প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু 'প্রচার' ও 'নবজীবন'-এ বঙ্কিমের নব্য হিন্দুধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবেই সেই মতামতের প্রতিবাদ আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার'-এর প্রথম সংখ্যায় 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকৃত হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। সেখানে তিনি বলেন যে, যে-হিন্দু শুধু পূজাপাঠ, বারব্রত, উপবাস প্রভৃতি স্মার্ত কৃত্য করে, কিন্তু মানুষের মহৎ ধর্ম ত্যাগ করে নীচতার আশ্রয় নেয়, সে হিন্দুই নয়। কিন্তু আর একজন হিন্দুর প্রসঙ্গে তিনি বললেন :

> “আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান।…যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা-আহ্নিক ক্রিয়াকর্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক

যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"—('প্রচার')

বলা বাহুল্য এই মত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও ঔদার্যব্যঞ্জক। এতে যথার্থতঃ আপত্তি হবার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর যুগপুরুষ; এই উক্তিতে সেই যুগধর্মেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। পুঁথির চেয়ে প্রাণ বড়, স্মার্তকৃত্যের চেয়ে মানবকৃত্য শ্রেষ্ঠ—এই কথাটাকে বঙ্কিম নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসার্হ। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের মধ্যেও ত্রুটি আবিষ্কার করলেন। তিনি এর প্রতিবাদে 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলতে চাইলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই অযৌক্তিক উক্তির দ্বারা সত্যকারের ধর্ম ও নীতির মূলে ছিদ্র খননে ব্রতী হয়েছেন। অসত্য, অন্যায়, অসদাচরণ সর্বথা পাপ—কোন অবস্থাতেই সহনীয় নয়, পশ্চাতে সদিচ্ছা থাকলেও নয়। তাঁর বাঁকা মন্তব্য লক্ষণীয়—"কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না" ('ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১২৯১)। তাঁর এই অবিনয়ী উক্তির ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুকাল মনকষাকষি চলেছিল। অবশ্য এই তর্ক-বিতর্কে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্র যে স্নিগ্ধ ক্ষমাসুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, যুবক রবীন্দ্রনাথের তীব্র উক্তিতে সেরূপ ঔদার্য প্রকাশিত হয় নি। ধর্ম-কলহের উত্তাপ একদা রবীন্দ্রনাথকে অসতর্ক ও অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। সেই অসহিষ্ণুতা তাঁর আক্রমণোদ্যত ভাষায় প্রকট হয়ে পড়ল—"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।...একথা কেহ ভাবিতেছেন না

যে, যে-সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচারণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধাসহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন ?" ('ভাবতী')

বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্দপ্ত মন্তব্যে একটু ব্যথা পেলেও বিরূপ হন নি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ কবতেন, রবীন্দ্রনাথের ওপর বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা তিনি জানতেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধত আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে বললেন, "রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ-স্বভাব এবং আমাব বিশেষ প্রীতি, যত্ন এব প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে যে কয়পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি" ('প্রচাব'—১২৯৯)। এই বড় ছায়াটি—আদি ব্রাহ্মসমাজ। উনিশ শতকের ধর্মকলহ রবীন্দ্রনাথের শান্তস্নিগ্ধ চিত্তকে কতটা উদ্বেজিত করেছিল, এই প্রসঙ্গে তার সাক্ষাৎ মিলবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল, বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের আগেই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল, হিন্দুমুসলমানের বিবোধের বীজও জল-সিঞ্চিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনার মাদকরসে যে কী পরিমাণে মেতে উঠেছিলেন, এই সময়কার গল্প-প্রবন্ধে তাব পরিচয় মিলবে। উনিশ শতকেব সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মান্দোলনের উচ্চকিত কোলাহলে তাঁর মত আত্মতন্ত্রী গীতিকবিও হাটের পথে নেমেছিলেন ; দৈনন্দিন জীবনের ধূলি-বালি স্পর্শ করে

যুবক রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীর নবজাগরণের সমস্ত তরঙ্গাভিঘাতকে নিজের চিত্ততটে সহ্য করেছিলেন, স্বীকার করেছিলেন। কবিতায় তিনি বলেছেন—

“এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরেব নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আব।”

সত্যই তিনি উনিশ শতকের সংসারের তীরে উপনীত হয়েছেন, অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়াকে ক্ষণকালেব জন্য পরিত্যাগ করে বাইরের মানবযাত্রায় সাগ্রহে যোগ দিয়েছেন। তদানীন্তন ইতিহাসের মধ্যেই তাঁর শতাব্দী-চেতনার যথার্থ স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হবে।

১.

"ইতি হ আস" যে যথার্থ ইতিহাস নয়, তা বোধ হয় অধুনা ইতিহাস-রসিকেরাই স্বীকার করবেন। অনেকেই সঙ্কোচে বলেন যে, প্রাচীন ভারতে আর কিছু থাক আর নাই থাক, ইতিহাস যে ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশ ও কালের সমবায়ী সত্তার নাম ইতিহাস। ঘটনা বলতে গেলেই তার একটা পরিমিত কালবন্ধন ও ভৌগোলিক সংস্থান-চেতনা এসে পড়ে। 'ইতি হ আস' (এইরূপই ছিল)—অর্থাৎ কিনা ইতিহাস হচ্ছে অতীত ঘটনাপরম্পরার যথাযথ বিবৃতি। প্রাচীন ভারত সনতারিখের ক্রনলজি সম্বন্ধে প্রায় সর্বদা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছে। এদেশে দীর্ঘকাল ধরে মাটির প্রতি মায়া মায়াবাদ বলে বর্জিত হয়েছে। ফলে বিদেশীর ভারত আক্রমণই হোক, অথবা ভারতের নিজস্ব জীবনকথার কালগত পরিমাপই হোক—কোন বিষয়েই প্রাচীন ভারতের কালবিচাব নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিক সন্তুষ্ট হতে পাবেন না। কাল সম্বন্ধে আমরা নির্বিকল্প। তাই আমাদের কাছে ব্রহ্মার ষষ্টিসহস্র বর্ষ যেন ঘণ্টামিনিটের ব্যাপার বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য জাতি এবিষয়ে খুব সতর্ক; সনতারিখের নজির না মিলিয়ে এঁরা এক পাও অগ্রসর হন না। তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সন্ধান করতে এসে 'পাথুরে প্রমাণ' ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পান না এবং ইতিহাসচেতনার প্রতি ভারতবর্ষের উদাসীনতাকে জগতের প্রতি অনাস্থা মনে করে ভারতসভ্যতার ত্রুটি ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আধুনিক কালে যিনি ইতিহাস-দর্শনের ছাত্র, তিনি কিন্তু ইতিহাস

বলতে শুধু 'ইতি হ আস'-কে গ্রহণ করতে রাজী হবেন না। তাঁর মতে, বোধ হয়, সনতারিখের ব্যূহসজ্জা এবং অতীত ঘটনার তালিকা-বর্ণনা ইতিহাস-চেতনার নিতান্তই প্রাথমিক ব্যাপার। ইতিহাসের অর্থ—ঘটনার বিবৃতি নয়, ঘটনার ব্যাখ্যান; সনতারিখের সমরসজ্জা নয়, দেশ ও কালের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ। কাশ্মীরী কবি কহ্লণ তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'-তে ইতিহাস সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তাঁর মতে ইতিহাসের মূল কথা—'ভূতার্থকথন', অর্থাৎ অতীতের তাৎপর্য, প্রাচীনের ব্যাখ্যান। আধুনিক ইতিহাসকারও ভারত-কথনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে চান।

প্রাচীন ভারত সনতারিখের হিসাব রাখে নি বটে; কিন্তু পুরাণে-মহাকাব্যে-স্মৃতিসংহিতায় ইতিহাসের যথার্থ স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে নানারূপ বিচিত্র বর্ণনা এবং অনৈসর্গিক প্রাচুর্য সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের সত্যকারের ইতিহাস, তার জনজীবনধারা, তার মন ও প্রাণের স্বরূপ এর মধ্যে সংগুপ্ত অবস্থায় আছে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা সে দিকটাকে অনেক সময় উপেক্ষা করেছেন, বা অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কেউ-বা সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক অংশগুলিকে রূপক বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বার বার ধিক্কার দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের ইতিহাস নেই; এবং ইতিহাস যখন নেই, তখন অতীত ছিল না এবং ভবিষ্যৎ-ও থাকবে না; থাকবে শুধু বর্তমান—ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিবৃত্ত!

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে দেখি, বিদ্যাসাগর নিজে একজন ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক ছিলেন, দেশী বিদেশী বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বোধ হয় বাংলার একখানি মৌলিক ইতিহাস লেখবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কর্মযোগী মহাপুরুষের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের লেখা ভারতের ইতিহাসে মাঝে মাঝে যে অজ্ঞতা এবং বিজয়ী-জাতিসুলভ দাম্ভিকতা ফুটে উঠেছে,

তা' উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী পাঠ্যকেতাব হিসেবে মুখস্ত করলেও মনে মনে এই সমস্ত মিথ্যা জল্পনাকে কখনও মেনে নিতে পারে নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নজিরের প্রতি নজর রেখে ভারতের যথার্থ পুরাতত্ত্ব সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর শিষ্যমণ্ডলীও ভারত ও বাংলার ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন।* সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উনিশ শতকে বাংলার যে নবজাগরণ হল, ইতিহাস-চেতনা তার একটা বড় লক্ষণ। রেনেসাঁসের য়ুরোপ যেমন নতুন করে প্রাচীন ইতিহাস-সমুদ্রে অবগাহন করেছিল, উনিশ শতকের বাংলা দেশও সেই রকম প্রাচীন ভারত ও বাংলার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করে জাতি ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ঐতিহাসিক চেতনার উদ্বোধন করলেন: "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।" অন্য প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন: "কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।" একথা তিনি বলেছিলেন ১৮৮২ সালে ('বঙ্গদর্শন', ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ)। 'ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান'—এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপের কথা ইঙ্গিত করেছেন এবং সে ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠল এই প্রবন্ধ রচনার কুড়ি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধে। ১৩০৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখলেন, তাতেই সর্বপ্রথম ভারত-ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপ

* প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, ইতিহাসে অতিশয় অনুরক্ত স্বামী বিবেকানন্দও ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের অভিপ্রায়ে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

ধরা পড়ল ; এদেশের প্রবহমান ঐতিহ্যের প্রাণরহস্য প্রকাণ্ড আলোকে আত্মপ্রকাশ করল।

২.

ভারত-ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল বিরোধের মধ্যে মিলন, বিবিধের মধ্যে ঐক্য। এই স্বরূপটা পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রায় অনুপস্থিত। এই যে বৃহৎ ভারতবর্ষ, এখানে বিধাতার সৃষ্টির একটা বড় রকমের পরীক্ষা হয়েছে ; এখানে প্রাচীনকাল থেকে কত জাতি বহু নদনদী-গিরিদরী পার হয়ে এসেছে। কেউ এসেছে লোভের বশে, কেউ এসেছে জিগীষার তাড়নায়, কেউ এসেছে বীরের বেশে, কেউ এসেছে প্রাণহননের পাশব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু ক্রমে রক্তের তাণ্ডব প্রশমিত হয়েছে ; আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়, যবন-শক-হূন, তাতার-তুর্কী-খোরাসানী-মোঙ্গল—সবই শেষ পর্যন্ত "এক দেহে হ'ল লীন"। এই ঐক্যের স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার সবচেয়ে সার্থক দান। ভারতবর্ষের এই ঐক্য বহু সংঘর্ষ সহ্য করে নিজ সত্তা রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন :

> "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, একথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে ; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

ভারতবর্ষের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের প্রাণতত্ত্বটি

রবীন্দ্রনাথের এই গাঢ়বদ্ধ উক্তির মধ্যে আশ্চর্য স্বচ্ছরূপে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষাণদের (যেমন 'নীল আন্দোলন') মধ্যেও খানিকটা অর্থনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং ইংরেজ রাজত্বের ঈশ্বরাদিষ্ট মহিমা সম্বন্ধে অনেকেরই স্বপ্নভঙ্গ হতে আরম্ভ করেছিল। ঠাকুর-বাড়ীর উদ্যোগে এবং নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে 'হিন্দু মেলা'র (১৮৬৭) অধিবেশনে সর্বপ্রথম স্বদেশচেতনা বাস্তব আকারে স্ফূর্তি লাভ করল। দেশকে নতুন করে চেনা, ইতরভদ্রের সঙ্গে মিলনের প্রচেষ্টা, দেশী শিল্পকে আবার সমাজে প্রচার করা প্রভৃতি গঠনমূলক স্বাদেশিকতা সর্বপ্রথম এই বার্ষিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তখন পালে উত্তেজনার হাওয়া লেগেছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৭৬)-এর আন্দোলন এবং ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে সীমাবদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ-বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়ছিল। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি উগ্র উত্তেজনার প্রতিষেধকরূপে কাজ করেছিল। তিনি ইতিহাসকে স্বদেশমন্ত্রের দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছিলেন বটে, কিন্তু কোথাও স্বেচ্ছাক্রমে ঐতিহাসিক মনোভাব পরিত্যাগ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই রাজনৈতিক আবহাওয়ার উত্তাপকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। তিনি উনিশ শতকের শেষের দিকে 'সাধনা' পত্রে স্বাদেশিকতার স্বরূপ নির্ধারণ করতে আরম্ভ করলেন এবং নিছক রাজনৈতিক উত্তেজনাকে বাদ দিয়ে বরং দেশকে সামগ্রিক চেতনার পক্ষ থেকে আহ্বান করলেন। বিদেশী শাসনকে তিনি নিন্দা করলেন বটে, কিন্তু সে নিন্দার কারণ এই নয় যে, মধ্যবিত্ত সমাজ যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে না। ইংরেজ আমলে ভারত-ইতিহাসের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে, জাতি ও জীবনের সামগ্রিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। যখন বাংলা দেশে শুধু ক্ষমতা-পদ-চাকুরীকামী রাজনৈতিক কলরব আকাশ-

বাতাসকে বিদীর্ণ করে ফেলছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তচিত্তে ভারতের ইতিহাস-দেবতার রথচক্রের দিক-নির্দেশ করেছিলেন।

বিদেশীরা ভারতবর্ষকে জানে না। ঔপনিবেশিক ও বণিগ্‌ধর্মী য়ুরোপ ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে ভারতের যথার্থ পরিচয় পায় নি। দেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, সমাজ, ভাষা, আচার-আচরণ থাকলেও চিরদিনই সেটা ভারতবর্ষকে ঘিরে একটা সমগ্র দেশ-চেতনা বজায় রেখেছিল। জৈন মহাবীর বাংলায় এসেছিলেন, দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্য ভারতের চতুঃসীমায় চারটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন, চৈতন্যদেব উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে যুগে যাঁরা কোন নতুন কথা, কোন নতুন প্রেরণার আদর্শ বলতে চেয়েছেন তাঁরা সমস্ত ভারতের কর্ণগোচর করবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, শুধু নিজ নিজ আঞ্চলিকতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। আধুনিক কালে ইংরেজী সভ্যতা ও শাসনপ্রণালীই যে আমাদের ভারত-ঐক্য দান করেছে তা ঠিক নয়। মধ্যযুগে বা তারও আগে এই জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা মমতাবোধ ছিল। তবে সে মমতা বা ঐক্যবোধ মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, রাজনৈতিক জনতাকে এক-খোঁয়াড়ে পুরে যে ঐক্যের পরিকল্পনা, তা ইংরেজের শাসন-কারখানাঘরের সৃষ্টি—যার থেকে ১৯শ শতাব্দীতে আমরা স্বজাতিকামী ও পরজাতিদ্বেষী ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর পাঠ নিয়েছিলাম। কিন্তু বিভিন্নতাকে জোর করে রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্যে আনা যায় না, এই সত্যটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকায় যাঁরা বাস্তু-নির্মাণ করেছেন, তাঁরা ভিন্নদেশবাসী ও পৃথগ্‌ভাষী হলেও আমেরিকার ধরনধারণ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিজ দেশ, ভাষা ও আচার-আচরণকে যথাসম্ভব ভুলতে চেষ্টা করেছেন। আমেরিকার সংস্কৃতির অর্থ একাকারের ইতিহাস, ঐক্যের ইতিহাস নয়। একাকারের মূলকথা—বিবিধ, বি-বহু,

বিচিত্রের পৃথক সত্তাকে জোর করে বা, কৌশলে চূর্ণ করে একটি রাসায়নিক মিশ্র পাদার্থ তৈরি করা। ভারতবর্ষের ইতিহাস ঐক্যের ইতিহাস। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেও ভারতবর্ষের ঐক্যের প্রতি আন্তরিক টান থাকতে পারে, ভারতবর্ষের ইতিহাস তার প্রমাণ দিয়েছে। কারণ ভারতবর্ষ জানত :

> "পৃথক্‌কে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত।"

রবীন্দ্রনাথ সেই রহস্যের আবরণ উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন যে, স্বীকরণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের বড় ধর্ম। আর্যেতর জাতির কাছ থেকে ভারতবর্ষের আর্যেরা অনেক কিছু নিয়েছেন। আচার-আচরণ, দেববিশ্বাস, ধর্মীয় কৃত্য, আধিমানসিক চর্যা, জনন-মরণাশৌচ, বৈবাহিক সংস্কার—আর্যেরা এসব ব্যাপারে বহু স্থলে স্থানীয় রীতির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয় : "ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই, এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।" ইংরেজ আমলে এই মন্ত্রটি আমরা ভুলেছি। মাৎসিনি, গারিবল্ডি, কাভ্যুর, বিসমার্কের আদর্শে আমরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই করেছি (অবশ্য অনেকটাই বায়বীয় ব্যায়াম!)। কেউ কেউ এর জন্য প্রাণ বলি দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। তবু শেষ পর্যন্ত আমরা চরিত্রকে বাঁচাতে পারি নি। হিন্দুরা মুসলমান সমাজকে লোভ দেখিয়ে সুকৌশলে দলে টানার চেষ্টা করেছি, মধ্যযুগীয় খিলাফত আন্দোলনকে স্বাদেশিক গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করেছি, 'না-গ্রহণ না-বর্জন' নীতি অবলম্বন করে ভাবের ঘরে বেমালুম চুরি করেছি, চতুর্দশ দফার ফরমূলা শিরোধার্য করে পাশ্চাত্য ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের রীতিমত চেষ্টা করেছি। তার ফলাফল হয়েছে দুঃসহ। চরিত্রনীতি ভেঙেছে, সমাজবন্ধন শিথিল হয়েছে,

পরিবার জন্মমূল হয়েছে, জীবন-নীতির মূল্যমান সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং প্রতিবেশী হয়েছে ঘোরতর শত্রু। তার কারণ, "পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে।" তা হলে পারস্পরিক পার্থক্যকে কীভাবে ভারতবর্ষ ঐক্যের বন্ধনে এনেছিল? "সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়—তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া।" জোর করে, কৌশলে, প্রলোভনে এক করবার বিড়ম্বনা আজ আমরা দুর্মূল্য দিয়ে বুঝতে পারছি। রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তার গতিপথের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের রাজনৈতিক বিধাতারা ভুল করেছিলেন বলেই আজ চারিদিকে ভাঙনের স্রোত বয়ে চলেছে।

৩.

রবীন্দ্রনাথ এই যে ঐক্যতত্ত্বের আবিষ্কার করলেন, এটি কি পাশ্চাত্য ইথ্‌নোলজিস্টদের অনুকরণে লেখা, অথবা তাঁর মনগড়া থিওরী? কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে ভারত-সংস্কৃতিসম্মত, ভারত-ইতিহাসের মধ্যেই সে তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, তা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে। আর্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা অর্ধসভ্য নিষাদজাতি এবং সুসভ্য দ্রাবিড়ভাষী জাতির বিরোধের সামনে দাঁড়ালেন, এবং সে বিরোধে একটা বড় কাজ হল আর্যদের দলগত ঐক্যের সংহতি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যে মন্ত্র-গোত্র-দেবতা নিয়েও অন্তর্বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে এসে তাঁদের এমন প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে নামতে হল যে, নিজেদের দল-উপদলগত পার্থক্য দূর হয়ে গেল এবং একটা সামগ্রিক আর্য-ঐক্য গড়ে উঠল।

সেই উত্তোগপর্বের ইতিহাসই তো রামায়ণে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সেই ঐক্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দেখলেন যে, রামায়ণের যুগের তিনটি ব্যক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়—জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এঁরা তিনজন সমসাময়িক কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্ক করতে পারেন; কিন্তু ভাবের দিক থেকে তাঁরা একই যুগমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে তখন মন্ত্র ও বিদ্যা নিয়ে কুলপতিদের মধ্যে কি একটু-আধটু সঙ্কটের সৃষ্টি হয় নি? হওয়াই সম্ভব। বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যাবতীয় বিদ্যা ও যজনকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়সমাজ দেশরক্ষা ও যুদ্ধবিগ্রহে অধিকতর ব্যস্ত বলে এ সমস্ত বিদ্যানুশীলনে কিছু উদাসীন ছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ নামক বিশেষ শ্রেণীর উপর যজ্ঞকর্ম ও তদানুষঙ্গিক বিদ্যার ভার অর্পিত হল, এবং সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীসচেতন স্বার্থের সৃষ্টি হল। এই শ্রেণীস্বার্থ থেকে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীবিরোধের উৎপত্তি। অপর দিকে ক্ষত্রিয়সমাজ যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হলেও রাজবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁরাও অতি সচেতন এবং তার ন্যাসরক্ষক ছিলেন। এঁদের মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ বিকাশ লাভ করেছিল। ভক্তি ও প্রেমের দেবতা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—দু'জনেই ক্ষত্রিয়সমাজভুক্ত। সকাম যজ্ঞীয় বিদ্যা এবং নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে কিছু বিরোধ থাকাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর অন্তরালে একটা সুপ্রাচীন বিরোধ ও সংঘর্ষের আভাস পেয়েছেন। তাঁর মতে, "গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজ-বিপ্লব।" এই আদর্শের নিরিখে তিনি গোটা রামায়ণের পশ্চাদ্-পটে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে নতুনরূপে প্রতিফলিত করলেন।*

* কবি নবীনচন্দ্র তাঁর 'ত্রয়ী' কাব্যে (রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস) রবীন্দ্র-নাথের পূর্বে এই ধরনের সমাজবিপ্লব ও শ্রেণীসংঘর্ষের পরিকল্পনা করেছিলেন।

মহাভারত প্রসঙ্গেও তিনি বিরোধ ও মিলনের ইঙ্গিত পেলেন: "মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল।" কিন্তু যখন বিরোধটাই বড় হল, ব্রাহ্মণ্যশক্তি সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করল, শ্রেণীবন্ধন প্রকৃতই বন্ধন হয়ে উঠল, তখন ধ্বংসের দেবতা দুইরূপে অবতরণ করলেন—মহাবীর ও বুদ্ধদেব। এঁরা দীর্ঘকালসঞ্চিত গলিত স্তূপকে ভস্মসাৎ করলেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও আর্য-অনার্যের ভেদবিভেদকে একেবারে ভেঙে দিলেন। ফলে বৈষম্যবোধ দূর হল বটে, কিন্তু পূর্বতন ঐক্যবোধও ভেঙে পড়ল। এই একাকারের যুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি চমকপ্রদ:

> "বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল—যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।"

তারপর শক হূন প্রভৃতি বহির্ভারতীয় আর্যেতর সম্প্রদায় ভারতে এল। আগন্তুকদের জীবন ও সাধনাকে মিলিয়ে নেবার শক্তি তখন আর্য-সমাজের খর্ব হয়েছে। তারপর "বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল।" ফলে একাকার হল, কিন্তু ভারতের ঐক্যের আদর্শটি বিপন্ন হল। পরে অবশ্য পৌরাণিক যুগে পুরাণের সাহায্যে এবং স্মৃতি-সংহিতার বেড়া দিয়ে কিছুকাল সঙ্কটকে স্থগিত রাখা হয়েছিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-অধ্যুষিত এবং স্মার্ত ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত হিন্দু-সমাজের সেই ঐক্য-বিধানের শক্তি বিদায় নিল। যদিও ব্রাহ্মণসমাজ নতুন হিন্দুসমাজকে নানা বন্ধনের দ্বারা বিশ্লিষ্টতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শৃঙ্খলা শেষপর্যন্ত শৃঙ্খলে পরিণত হল। কারণ, "বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায়······বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই

ভারতের সাধনা।" সে সাধনা শেষপর্যন্ত বিপর্যস্ত হতে বসেছিল। তারপর অন্ধকার নামল :

"সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে ; বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের স্থায় দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন মন্দিরসকল মস্তক আবৃত করে, এবং সুলতান-প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মর রচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাপ আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরী-রক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্যনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী ?"

অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে প্রচণ্ড জীবনের বন্যাবেগ ছিল, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যবাণী সত্ত্বেও এই ধরনের নির্মমতা, মৎসরতা এবং বিবিধ পাশব বলের উল্লাস ভারতীয় জীবনে ও ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাচীন ভারত ধর্মের সাধনা করেছিল- যা পদে পদে ক্ষমার দ্বারা সংযত। কিন্তু মুসলমান যুগের ইতিহাস অধিকাংশ সময়ে ভ্রূক্ষেপহীন বীর্য ও মনুষ্যত্বহীন দম্ভের ইতিবৃত্তে পরিণত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতিহিতৈষার অভাব"—এর ফলে ভারতীয় ঐক্য বার বার খণ্ডিত হয়েছে। তাঁর মতে হিন্দুর বর্ণবিভেদ থেকেই জাতিগত অনৈক্য, সংগ্রাম-সংঘর্ষে দলবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগের প্রতি উদাসীনতা, জাতির

সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে সংমোহ প্রভৃতি তামসিকতার আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এ-ও সত্য যে, দলগত বা জাতিগত প্রচণ্ডতা—যা খানিকটা পশুধর্মের ধার ঘেঁষে যায়, আমাদের গেরুয়া মাটির গুণে এদেশে তার কিছু অভাব আছে। আমাদের ইতিহাসের ঐক্য পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হয়েছে পরদেশী অবিবেকী পাশব বলের কাছে। আমরা শাস্ত্র দিয়ে প্রাচীর গড়েছি, কিন্তু শস্ত্র দিয়ে উপদ্রবকারীর ব্যূহ ভেদ করার জন্য যথেষ্ট উদ্যম দেখাতে পারি নি। তাই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মুসলমান শাসন সম্পর্কে একটি গূঢ় মন্তব্য করেছেন :

> "কিন্তু শাস্ত্র যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য, তখন মানবের মধ্যে যে দানবটা আছে সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হউক দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সংগত।"

এই সঙ্গত কাজটাকে ভারতের ইতিহাস একটু অবহেলা করেছে ; ফলে এ জাতির ধ্যানধর্ম বার বার চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, বিদেশী শাসনের জগদ্দল শিলা আত্মাকে মূর্ছিত করেছে, মহৎ আত্মদান হয়েছে নির্বীর্য আত্মহননের সামিল।

ইতিহাসের ক্রান্তিরেখার পরেও ইতিহাস আছে। ক্রান্তদর্শী রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাসের গতিপথ এবং ভারতভাগ্যবিধাতার অঙ্গুলিসঙ্কেত প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন—মধ্যযুগের মধ্যযাম উত্তীর্ণ হয়েছে, ভারত-ইতিহাস এবার নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা করতে উৎসুক। সে পথ নতুনও বটে, পুরাতনও বটে। "আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না ; তবু অনুভব করিতেছি, ভারতবর্ষ আপনার

সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে।" ১৯১২ সালের বৈশাখ মাসের রুদ্ররৌদ্রাকীর্ণ পট-ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকালের ভারতবর্ষকে নতুন আলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু আজ অর্ধ শতাব্দীরও পরে ভারতের বর্তমান ইতিহাসের মধ্যে সেই মানবআত্মাকে, সেই 'আপনার সত্যকে' আমরা কি প্রত্যক্ষ করতে পারছি? আজকের ইতিহাস অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা এবং ক্ষুদ্র গণ্ডীচেতনার বিষে মুমূর্ষু। আধুনিক ভারত-ইতিহাসের ক্ষীণায়ু বুদ্বুদ্‌গুলি মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে পারঘাটের দিকে চেয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে ভারত-ইতিহাসকে পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন, আজ সে ইতিহাসকে শুধু পুঁথিতেই পাওয়া যাবে, জীবনে নয়। (১৩৬৯)

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ব

কবিগুরুর জীবিতকালের মধ্যেই তাঁর কাব্যসাহিত্য নিয়ে সুধীজনের মধ্যে প্রখর আলোচনা শুরু হয়েছিল—তাঁর বক্তব্যবিষয় ও বক্তব্য-ভঙ্গিমা—উভয় ব্যাপার নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী যুগেও তার জের মেটে নি। তাঁর কাব্য-প্রত্যয়গুলি মূলতঃ আস্তিক্যবাদী। প্রেম, সৌন্দর্য, কল্যাণ, পূর্ণতা—এ সমস্ত তাঁর মন্ত্রবিদ্যা। একদিকে তিনি যেমন বিশ্ব-সৌন্দর্যকে আর্টিস্টসুলভ নিরাসক্তির দৃষ্টিতে দেখেছেন, তেমনি আবার ভক্ত-দার্শনিকের মতো সমস্ত বিশ্বানুভূতির মূলীভূত ঐশ্বরিক প্রেরণাকে নিজ সত্তায় উপলব্ধি করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ উভচর—জীবন-তটিনীর কূলে কূলে তাঁর বিহার আবার জীবন ছাড়িয়ে, পৃথিবী ছাড়িয়ে চিদাকাশেও তাঁর অভিনিষ্ক্রমণ। তিনি একই সঙ্গে আকাশ ও নীড়ের গান গেয়েছেন, নীড়ের সুনিবিড় প্রেম এবং আকাশের বিশাল বৈরাগ্য—এই দুই-ই নীলাম্বরী যমুনা ও গৈরিক গঙ্গার মতো তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে, কখনও প্রতিদিনের সহস্র কর্মজালজড়িত জীবনে ফিরিয়ে এনেছে, কখনও-বা, তারা মহাশূন্যে উধাও হয়ে গেছে। কবি প্রশ্ন করেছেন—সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স, না সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স—কোন্ শক্তি তাঁর কাব্যপ্রতীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বস্ত্রবয়নের টানা-পোড়েনের মতো ঐ দুই শক্তিই তাঁকে রসশিল্পের রূপকার করেছে। এই যে আস্তিক্যবাদ, যার মূল হচ্ছে ব্যক্তিগত ঈশ্বরবোধ—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও সাধনা এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সেই জীবনেশ্বরকে কবি নানাভাবে উপলব্ধি করেছেন, নানা রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। নির্বিকল্প চৈতন্যকে বিকল্পের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে নামরূপের আয়তনের দ্বারা তার

সীমা রচনা তাঁর একটা অভিনব কৃতিত্ব। সুতরাং ঈশ্বরচেতনা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পূর্ণ উপলব্ধি হতে পারে না। সে ঈশ্বর-চেতনা অদ্বৈত ব্রহ্মানুভূতিই হোক, আর দ্বৈতরসের প্রেমভক্তিই হোক, অথবা তাকে কবি 'বড় আমি'-ই বলুন—মোট কথা জীবন-অভিচারী ভাগবত চেতনা তাঁর জীবনধারাকে যে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এ ঈশ্বরচেতনা গুহাহিত তত্ত্বকথার সমধর্মী নয়। ঈশ্বর ও মানুষের স্বরূপ নির্ধারণ তাঁর মনঃ-প্রকৃতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরকে মানবীয় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আস্বাদন করা তাঁর তত্ত্বসাধনার মূল কথা। কিন্তু শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলি থেকে যেন অন্য সুর শোনা যাচ্ছে।

অধুনা কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়সের পর থেকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লেখা (১৯৩৮—১৯৪১) খান আষ্টেক কাব্যগ্রন্থে তাঁর যথার্থ স্বরূপ ফুটেছে। 'প্রান্তিক' (১৯৩৮) 'সেঁজুতি, (১৯৩৮) 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯) 'নবজাতক' (১৯৪০) 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১), প্রভৃতি শেষ পর্বের কয়েকখানি কাব্যে কবিদৃষ্টি আশ্চর্য বাস্তব-সচেতন হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। তখন চারিদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা, সংস্কৃতির অবক্ষয়, মনুষ্যত্বের অবমাননা দিন দিন বীভৎস আকার নিচ্ছিল। বিদায় নেবার আগে এই তিন বৎসরে (১৯৩৯-৪১) তিনি নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করলেন। এতদিন তিনি যে রোমান্টিক, ভাববাদী প্রত্যয় ও ঈশ্বরানুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনকে দেখছিলেন, বিষ-বাষ্পের উদ্গীরণের ফলে তাঁর সে কল্পলোক যেন মুমূর্ষু হয়ে উঠল। তিনি হিমগিরি থেকে উষর পথে নামলেন, জনতার একজন হয়ে দাঁড়ালেন, ইতিপূর্বে জনতার মনের কথা ধরতে পারেন নি বলে নিজের সৃষ্টিকে বারবার লাঞ্ছিত করতে চাইলেন, জনতার কবিকে আহ্বান করে তাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে

চাইলেন। তাই কেউ কেউ বলেন, রবীন্দ্র-জীবনের অন্ত্যপর্বের এই সমস্ত কাব্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে পূর্বতন কাব্যের কত না প্রভেদ! যিনি নিজের কবিতা সর্বত্রগামী হতে পারে নি বলে নিজের যাবতীয় শিল্পসৃষ্টিকে ব্যর্থ বলেছেন, তাঁর এই বিচিত্র মনোভাবকে যথার্থ প্রগতিশীল বলে কোন কোন আধুনিক সমালোচক জয়গান করেছেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'র যক্ষরাজের মতো নিজের চারিদিকে প্রেম, রোমান্স, উচ্চ আদর্শবাদ, অধ্যাত্ম চেতনা, ব্যক্তিগত জীবনদেবতাবাদ প্রভৃতির স্বর্ণজাল বয়ন করেছিলেন। পরে ঐ যক্ষরাজের মতো তিনি নিজেই তাকে ছিন্নভিন্ন করে, নিজের সৃষ্টিকে লাঞ্ছিত করে জনারণ্যে নেমে এসেছেন। সুতরাং তাঁর শেষ তিন বছরের কাব্য যথার্থ প্রগতিশীল হয়েছে, কারণ এতে তিনি মাটির মানুষের ব্যথার অংশীদার হতে চেয়েছেন, যুদ্ধবাজ, ফ্যাসীবাদী শক্তিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন, ঔপনিবেশিক লোলুপ বাসনাকে ধিক্কার দিয়েছেন। অতএব বিবর্তনবাদের সূত্রানুসারে সর্বাধুনিককে সবশ্রেষ্ঠ বলার চেষ্টাও অনেকে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য,' 'ক্ষণিকা' 'বলাকা', 'পূরবী'—এ সমস্ত মডার্ন নয়— এতে উনিশ শতকের স্বপ্নিল রোমান্স ও দেবনির্ভর নিশ্চিন্ত আত্মনিবেদ উঁকি দিচ্ছে। এর বহু স্থলে পরাজয়ী মনোভাব ফুটেছে—যেখানে কবি তাঁর জীবন-দেবতার কাছে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করেছেন। সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যে জীবনের বিকাশ, কবিগুরুর ঐ সমস্ত প্রেম-রোমান্সে-গড়া অধ্যাত্মমুখী কাব্যে তার বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। তাই তাঁর শেষ তিন বছরের কাব্যে যে নতুন জীবন-প্রতীতি ফুটে উঠেছে প্রগতিবাদী সমালোচকগণ তার জয়ধ্বনি করছেন।

এ বিষয়ে দু' একটি কথার অবতারণা করা চলতে পারে। বিবর্তনবাদী

তত্ত্বকথা আর যাতেই প্রয়োগ করা যাক না কেন, কলাসৃষ্টিতে এই তাত্ত্ব সবসময়ে তথ্যকে মেনে চলে না। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে পৌঁছে এই কাব্যগুলি রচনা করেছেন, সেই হেতু তা সর্বোৎকৃষ্ট হবে, এমন কোন কথা নেই। কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে কোন লেখকের কৈশোর বয়সের রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হতে পারে, প্রবীণত্বের দুয়ারে পৌঁছেও কারও লেখা অতি নিকৃষ্ট হতে পারে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের শেষ-জীবনের কাব্যগুলি কবি-জীবনের শেষ-উপলব্ধি এবং পূর্ণতম উপলব্ধি এটা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্য একথা সত্য রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনের কাব্যে মুক্ত কণ্ঠে জনতার কথা বলেছেন, অবহেলিতের প্রতি অত্যাচারে কবিকণ্ঠ ক্ষুব্ধ হয়েছে—"ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে"—এ পংক্তি কি ভোলবার? কিন্তু তাই বলে তাঁর শেষ-পর্বের কাব্যকে নিছক জনতার কাব্য, সুতরাং একমাত্র প্রগতিশীল সৃষ্টি—একথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তাঁর অন্তিম পর্বের কাব্যে, প্রগতিশীলতা ও ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি—অনেকটা ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ—তাঁর সত্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। 'নবজাতক'-'রোগশয্যায়'-'আরোগ্য'-'জন্মদিনে'—এ সমস্ত কাব্যে কবি নিজ প্রাণকণিকার মধ্যে এক অনির্দেশ্য, অপরিণামী চৈতন্যের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। বৃদ্ধ কবি দেখেছেন আধুনিক সভ্যতার নিদারুণ পরাজয়, মানবাত্মার নিঃশেষে মৃত্যু:

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন ॥

বৌদ্ধ জাপান হিংসার মন্ত্র জপ করছে ভগবান তথাগতের নাম স্মরণ করে :

ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো।
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো ॥

পশ্চিমের ধর্মভীরু খ্রীস্টানের দল যিশুর নামে প্রার্থনা করে শত্রু-হনন চায় :

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু কারা চলে গির্জায় ?
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।

বিশ্ব-রাজনীতির ধোঁয়াটে আকাশে কবি কখনও তীব্র আঘাতের বিদ্যুৎকশা হেনেছেন, কখনও বহুদূর থেকে ধ্রুবজ্যোতির অনির্বাণ আলোক দান করেছেন—এদিক থেকে তিনি বিশ্বমানব, বিশ্বপথিক। বর্তমান বিশ্বের মানব-কল্যাণব্রত তাঁর শেষপর্বের লেখায় নতুন রূপ ধারণ করেছে। তিনি বস্তুবিশ্বের একজন হয়ে জনচেতনার সঙ্গী হয়েছেন,—তাঁর কবিমানসের এই পরিবর্তন শেষপর্বের কবিতার অনেক স্থলেই প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্য কোন কোন সমালোচক বলেন—এই শেষপর্বই শ্রেষ্ঠ পর্ব, কারণ এখানে তিনি অস্মিতার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের প্রগতিবাদী আন্দোলনকেই সমর্থন করেছেন, কল্পস্বর্গ ছেড়ে কঠিন মৃত্তিকায় পা ফেলেছেন, মাটির মানুষের আত্মীয় হয়েছেন। তিনি যে বলেছেন, "আমি ব্রাত্য,

আমি পথচারী"—সে কথা তাঁর শেষ লেখাতে চমৎকার ফুটেছে। আভিজাত্যের দ্বিরদনির্মিত সৌধচূড়া ত্যাগ করে তিনি ব্রাত্য-জীবনকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, বিশ্বমানবের পথচলার সঙ্গী হয়েছেন। সুতরাং প্রগতিবাদে ও মানবতত্ত্বে বিশ্বাসী সমালোচকের কাছে তাঁর শেষপর্বের এই বিচিত্র রূপ, অভূতপূর্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে।

এ বিষয়ে আমার একটু বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রকাব্যে জনকল্যাণের বাণী প্রচুর ছড়িয়ে আছে, কবি বহুবার জনারণ্যে নেমেছেন। "জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার, হৃদয়ে আমার চড়া"—এ কথা না বলে তিনি কল্পনাকে আহ্বান করেছেন তাঁকে সংসারসমুদ্রের তীরে নিয়ে যেতে—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী, দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

যা কিছু কল্যাণকর, মানবহিতব্রতী ও প্রগতিশীল রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে সমগ্র জীবন ধরেই তার জয়োচ্চারণ করেছেন—তাই তাঁকে প্রগতিশীল মানবতাবাদী কবি বললে কারও কোন আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু তাঁর যে আরও একটা গভীর আত্মজিজ্ঞাসা আছে, প্রত্যাহের মুখর জীবনের মধ্যে থেকেও তিনি যে নির্জন-নিঃসঙ্গ—তার বাণী তিনি আত্মার গভীরে উপলব্ধি করেছেন। যে প্রাণকণিকা অনাদি অনন্তকাল ধরে জড়ে ও চৈতন্যে জীবনরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে, কবি তারই অংশীদার ও অন্তর্ভুক্ত। যাকে শাস্ত্রে বলে চিত্তের আবরণভঙ্গ, কবিচেতনা পুনঃ পুনঃ তার স্পর্শ পেয়েছে। তাই ঔপনিষদিক তত্ত্বরস, সুফী অতীন্দ্রিয়তা এবং বৈষ্ণবীয় দ্বৈত ভক্তিবাদ তাঁকে কখনও অদ্বৈতবাদী করেছে, কখনও ভক্তিরসের গহনে একাকার

করে দিয়েছে। আত্মার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা তাঁর শেষপর্বের কাব্যে তত্ত্বনিষ্ণাত আর্ষদৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়েছে :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

প্রথম দিনের সূর্য ও দিবসের শেষ সূর্য 'কে তুমি'-র উত্তর পায় নি। কিন্তু সূর্যস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সে উত্তর পেয়েছেন তাঁর প্রথম যুগের কাব্যে, মধ্যযুগের সারস্বত সৃষ্টিতে এবং শেষ পর্বের কাব্যেও তার জয়ধ্বনি করে তিনি বিদায় নিয়েছেন। "রোগদুঃখ রজনীর নীরন্ধ্র-আঁধারে" কবি মহাসত্যের স্বরূপ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। চেতনার সম্মুখে প্রলম্বমান যবনিকা যেন কিছুতেই অপসারিত হতে চায় না। তখন কবি কল্পনা করেন :

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান,

যেখায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর তীর্থপথে।

দেশকালহীন চৈতন্যসমুদ্রস্নানে অভিলাষী রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনের কাব্যে শুধু রাজনৈতিক প্রচারের অনুপান হিসেবে তথাকথিত জনতা-মার্কা কবিতা রচনা করেন নি—তাঁর ও ধরনের কবিতা থেকে মনে হয়—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"। তাই বিদায় নেবার আগে কবি আত্মার অনিকেত যাত্রার পথে বিশ্বরূপের সঙ্গে নিজ সত্তার অদ্বয়-মিলন উপলব্ধি করে শেষ কথা বলেছেন :

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই,
জানি আমি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই।
এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

তাই মনে হয়, তাঁর শেষপর্বের লেখায় যেমন দেশকালঘেরা চেতনার বিচিত্র অনুভূতি নতুনরূপ লাভ করেছে তেমনি কুহেলিকা ভেদ করে "চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি" কবির কাছে সত্যের অমৃতরূপ প্রকাশ করেছে। তিনি ঔপনিষদিক ঋষিদের মতোই সৃষ্টিরঙ্গের শেষকথা উপলব্ধি করে যা বলেছেন, তার জন্য তাঁকে ক্রান্তদর্শী বলে

যুগে যুগে মানবযাত্রীরা অভিনন্দিত করবে :

দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

কবিগুরু বিদায় নেবার আগে সেই নটরাজের প্রসাদ পেয়েছেন।

(১৩৭২)

কালপরিমিতির সাহায্যে সাহিত্যের কৌলীন্য নির্ণীত হয়ে থাকে। পরিবর্তন যদি জীবধর্ম হয়, তাহলে শিল্প সম্বন্ধে সেই নির্মম কথাটা স্বীকার করতে হয় যে, কিছুই বসে নেই; মানুষের আর পাঁচটা সৃষ্টির মতো সাহিত্য নিত্যই বদলে যাচ্ছে। আজ যা সোচ্চারে আত্মঘোষণা করছে, আগামী কাল তার চিহ্নমাত্রও থাকবে না। মানুষ, সমাজ, দার্শনিক প্রত্যয়, রাষ্ট্রনীতির নানা মাপজোখ ইত্যাদির প্রভাব সাহিত্যকে যে কত রকম বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তা যে-কোন সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান নিলেই বোঝা যাবে।

আধুনিক কালের যে-পাঠক আজকের নির্মোহ জীবনের তত্ত্বরসে নিক্রান্ত, তিনি রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হবেন। মনে হবে, রবীন্দ্রকাব্য থেকে যেন দূরশ্রুত গান ভেসে আসছে, যার সুর আমাদের পরিচিত নয়, যার ভাষা ব্যাকরণের দিক থেকে সোজা হলেও তাৎপর্যের দিক থেকে দুরবগাহ। রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের রচনা থেকে তবু জীবন সম্বন্ধে প্রাত্যহিক উত্তাপটুকু পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সত্তর বছর বয়সের আগেকার কবিতা আধুনিক পাঠকের কাছে মধ্যযুগীয় গির্জাঘরের রঙিন কাচের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে-আসা সপ্তপর্ণী সূর্যকণা বলে মনে হয়ে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে হবে—রবীন্দ্রযুগের অবসান হয়েছে। আধুনিক পাঠক জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যা ভাবে, বিশ্বাস করে—রবীন্দ্রকাব্যের দিগন্তহীন বিশাল প্রান্তরে তা প্রায় অস্পষ্ট। তাঁর কাব্যলোকের শীর্ষচূড়া থেকে পরিপার্শ্বের দিকে দৃষ্টি ফেরালে একটা গোটা বিশ্বরূপ নানা বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে চোখে

পড়বে। কিন্তু শীর্ষচূড়া থেকে দেখা হয়েছে বলে সমতলের ছোট বড়, উচ্চাবচ, বেসুরো, বিষম জীবনটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রকাব্যে নানা সুরের হার্মনি বাজে না, সমবাদী সুরের মেলডি একটা অখণ্ড ঐক্যানুভূতি জাগিয়ে তোলে। জীবনের চারিদিকে এখন বঞ্চনা ও বিশৃঙ্খলার এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া চলেছে, প্রতিমুহূর্তে মূল্যাতিক্রান্ত জীবনপ্রত্যয় আপনাকে ক্ষয় করে ফেলছে, শেলীর "a dome of many coloured glass" ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—ছেঁড়া তারের বেসুরো কর্কশ ঢিলেমি রবীন্দ্রকাব্যের ভাববাঁধা সপ্তস্বরা যন্ত্রটিতে কি ধরা পড়ে?

আধুনিক পাঠক চিন্তান্বিত। এখন কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘবিস্তারী সাহিত্যসাধনা থেকে আজ ও আগামী কালের পাঠক কি পেতে পারে?

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের কোন এক গৃহশিক্ষক তরুণ ছাত্রদের কৌতূহল জাগাবার জন্য এক টুকরো অস্থি এনেছিলেন। সমস্ত শরীরটা বাদ দিয়ে শুধু একখণ্ড অস্থি দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশী হতে পারেন নি। বাল্যে সমগ্রতার দিকে আগ্রহ পরবর্তী কালের রবীন্দ্র-কাব্যেও একটা গোটাসুর সৃষ্টি করেছে। শিশু বড় হয়, কৈশোর যৌবন কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কোঠায় পা দেয়। মানুষের শৈশব, কৈশোর, যৌবন—দেহধর্মের ক্রমপরিণতি ও পরিবর্তন বাইরের দিক থেকে পৃথক্ মনে হলেও মূলতঃ তা একই দেহের মধ্যে বিধৃত, পার্থক্যগুলি একটা বড় ঐক্যের সঙ্গে অন্বিত। তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার সুর ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলি একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা পরম ঐক্যবোধ, বহু-বিচিত্র খণ্ডকে পূর্ণের মধ্যে মিলিয়ে নেওয়ার দুরূহ সাধনা—এর মূলে আছে আস্তিক্যবাদী আত্মপ্রত্যয়। আধুনিক পাঠক জীবনের ভাঙা-চোরা গলি-ঘুঁজির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে আশা-

আনন্দহীন অন্ধকারের নঙর্থক চেতনায়। বহুদিন ধরে মানব-সংস্কৃতি জগৎ ও জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানসিক চর্যার মূল্যমান প্রস্তুত করেছিল, আজ তার কোথাও মূল্যাবনতি, কোথাও-বা সম্পূর্ণ মূল্যান্তর ঘটেছে। এই রকম শঙ্কাতুর অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের ঐক্যানুভূতি ও আস্তিক্যবাদী চিন্তবোধ আধুনিক কালের পাঠকের কাছে খুব নিকট-আত্মীয় বলে মনে হবে না। খণ্ডের মধ্যে জীবনকে ছোট করে দেখা হয় বটে, তবে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ চেতনার হস্তামলকে পরিণত হয়। আজকের মানুষ হাতের কঙ্কণ ফেলে সুদূরলোকের সোনার হরিণের পিছনে উধাও হতে চাইবে কি?

রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যের মূলে যে ঐক্য আবিষ্কার করেছেন, সেটি স্বচিত্ত-নির্ভর ভাববাদী রস-কৈবল্যের শৈল্পিক বহিঃস্ফুরণ মাত্র। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কতকগুলো বিশেষ বিশেষ আইডিয়া থাকে। এমন কি গুহাবাসী প্রাগৈতিহাসিক মানুষও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী পরিমণ্ডলকে নিজ নিজ ভাব-ভাবনা অনুসারে গড়ে তুলত। রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে ভাববাদী আত্মানুভূতির এমন একটা বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে যে, যাঁরা বিশ্বসত্তায় 'ক্ষণভঙ্গবাদী' এবং বস্তুব বহুত্বে নিষ্ঠাবান্, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকের ভাবাকাশে বস্তুচেতনার ব্যক্তিভাবরঞ্জিত রূপান্তরীকরণ লক্ষ্য করে বিষণ্ণ হবেন। যুবক রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।" কথাটা সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হতে পারে। বাইরের বিশ্বাকাশ ও রবীন্দ্রনাথের চিদাকাশ ভৌগোলিক সীমার দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন নয়। দেশকালহীন নিরবয়ব চৈতন্যলোকের বিচিত্র বিস্ময় একটি চেতনার গভীরে যে হীরাপান্না সৃষ্টি করেছে, তার সন্ধান জহুরীর দোকানে মিলবে না। এই ব্যক্তিক ভাববাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে ইন্দ্রিয়-লব্ধ 'প্রজ্ঞা'কে (intuition) রক্ষা করবার জন্য আধুনিক মানুষ

বিশেষ ব্যস্ত। বিশ্বকে নিজ চিত্তজলে প্রতিফলিত না করে চেতনাকে বিশ্ববস্তুর মধ্যে প্রক্ষেপ করতে অনেকে অনুৎসাহিত হবেন না। কাজেই রবীন্দ্রকাব্যের রোমান্টিক ভাববাদ আধুনিক পাঠকের কৌতূহল জাগালেও আত্মার সামগ্রী হতে পারছে না।

প্রেম, সৌন্দর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আজ বিশ শতকের সপ্তম দশকে উনিশ শতকী ভাবালুতার অসুস্থ জৃম্ভণ বলে মনে হবে। ইদানীং শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার ও পরীক্ষার ফলে প্রেম ও সৌন্দর্যের সংজ্ঞা আমূল বদলে যাবার উপক্রম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক অতীত, জন্মান্তরীণ পূর্বচেতনা এবং ভাবী জীবনের কল্পলতায় পুষ্পচয়নে উৎসুক। প্রেম তাঁর কাছে "দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাস"। সৌন্দর্য—বাসনাহীন অপ্রয়োজনের নির্বিকল্প আনন্দ মাত্র। প্রেম ও কামের অর্ধনারীশ্বরত্ব, সৌন্দর্য ও প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—এ দিকটা তাঁর কাব্যে উপেক্ষিত বলে মনে হবে। যে প্রেম দেহ ও মনকে মন্থন করবে অঙ্গ ও অনঙ্গের সাযুজ্য-সাধন করবে, যে সৌন্দর্য বাসনা ও প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়ে দিনগত পাপক্ষয়ের জীবনের সঙ্গে কারবার করে, দেহভীরু রবীন্দ্রনাথ তাকে যেন এড়িয়ে চলেছেন। আজকের মানুষের চারিদিকে সমাজ, রাষ্ট্র, দার্শনিক প্রত্যয়, বস্তুগত আত্মজিজ্ঞাসা যে-রকম বিষজ্বালাপূর্ণ অলাতচক্র সৃষ্টি করছে, তাতে রবীন্দ্র-পরিকল্পিত নির্দ্বন্দ্ব সৌন্দর্য ও কামগন্ধহীন প্রেমানুভূতির আবেদন আধুনিক পাঠকের কাছে অস্পষ্ট হতে বসেছে।

বাইরের জীবনের অযুত বিক্ষোভ, আর অন্তর্জীবনের অশান্তি—এ-দুয়ের সংঘাতে প্রতিক্ষণে আমাদের চেতনার চারিদিকে লবণাক্ত সমুদ্র, ফুঁসে উঠছে। এখন "কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা?" অনিকেত আত্মার একক সমুদ্রযাত্রায় আজ কী আমাদের পাথেয় হবে? অটোমোবাইলের চাকায় চাকায় তন্দ্রাহীন গতিবেগের উন্মত্ত

উন্মাদতা; জীবনের স্পীডোমিটার আজ থরথর করে কাঁপছে। এখন রাজার দুলাল যদি ঘরের সমুখ-পথ দিয়ে রথযাত্রা করে, তা হলে হারছেঁড়া মণি ফেলে দেবার প্রবৃত্তি হবে না, বরং নিউজ প্রিন্টে মুদ্রিত একখানি কবোষ্ণ ইস্তেহার ছুঁড়ে দিয়ে আমরা কর্তব্য সমাধা হল বলে মনে করব।

"'আজ' 'কাল' দুটি ভাই, মরিতেছে জন্মিয়াই"—'আজ' 'কালে'র দুটি পাখায় ভর দিয়ে আমরা কোনক্রমে তীব্র গতিবেগের টাল সামলাচ্ছি। রবীন্দ্রকাব্য যথেষ্ট জীবননিষ্ঠ নয়, জীবনের সব সুর তাতে বাজে নি। বাছাই করে, সাজিয়ে গুছিয়ে, মেপেজুখে, তিনি নাটমঞ্চের পর্দা এঁকেছেন। তা সুচিরস্নিগ্ধ 'লেগুন' হতে পারে, তার চার পাশে তমালতালীবনও থাকতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই কর্ণবিদারী সমুদ্রগর্জন, সেই সূর্যস্নাত মরুপ্রান্তর, অরণ্যগর্ভ চিরান্ধকার, আর্কটিক তুষারের ত্র্যম্বকস্থ অট্টহাসঃ? আর কামপল্বলে মানুষ নামক জন্তুর উৎক্ষিপ্ত পঙ্কোৎসব?

চিরকালীনতা মানুষের লক্ষণ নয়, সাহিত্যেরও নয়। তবু দীর্ঘকাল ধরে কোন কোন সাহিত্য বাঁচে। তার মধ্যে যুগাতিচারী এমন কিছু কিছু ভাব-ভাবনা থাকে, যা যুগের দাবি মিটিয়েও যুগান্তরের পথে পাড়ি দেয়। আধুনিক পাঠক যদি আধুনিকতাব ঠুলির মধ্য দিয়ে সারস্বত জীবনকে বুঝতে চায়, তা হলে গত চার হাজার বছরের মানবসভ্যতা তার কাছে কানা-কড়ির মূল্যও পাবে না। রবীন্দ্রকাব্য শুধু আধুনিক কালের পরিমিত কালবন্ধনের চৌহদ্দিবদ্ধ নয়। যুগে যুগে কালপুরুষের পরিবর্তন হয়, কলাপুরুষের রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী। তবু কালসংঘাতে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও দুটো-একটা প্রস্তরসাক্ষী কোনরকমে অক্ষত থাকে, হয়তো এক যুগে যা শালগ্রাম বলে পুজো পায়; অন্যযুগে তা দিয়ে বড় জোর "পাষাণ ভাঙা"র কাজটা চলতে পারে। তবু তাকে এড়িয়ে চলবার জো নেই। রবীন্দ্রকাব্যে শুধু এই

যুগের কথা নয়, বহুযুগের বাণী বন্দী হয়ে আছে। জীবনের দুই প্রান্তকে মিলিয়ে দিতে আজ কেউ ঔৎসুক্য বোধ করছেন না। বর্তমান সমাজ ও জীবন একটা অব্যবস্থিত চিত্তসঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ রকম মানসিক সঙ্কট স্বভাবতই নানা পদক্ষেপেই হাজির হয়েছে। কারখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে হাফরের হাঁপানি অত্যন্ত সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু কারখানার বাইরে যে এলোমেলো উতল হাওয়া সহসা মিতালি পাতাতে আসে, তাকে ভুলে থাকা মূঢ়তার লক্ষণ। বাল্মীকি-ব্যাস, হোমর-ভার্জিল, কালিদাস-শেক্সপীয়র-গ্যয়টে—একটা বিশেষ যুগের মানুষ হয়েও তাঁরা নিজেদের যুগকে ছাড়িয়ে দূরান্তরের যাত্রী হয়েছেন। তাঁদের পাশেই রবীন্দ্রনাথের স্থান। আধুনিক পাঠক সাম্প্রতিকের মোহে যদি রবীন্দ্রকাব্যে মানসিক তৃপ্তি না পায়, তবে তা কালধর্মেরই দোষ। তার দ্বারা পাঠকের কাব্যরসাস্বাদন-শক্তির স্বাভাবিক ন্যূনতাই প্রমাণিত হয়। তাঁদের প্রণাম করে আমরা রবীন্দ্র-সরিৎসাগরে অবগাহন করতে দ্বিধা বোধ করব না। (১৩৭১)

১.

১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

> "রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে রচিত করাঙ্গুলি-গণনীয় পাঁচখানি পুস্তিকা ('বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'পত্রাবলী'র কিছু চিঠি) সম্বন্ধেও সঙ্কোচে অনুরূপ মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। স্বামীজী বিশ্ববাসীর কাছে অতন্দ্র কর্মযোগী বলে পরিচিত। বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মৈষণাকে জড়জীবনের প্রত্যক্ষীভূত প্রত্যয়ে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বিশ্বের জীবন-সমস্যাকে বলিষ্ঠ সার্থকতার দিকে প্রেরণ করেছেন। আধিমানসিক ও আধিভৌতিক জগৎকে তমোগুণের প্রভাবে পৃথগ্-ভাবে দেখা যায়, আবার রজোগুণের স্পর্শে উভয়ের মধ্যে সৌষম্য ও মৈত্রীযোগ স্থাপন করা যায়। মর্ত্যধরিত্রীর বুকে মানুষের মতো বেঁচে থাকাও যে এক প্রকার জীবনসাধনা, কোটি কোটি নরকঙ্কালের পঞ্জরাস্থির মধ্যেও যে অমৃত-নিঃস্যন্দী প্রাণধারা বহমান,—এ সব কথা তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতবাসীর কানে কানে বলেছিলেন—কখনও মৃদু আত্মগত ভাবে, কখনও-বা বজ্রনির্ঘোষে।

তাঁকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায়, প্রচুর রচনা করতে হয়েছিল ইংরেজীতে। নিয়মিতভাবে বাংলা অনুশীলনের তাঁর সময় ছিল না ; শুধু প্রয়োজনের জন্য শিষ্য-গুরুভ্রাতাদের প্রতি উপদেশ-নির্দেশ, চিঠিপত্রাদি, বিদেশী সভ্যতা সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা, অল্প-স্বল্প ডায়েরী রক্ষা—ইত্যাদি কর্মে তিনি যৎসামান্য বাংলা ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালী বিবেকানন্দের যে বাংলা গ্রন্থগুলি থেকে জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়, নতুন আলোক লাভ করে, তার অধিকাংশই ইংরেজী রচনা বা ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতার নির্যাস-অনুবাদ—অবশ্য সে অনুবাদ বহুস্থলে মূলের মতো অর্থবহ এবং মূলের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা সূত্রে সম্পৃক্ত। তবে স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা' ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।

যাঁরা ধর্মজগতের অধিবাসী এবং কর্মযোগে নিষণ্ণ, তাঁদের মূর্ত ও অমূর্ত চেতনা নিজ নিজ ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই রূপকল্প নির্মাণ করে। অর্থাৎ শিল্প, সৌন্দর্য, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মনন, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ সব কিছুই তাঁদের কাছে একটা বিশেষ অবধারণা-সহায়ক ; ইন্দ্রিয়াতীত পরাচেতনাই তাঁদের ইন্দ্রিয়জ অপরাচেতনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা সঙ্গীতবিদ্যায় উত্তরস্নাতক হতে পারেন, শিল্প ও রূপবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হতে পারেন, ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গমত্ব অর্জন করতেও পারেন, কিন্তু তাঁদের ভৌম-চেতনালব্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি যুধিষ্ঠিরের রথের মতো ভূমিচারিতার একটু ঊর্ধ্বলোক দিয়ে গতায়াত করে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনা কর্ণের রথের মতো মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলা দেশ একাধারে নব্যন্যায়ের দেশ, চৈতন্য-প্রবর্তিত উজ্জ্বল রসসাধনা ও শাক্ত পদকারদের বাৎসল্য ভাবাবেগের দেশ। আবেগের

নির্বাধ উৎসার এবং মননের তীক্ষ্ণ তির্যকতা এদেশেই সম্ভব হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগে আবেগধর্ম ও গণধর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আবগের মধ্যেই এলোমেলো জনারণ্যের শাখা-বিস্তার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পূর্বপক্ষ ও উত্তর-পক্ষের মেলবন্ধনে বদ্ধ বলে একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক মস্তিষ্কজীবী মহলেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য জীবন, সাধনা ও ইতিহাসের প্রভাবে যেমন একদিকে সমাজ, রাজ-নীতি ও মানবধর্মী উপযোগবাদের প্রতি শিক্ষিত জন আকৃষ্ট হয়েছেন, আবেগোন্মত্ত কণ্ঠে নব-মেসায়ার পথ চেয়ে ভাবী 'সাহস্রিকী'র নান্দীপাঠ করছেন - তেমনি পাশ্চাত্য ন্যায় ও যুক্তিবাদের নিরিখে মননের নতুন স্বরূপ নিধারণেও তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন। উনিশ শতকী য়ুরোপের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধিবাদ আমাদের পূর্ব-সংস্কারকেই যেন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিল। রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার—বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ—এঁদের হাতে বাংলা গদ্য নিশিত অসিধারে পরিণত হল। গদ্য ভাষা যে কী প্রচণ্ড শক্তি ধরে, জাতির মনের আকার আয়তন কতটা পাল্‌টে দিতে পারে, তা উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধের পরিচয় নিলেই মোটামুটি বোধগম্য হবে। যাকে শিল্পলক্ষণ বলে, তখনও হয়তো বাংলা গদ্যে তার যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে নি। কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গেই যে বাঙ্‌ময় সত্তার নাড়ীর যোগ, এবং বাক্‌পুঞ্জও যে মূলতঃ গদ্যাশ্রয়ী ও মননধর্মী—উনিশ শতকেব শেষ ভাগে সে সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহ রইল না। বস্তুতঃ বাংলা গদ্য অন্ধই হোক, আর খঞ্জই হোক—গত শতকের শেষের দিকে এরই সাহায্যে বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা গতিবেগ লাভ করেছে, মূর্ত হয়েছে।

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দু-চারটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য তখন

বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক ও শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে, অনেকেই গদ্যে শিল্পকর্ম নির্বাহ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্য রচনা, শিল্পসৃষ্টি বা নিজের মনোমুকুর তলে প্রতিফলিত নিজের মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কোন বাসনাই স্বামীজীর ছিল না। নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক, সুকঠোর কর্মযোগী, ভাবোন্মাদ আদর্শবাদী, অকৃপণ মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মৃত্তিকার মানুষকে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে ভালবেসেছিলেন। পুঁথিবন্দী আপ্তবাক্য নয়, জীবন্ত মানুষের কথা তাঁর পূর্বে বা পরে এত গভীরভাবে ক'জন মানবপ্রেমী ভেবেছেন জানি না। বিবেকানন্দের গদ্যরচনার সবটুকু এই নরদেবতাকে উৎসর্গীকৃত। এদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর বাংলা রচনায় তাই নানা জ্ঞানবিজ্ঞান-ইতিহাসের ভূরি সমারোহ যেমন আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসা, জীবনের প্রতি একটা সরস নিঃস্পৃহ কৌতূহল। তাঁর রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২.

বাংলা গদ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বতঃই মনে জাগে যে, এ রীতি মিসনারী সম্প্রদায়ের দানে গড়ে ওঠে নি, টুলো পণ্ডিতের অনুস্বর-বিসর্গ-বর্জিত দেবভাষার ছত্রছায়াতলে এ গদ্য বিবর্ধিত হয় নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ পয়ার-ত্রিপদী বাহনে অগ্রচারী হয়েছিল, এই পয়ার জাতীয় ছন্দকেই স্বচ্ছন্দে সাধু গদ্য-রীতিতে পরিবর্তিত করা যায়, তাই পয়ারের দ্বারাই মধ্যযুগের যে-কোন মননকর্ম নির্বাহ সম্ভব হয়েছিল। পয়ারের মধ্যে একটা বিপুল শোষকশক্তি আছে, যে-কোন অর্থবহ মননপ্রবাহকে চৌদ্দ মাত্রার পয়ার পংক্তির মধ্যে পরিস্থাপনা করা যায়—তা সে মঙ্গল-কাব্যের গদ্যাত্মক বিবৃতিই হোক, আর কবিরাজ গোস্বামীর দার্শনিক

রচনাই হোক। অবশ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে গদ্যরীতি ব্যবহার সে যুগে যে অপ্রচলিত ছিল তা নয়। তবে বৃহৎ সাহিত্যকর্মে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতি বড় একটা ব্যবহার করা হত না; কারণ পয়ারের দ্বারাই গদ্যাত্মক কাজ অক্লেশে নির্বাহ হত। উনিশ শতকের বাঙালী বাংলা গদ্যের মধ্যে নিজেকেই আবিষ্কার করেছে; আবিষ্কার করেছে যে, চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের ভাষাকেই সহজে ও সার্থকভাবে আবেগ ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। এ আবিষ্কার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আবিষ্কারের চেয়েও বিপ্লবী। বস্তুতঃ গোটা উনিশ শতকের বাঙালী-মানস যে আধুনিক হয়েছে, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, এর মূল দায়িত্ব বাংলা গদ্যের।

আকণ্ঠ কর্মমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দকেও বাংলা গদ্যে কিছু কিছু রচনা করতে হয়েছিল প্রয়োজনের তাড়নায়। সাহিত্যসৃষ্টি এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, শুধু নিজের মনের কথা ও চিন্তাকে শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি মাত্র চারখানি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন—'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'। এ ছাড়াও 'পত্রাবলী'তে তাঁর কিছু কিছু বাংলা চিঠি ছাপা হয়েছে। বাংলা চলিত রীতিকে তিনি যে একটা বিপুল বেগ ও বিস্ময়কর প্রাণশক্তি দান করেছিলেন, তা বিশেষজ্ঞেরা জানেন। কিন্তু সাধুরীতিকেও তিনি যে ধ্বনিগম্ভীর চিন্তাঋদ্ধ ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারতে'র ভাষারীতি আলোচনা করলেই দেখা যাবে।

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্যের পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে বৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ এবং তামসিক অনীহার গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের পুরোহিত-রাজন্য-বৈশ্য শাসিত সমাজের মূক জনারণ্যে মানস-পরিক্রমা

করেছেন, এবং অধীতবিদ্যা-সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতু আবিষ্কার করেছেন। ফলে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অতীত ভারতের জীবনের অন্তস্তলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই প্রাচীন জাতির উত্থান ও পতন, উদ্‌গতি ও অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহায্য নিয়েছেন। তিনি যে ক্লাসিক গদ্যরীতি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকেই তা বোঝা যাবে।

এর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে তিনি দু'ধরনের বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি তৎসম শব্দবহুল, সমাস-সন্ধি-সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা, আর একটি খণ্ড-খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্‌রীতি। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১. "সৈন্য সহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায় নিঃশব্দে আজ্ঞা বহন করে, তাহাও দেখিয়াছে, কিন্তু যে বৈশ্যকুল রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চির-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়াপুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ....।"

২. "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির

স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসম্ভব।"

'বর্তমান ভারতে'র এ দুটি দৃষ্টান্তই সাধুরীতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির রীতিগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। প্রথমটিতে দীর্ঘবিস্তারী বাকরীতি, গুরুভার শব্দসংযোজনা এবং অনেকগুলি উপবাক্যের সন্নিবেশে এ রচনাটি হয়েছে মন্থর; অপরদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাক্যসজ্জা লঘু, উপবাক্যের সংখ্যা ন্যূনতম। এর কারণ—প্রথমটিতে বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজবিবর্তনের চিত্র স্থান পেয়েছে। ফলে স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্যগুলি ছোট ছোট বাক্যে এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, চিন্তার মধ্যে সহজ চলমানতা লক্ষ্য করা যাবে। প্রথমটিতে বাক্যধারা যেন অবারিত বেগে এবং দ্বিতীয়টিতে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে মৃদু উল্লম্ফনে বয়ে চলেছে। প্রথমটিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার প্রকাশ—সম্মুখে সহস্র মানুষের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি; দ্বিতীয়টিতে শিষ্য ও গুরুভাইদের সামনে নরেন্দ্রনাথের মৃদু ভাষণ, যার মূল লক্ষ্য শ্রোতার বুদ্ধিকে দীপিত করা।

কখনও কখনও বীর সন্ন্যাসী প্রচণ্ড আবেগে আবিষ্ট হয়ে মত্ত সিংহগর্জনে বলে উঠেছেন:

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার

শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা, দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনও ঋক্‌মন্ত্রের মতো কানে বাজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্লবের *Egalite liberte fraternite*-এর অশনি নির্ঘোষ এর প্রতিছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্‌ময় হলেও আসলে তা হৃদ্‌স্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় এটুকু অনুধাবন করলে। এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, তন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ--যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃপ্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।

স্বামীজীর সাধুভাষা প্রয়োগ প্রসঙ্গে এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় যে, যে-ক্লাসিক গদ্যরীতি, বাক্যগঠন, শব্দযোজন প্রভৃতি বাক্‌পদ্ধতি মননধর্মী রচনাকে বহু মনের চিন্তার বাহন করে তুলতে পারে, তার অনেক দৃষ্টান্ত 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা'য় পাওয়া যাবে। অতিকায়, গুরুগম্ভীর, সমাস-বদ্ধ অথচ পরিচ্ছন্ন চিন্তার বাহন--তাঁর সাধুভাষায় প্রায়ঃশই এই লক্ষণটি ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ তাঁর সাধুভাষার অনেক জায়গায় চলতি রীতি-ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা যায়। কোন কোন সময় তাঁর আবিষ্ট মুহূর্তের রচনায় একটা দুর্লভ ভাগবত মহিমা ফুটে ওঠে :

"কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে ; কেবল আমরা বলি, হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর ; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর ; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর!"

এই কয়ছত্র যেন আরণ্যক যুগের আর্ষবাণী, কোন্ অলক্ষ্য থেকে আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে।

৩.

স্বামীজী-অবলম্বিত যে রীতিটি বিস্মিত প্রশংসা আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে চলিত ভাষা। এই চলিত ভাষাতেই তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', কিছু চিঠি এবং 'ভাববার কথা'য় সঙ্কলিত দু' একটা বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ —এই কয়টি মাত্র তাঁর চলিত গদ্যরীতির রচনা। কিন্তু সামান্য রচনাতেই তাঁর যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলা গদ্যের চলিত রীতি আসলে নাগরিক জীবনের বাণীবাহক। সাধুরীতিটি অধিকতর পুরাতন, তা স্বীকার করতে হবে। তিন-চার শ' বছর আগেকার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে সাধুরীতিই ব্যবহৃত হত; অবশ্য কাব্য ও গীতিকায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য ছিল না। যাঁরা মনে করেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীর দল আর সপারিষদ কেরী সায়েব বাংলা সাধুভাষা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা নয়, ভুঁইফোঁড়ও নয়। বাঙালার আঞ্চলিক ভাষাভেদ সত্ত্বেও সাধুভাষাই দীর্ঘকাল ধরে সমগ্র বাঙালী-মানসকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্যসভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশী জনমণ্ডলী —যাঁরা কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরাফেরা করতেন নানা স্বার্থসন্ধানে, তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্যকামী সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল। যাই হোক উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে অকুণ্ঠিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার সাড়ম্বর-প্রবেশ ঘটল। রঙ্গরস,

সাময়িক পত্রে আর্যাভর্জা, "ঠনঠনের হঠাৎ-অবতারগণের"* মর্কটলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হতে লাগল কলকাতার ককনি ভাষায়। "নাটকে ভদ্রেতর ব্যক্তির সংলাপেও কলকাতার বৈঠকী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল, উপন্যাস-রমন্যাসেও কলকাতার ভদ্রসমাজের চলিতভাষার অনুপ্রবেশ ঘটল। ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রকাশ করলেন পুরোপুরি উত্তর কলকাতার ককনি বুলিতে—মায় ক্রিয়াপদ সর্বনামগুলিও চলিত রীতির বিকৃত উচ্চারণে ছাপা হল। প্যারীচাঁদ মিত্র হালকা চালের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন, কলকাতায় ব্যবহৃত সর্বনাম ক্রিয়াপদও ব্যবহারও করেছিলেন কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ লেখেন নি, তাঁর রচনার বহু স্থলেই সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের গোলমাল রয়ে গেছে। ভাষার এ-ব্যাধিটি সমগ্র উনিশ শতক ধরেই বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের আগে অপরিহার্য বলে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন—অনেকটা দুধ ও জলের সংমিশ্রণের মতো। মধুসূদন প্যারীচাঁদের ভাষাকে মেছুনীদের ভাষা বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এর কারণ প্যারীচাঁদ উপন্যাস ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ উক্তিতে সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষার সাহায্য নেন নি। হুতোম (কালীপ্রসন্ন) রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই কলকাতা ককনির সাহায্য নিয়েছিলেন; খুব গভীর ও মননশীলতার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিয়েছিলেন। তার ভাষার মধ্যে কলকাতার পথচারীদের অমসৃণ উক্তি, এমন কি বিকৃত রুচির অশ্লীল শব্দও স্থান পেয়েছে। এ ভাষায় প্রাক্-যৌবনের চাঞ্চল্যই বেশী; কিন্তু সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোন

* 'হুতোম প্যাঁচার' নক্শা দ্রষ্টব্য।

বাঙালী সাহিত্যিক বলেন নি। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি *Calcutta Review* পত্রে বিশুদ্ধ চলতি ভাষার পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন; সাধুভাষা, বিশেষতঃ তৎসম শব্দের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতামত উগ্র ছিল বলে সরল ভাষার পক্ষপাতী হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেন নি। অবশ্য শ্যামাচরণ বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই সর্বকর্মে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন। 'সবুজপত্রে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগে উদারহস্ত হতে পারেন নি। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র মারফতে চলিত ভাষার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিজেও কলকাতার চলিত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইদানীং কেউ কেউ তাঁকে চলিত ভাষা ব্যবহারের একমাত্র পুরোসায়ী বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য। ৮

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় চলিত ভাষার বৈয়াকরণ ও ব্যবহারিক যৌক্তিকতা আলোচনা করেছিলেন, হুতোম ব্যঙ্গবিদ্রূপের রসান চড়াবার জন্য কলকাতার বুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোন চিন্তার ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা—সমস্ত ব্যাপারেই চলিত ভাষা ব্যবহারে বিবেকানন্দ যেমন অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি নিজস্ব একটা ভাষারীতিও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চলিত ভাষার অনেকস্থলে তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, আলাপ-আলোচনা করি—সেই ভাষাই মনের ধাত্রী, এরকম একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর ছিল। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর একটি লেখায় তাঁর মনের ভাব চমৎকার ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন:

"চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?

যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলায় একটা কি কিস্তুত-কিমাকার উপস্থিত কর?…স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না…।" ('ভাববার কথা')

তাই তিনি প্রস্তাব করলেন—"যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকাতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকাতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।" এ কথাটাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন আরও একদশক পরে।

স্বামীজী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের হুবহু অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন:

"যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে সে কি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে "রাজা আসীৎ"। আহা-হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!—ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণও নেই।"

('ভাববার কথা')

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপের ধরনধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাদোষগুলিও তিনি পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর চলিত রীতি অত্যন্ত

জীবন্ত ; প্রাণবান, জীবনরসিক ও নিঃস্পৃহ বৈরাগীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে তাঁর ভাষা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে। হুতোমের স্ল্যাং বাক্‌রীতি বা পৌগণ্ডোচিত ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিত রীতিতে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকী রসিকতার প্রাচুর্য তাঁর গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে অবস্থিত সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। বীরবলের বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ও কৃত্রিম কলাকৌশলও তাঁর ভাষায় স্থান পায় নি—যদিও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' এবং 'পরিব্রাজকে' দর্শন-ইতিহাস-সমাজ সম্বন্ধে বহু মননশীল আলোচনা আছে। যথার্থ বলতে গেলে হুতোম বা বীরবল—কারো ভাষাই সাহিত্যের যথার্থ চলিত ভাষা নয়। হুতোমের ভাষা এতটা চলিত, ঘরোয়া ও বে-আব্রু যে, তাঁর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রসন্ন মন্তব্য খানিকটা স্বীকার করে নিতে হয়।[১] প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ড্রয়িংরুম-বিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। হুতোমের ভাষা একেবারে পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রম্ভালাপের বাঙ্‌ময় পায়চারি। এর কোনটাই যথার্থ চলিত ভাষা নয়, স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে'র গদ্যই চলিত ভাষার আদর্শ। 'পরিব্রাজকে'র ভাষাও চলিত, চিত্তাকর্ষী ; তবে চিঠির ভাষা বলে এতে ব্যক্তিগত ঘরোয়া ঢঙটা বেশী ফুটেছে।

বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি যে বিচিত্রমুখী—অনেকটা সহস্রমুখী বজ্রমানিকের মত, তা বোঝা যাবে তাঁর উল্লিখিত দু'খানি পুস্তিকা থেকে। যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সিদ্ধান্তে পৌঁছাই—সেই সহজ, প্রত্যক্ষ, সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্যরীতির পক্ষ

১. হুতোমের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য : "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য।"

সমর্থন করে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজেও পত্র ও অন্যান্য রচনায় সাধ্যমতো এই রীতি ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটির বৈশিষ্ট্য— শব্দযোজনায় তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহাব, বাক্যগঠন হ্রস্ব, চঙটা সংলাপের মতো। যেমন :

> "আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্তই করে, ত ইদিক-উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করেই হক, সমুদ্রে যাবেই, দু-একদিন আগে বা পরে, দুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু' একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে, ত আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এর ভাষাভঙ্গিমা বাধাহীন ও স্বচ্ছ; অনাবশ্যক তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই। লেখক চলিত ভাষার মুদ্রাদোষগুলিও ('ইদিক উদিকে') নিয়েছেন। তাই বলে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তিনি তৎসম শব্দের প্রতি অকারণে খড়্গহস্ত হন নি। এর সঙ্গে বীরবলের রচনার যে-কোন অংশ মিলিয়ে পড়লেই 'কৃষ্ণনাগরিক' প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকী ভাষার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়বে। যখন প্রমথ চৌধুরী বলেন "প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়"—তখন এ ভাষার চাকচিক্যে মুগ্ধ হলেও বার বার মনে হয় যে, এ হল দরবারী ভাষা এবং তা খাস-দরবারের অন্তর্ভুক্ত। "যাঁর বোধ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য

নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গাল্‌চে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়, সেই ঘাস যতদূর যাও, সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস. কে যেন ছেটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেছে।" ('পরিব্রাজক')

এর মধ্যে বাংলা দেশের শ্যামায়মান অরণ্যানী, রৌদ্রস্নাত ধান ক্ষেত আর নীলাম্বরী আকাশ যেন রঙের বাটিটি উপুড় করে দিয়েছে। স্বভাবোক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষাব, চোখেদেখা রূপের সঙ্গে মনের কথার আশ্চর্য সমন্বয় বাংলা দেশের কোন্ গদ্যশিল্পীর রচনায় এর চেয়ে সার্থক, প্রাণবন্ত, বর্ণধ্বনিময হতে পেবেছে ? অথচ এ বর্ণনায় স্বামীজী কৃত্রিম কাব্যকলার মায়াঞ্জন একেবাবেই ব্যবহাব কবেন নি। চিঠিতে সমুদ্রের বর্ণনা দেবার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্যরসসিক্ত বর্ণনা তাঁর ধাতে সয় না— "ফলকথা, মায়াব ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল কবা গেছে, এখন খপ্ করে স্বভাবের সৌন্দর্য কোথা পাই বল ?" কিন্তু বর্ণনধর্মী রচনায় স্বভাবোক্তি অনুসরণ করেও তিনি যে নিপুণ শিল্পসৃষ্টি কবতে পেরেছেন, তার প্রমাণ এই ছত্র ক'টি—যদিও এ বাক্‌রীতি বিলম্বিত—উপবাক্যের সমন্বয়ে একটু দীর্ঘ, তবু এর ভঙ্গিমায় শব্দের টঙ্কার ও ঝঙ্কার মিশে গেছে প্রতিদিনের পরিচিত বিবর্ণ দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে, এবং সেটা বেমানান হয় নি, কারণ এতে প্রচ্ছন্নভাবে কৌতুকের সুর মেশানো আছে।

"কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চির-নীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গ—তরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকতার

বড় রাস্তার ধারে, কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দেওয়ালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচোমুখরিত একতালা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে আর কাঠের তক্তায় বসে থেলো হুঁকো টানতে টানতে, কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—সেদিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। ('পরিব্রাজক')

স্বামীজীর বিবৃতিধর্মী চলিত গদ্যে কখনও লক্ষ্য করা যাবে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিবৃতি (যেমন 'পরিব্রাজকে'র ভ্রমণ বর্ণনা ও ধর্ম-দর্শন আলোচনা), কখনও চলিত ভাষার মধ্যেই তৎসম শব্দের নির্ঘোষ, কখনও তৎসম-তদ্ভব-দেশ-বিদেশী শব্দের একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে মিলে মিশে থাকাব আশ্চর্য দক্ষতা। একই বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—"সেই নির্মল নীলাভ জল, যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্না গোণা যায়"—আবার তারই সঙ্গে, "কর্দমাবিলা হরগাত্র-বিঘর্ষণশুভ্রা সহস্রপোতবক্ষা কলকেতার গঙ্গার" বর্ণনা অবিরোধে স্থান পেয়েছে। কখনও তিনি রূপরঙের নেশায় গঙ্গামায়ের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও-বা কল্পনা করে শিউরে উঠেছেন—"পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিম্‌নী।"

বিবেকানন্দ বিবৃতি ও বর্ণনাধর্মী চলিত গদ্যরীতির মধ্যে বহুস্থলে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। চলিত ভাষাতে এরকম গাঢ় বাক্‌পদ্ধতি সৃষ্টি তাঁর একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনপিনদ্ধ বা সমাসবদ্ধ দৃঢ় গাঁথুনির বাক্‌পুঞ্জের প্রতি তাঁর কোন অকারণ বিরাগ ছিল না, তিনি চলিত ভাষার অন্বয়ের মধ্যে তৎসম শব্দঝঙ্কারকে এমন চমৎকার মিশিয়ে দিতে পারতেন যে, ইদানীন্তন কালের কোন দুঃসাহসী লেখকও অতটা অগ্রসর হতে সঙ্কুচিত হবেন।) যেমন

স্বামীজীর এই বর্ণনা :

"ত্রিংশ কোটী মানবপ্রায় জীব—বহু শতাব্দীযাবৎ স্বজাতি-বিজাতি-স্বধর্মী-বিধর্মীর পদভরে নিপীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যৎবিহীন, যেনতেন প্রকারেণ বর্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ চাতুরী প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন আশাহীনের সমুচিত কদর্য ভীষণ কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধময় মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত-শরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।"

('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

একটিমাত্র বাক্য, সমাসবদ্ধ শব্দের শিকল—যা অনিপুণ কারিগরের হাতে পড়লে জড়ীভূত রোমন্থনে পরিণত হতে পারত, এখানে স্বামীজীর বিচিত্র বয়নকৌশলে সেই ভাষায় ভারতীয়দের বর্তমান জাড্যের প্রতি বলদর্পিত পাশ্চাত্যের ঘৃণাধিক্কার চমৎকার ফুটেছে। এখানে এর চেয়ে হালকা ছাঁদের শব্দ ব্যবহার করলে যথেষ্ট তীব্র হত না, তাই চলিত ভাষার মধ্যে তিনি অবলীলাক্রমে দেবভাষার সাহায্য নিয়েছেন। আবার পাশ্চাত্যের প্রতি আমাদের অজ্ঞ মনোভাব কৌতুকঘৃণামিশ্রিত ভাষায় চমৎকার ফুটেছে :

"আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছ-বিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচে,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

আমাদের বক্তব্য হল, চলিত রীতিতে তিনি শুধু তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহার করেন নি, বহুস্থলে প্রায় মুখের কথার প্রচলিত ঢঙটাকেও

নিয়েছিলেন। হুতোম টানা গদ্যরচনায় এই নাটকীয় রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন[২], উত্তর কলকাতার পুরানো বাসিন্দাদের ভাষারীতি, যা হুতোম কলমবন্দী করেছিলেন ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা দেবার জন্য, বিবেকানন্দ সেই মুখের ভাষাকেই বিবৃতিমূলক বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন; অবশ্য কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের জন্যই তিনি এই মৌখিক সংলাপের ঢঙটা নিয়েছেন। যেমন—"খাবার সময়ে শত ছোরার চক্‌চকানি, আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে ভু-ভায়ার ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষী ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ করে ছুরিখানা তাঁর গায়েই বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা! বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিকনেস হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের গোঁসাইজী ত কিছুই বলেন না।" এ ভাষার কৌতুকরসটাকে একেবারে আটপৌরে ভাবে পরিবেশন করেছেন, ৮ এ ভাষা এখনও ভদ্রাভদ্র সকলেই ব্যবহার করে থাকি। স্বামীজী প্রতিদিনের চলিত মুখের কথাকে কোনও দিন অসম্মান করেন নি, চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে) দু-চারিটির দৃষ্টান্ত ঃ

২. কলকাতার চড়ক পার্বণ উপলক্ষে হুতোমের রঙ্গরসপূর্ণ তীক্ষ্ণ উক্তিতে নাটকীয়তা বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়েছে—"আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু করবেন। ...আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে, আবার কি বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদভিন্ন অন্যভাষায় তাঁকে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না —আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না?"

খুলে পালাল, অন্য একটা 'বাঘা' হাঙরের আবির্ভাব হল, শূয়োরের মাংস সমেত বঁড়শি গলাধঃকরণ করল, তারপর 'দে টান, দে টান' করে তাকে জাহাজের ডেকে তোলা হল, স্বামীজী তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। "সাদা লাল জরদা" রঙের বঁড়শিবিদ্ধ শূয়োরের মাংসের রঙিন উপমাটিও grotesque রসের আশ্চর্য উদাহরণ—"আসল ইংরেজি শূয়ারের মাংস কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙবেবঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে—" একেই যথার্থ মজলিসী রসিকতা বলে। তারপর টোপে-গাঁথা বিরাট হাঙর ধরা, জাহাজে টেনে তোলা, 'ফৌজি ম্যানে'র মুমূর্ষু হাঙরের ওপব দুমদুম্ কবে কড়িকাঠ প্রহার করে বীরত্ব প্রকাশ করা এবং সর্বোপরি করুণহৃদয় মহিলাদের শোকার্ত বিলাপ বর্ণনা ("আর মেয়েরা- আহা কি নিষ্ঠুর, মের না, ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল—অথচ দেখতে ছাড়বে না!") অনাবিল রসিকতার সার্থক দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ এই জাতীয় রসিকতা এমন একটি প্রসন্ন অথচ নিঃস্পৃহ মনের ধর্ম, যা বৈরাগ্যব্রতীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু স্বামীজী তো গিরিদরীবাসী মুমুক্ষু সাধকমাত্র ছিলেন না, জগৎ ও জীবনের অন্তস্তলেই তিনি তাঁর আসন পেতেছিলেন; তাই প্রতিদিনের জীবনের অসঙ্গতি, হাস্য পরিহাস তাঁর বিশাল হৃদয়কে সুধারসে সিক্ত করেছিল। তাঁর এই রঙ্গ ও পরিহাস কি রকম অর্থবহ হয়েছে, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে:

"ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে চিরকাল।

যদি না পছন্দ হয়, সরে পড়না কেন? তোমাদের ছচার জনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন করতে হবে বুঝি?" ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে পরিহাস তীব্র ব্যঙ্গের রূপ ধরেছে। আর্যামির অভিমান আর সমাজের নিম্নবর্ণের প্রতি ঘৃণা, স্বামীজীকে রুদ্ররোষে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে বারবার। উচ্চবর্ণের প্রতি তাঁর ধিক্কারবাণী এখনও কানে ভেসে আসছে:

"আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা ডম্‌ম্‌ম্[৩] বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজাব বছরের মমি।"

এই অতীতজীবী আভিজাত্যকে বিদ্রূপ করে তিনি ধারালো কণ্ঠে বলেছেন—"এ মায়ার সংসারেব আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা, তোমরা—ভাবতের উচ্চবর্ণেবা। তোমবা ভূতকাল, লুঙ্-লঙ্-লিট সব একসঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদেব দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন!" বলতে বলতে তিনি ভারতের হীন অন্ত্যজ মানুষের দিকে চেয়ে দেখলেন—দেখলেন ভারতের মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াহ্‌ গুরুকি ফতে' বলে নতুন ভারত বেবিয়ে আসবে। সেই ভাবী ভারতের নবজাগরণ লক্ষ্য করে স্বামীজী যেন দিব্য দৃষ্টির দ্বারা আবিষ্ট হলেন:

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা,

৩. আর্যামির নিন্দা করে তিনি 'পরিব্রাজকে'র এক জায়গায় এই 'ডম্‌ম্‌ম্' এর উল্লেখ করে বলেছেন—"একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্!"

মুচি মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।" ('পরিব্রাজক')

এ যেন স্তোত্র—'প্রাণায় স্বাহা' বলে পূষণের কাছে হবিঃ দানের দিব্য মুহূর্তে উচ্চারিত উজ্জীবন মন্ত্র।

বিবেকানন্দের গদ্যরীতি সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করা হয় নি; বাংলা গদ্য রীতি গঠনে তিনি যে অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন, তৎসম-তদ্ভব, দেশজ শব্দ, বাইরের ভব্য ভাষা এবং ঘরের আটপৌরে ভাষার আশ্চর্য মিল ঘটিয়েছেন, তার স্বরূপ-লক্ষণ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে। চলিত-ভাষাকে তথাকথিত বিদগ্ধ ভব্যরূপ না দিয়ে তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে, তাতে ওজঃ ও রস সঞ্চার করে তিনি চলিত গদ্যকে যে আকার দিতে চেয়েছিলেন, নানা কারণে তার দিকে সে যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট হয় নি। 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর থেকে প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা চলিত গদ্যরীতি যখন যথার্থ সাহিত্যের দরবারের আসনটিকে দখল করে নিল, তখনও বড় কেউ ভেবে দেখেন নি যে, তারও পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এর সাহায্যে বাক্‌রীতির নানা বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের লঘুকরণই যে চলিত রীতির প্রধান লক্ষণ নয়, তা স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পড়লেই বোঝা যাবে। চলিত রীতির বড় কথা—চলতি জীবনের ইডিয়ম্‌, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের নতুন রীতি, শব্দ-বিন্যাসের রূপান্তর। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ছোট করে ছেঁটে দিলেই কিছু চলতি ভাষা হয় না। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়?" এই উক্তিকে একটু

ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ-সর্বনামকে ছোট করলেই কি চলতি ভাষা হয়? সে কথা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে বুঝতেন, এবং বুঝতেন বলেই তাঁর ভাষা যথার্থ মুখের ভাষার সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে, বিদগ্ধ ইষ্টগোষ্ঠীর রসচর্বণায় পর্যবসিত হয় নি।

১.

বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত মানুষ নিজ নিজ ভাব ও ভাবনা অনুসারে একটা বৃহত্তর শক্তির পরিকল্পনা করে। যা বোধাতীত, তাকে সে সীমাবদ্ধ মনোধর্মের মধ্যে প্রতিফলিত করবার জন্য অভিপ্রয়াসী হয়। সৃষ্টি-রহস্যের অমোঘ ও অধৃষ্য শক্তি তাই সর্বযুগের মানুষকে কখনও ভয়ে, কখনও-বা ভক্তিতে নত করে। মানুষ সেই শক্তির ওপর যে-দেবত্বের আবোপ করে, তা মানুষের নিজের রূপগুণ থেকেই পরিকল্পিত হয়। গুহাহিত নির্গুণ চেতনবস্তুর কথা স্বতন্ত্র; তার জন্য বস্তুতন্মাত্রহীন অবিকারী উপলব্ধির প্রয়োজন। কিন্তু জড়জগতের অধিবাসী ষড়ায়তন-বন্দী যে মানবক বহিঃপ্রকৃতির নখরাঘাতের ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক, তাকে বাধ্য হয়ে করচরণযুক্ত মানবধর্মী ঈশ্বরচেতনা অবলম্বন কবতে হয়। য়ুরোপে ও প্রাচ্যদেশে ইহজীবন-বহির্ভূত নির্গুণ ঈশ্বরচিন্তা এবং সগুণ ঈশ্বরপরিকল্পনা মোটামুটি এই পথ ধরে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় বেনেসাঁস, ধর্মসংস্কার, জ্ঞানবিজ্ঞানেব প্রচুব অনুশীলন ও নানা ভৌগোলিক আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের ইহজীবন ও ভৌমসত্তা যে মূলতঃ মানব-নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি-আশ্রয়ী—তা প্রায় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকেই জনচিত্তে অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আলকেমি-বিশারদেরা অধরা চিন্তামণির সন্ধানে বারবার ছুটে ব্যর্থ হলেও হাতে পেলেন রসায়নতত্ত্ব; গণিতজ্ঞ ও জোতির্বিদেরা মাপজোখ করে এবং দূরবীন কবে আবিষ্কার করলেন—'এ ব্রহ্মাণ্ড কী প্রকাণ্ড!' স্থির হল, বিশ্বনিয়ম বিশ্বনিয়ন্তার হস্তামলক হোক, আর নাই হোক—এ জগৎ-প্রপঞ্চ মানববুদ্ধির

দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ। এই রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জ্ঞানবিজ্ঞান ও হেলেনীয় মানবধর্মের ধারা গির্জাচত্বরে-বন্দী য়ুরোপের মানুষকে যুক্তিমার্গীয় প্রত্যয়ের মধ্যে মুক্তি দিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপ বুঝতে পেরেছিল—মানুষই সৃষ্টিনেমির কেন্দ্রবিন্দু। ফরাসী ভাষায় যাকে বলা হয়েছে *l'uomo universale*—অর্থাৎ বিশ্বমানব, সেই মানবই হচ্ছে মানুষের পূজার বস্তু। রুশো, ভোল্‌তেয়ব, দিদেরো থেকে কোঁৎ, মিল, বেন্থাম প্রভৃতি হিতবাদী ও ধ্রুববাদীরা বিশ্বাকাশ-সঞ্চারী বিবাটকে সিংহাসনচ্যুত করে সেখানে মানুষকেই যৌবরাজ্য দিলেন। একেই বলা যেতে পারে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা, মানব-প্রাধান্যেব মূল রহস্য।

ভারতবর্ষের ধূলিকণা পর্যন্ত গৈরিক রং-মাখা—এদেশী বিদেশী সকলেরই এ বিশ্বাস আছে। এই 'other worldliness'-কে পাশ্চাত্যেব ইহমুগ্ধ ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করে থাকেন। ভারত-সভ্যতাব দীর্ঘবিস্তাবী ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এ জীবন-সাধনার অন্তরে-বাইবে পিপ্পলী বৃক্ষশাখায় সমাসীন দুটি সুপর্ণের মতো মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী অধিষ্ঠিত আছেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্বর্গকে সমভাবে সেবা করতে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি শুধু একটিতে লগ্ন হয়ে থাকে (হোক না ধর্ম), সে জঘন্য—একথা শাস্ত্রেই উচ্চারিত হয়েছে। ভাবতের ধ্যানধর্ম মূলতঃ জীবনবিমুখ নয়, বরং জীবন-সমুখ। প্রাচীন ভারতে তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধনকে অস্বীকার করা হয় নি, দেহকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয় নি—আবার বার্হস্পত্য দর্শন বা hedonismকেও কখনও সর্বসাধ্যসার বলা হয় নি। ভারতে যেমন নগ্নক্ষপণক বৈরাগীর দল ছিল, তেমনি ছিল বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমাজ। মোক্ষশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র এদেশে অবিরোধে অনুশীলিত হয়েছে—"একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা"—হয় সুন্দরী ভার্যা, আর না হয় গিরিগুহায় সন্ন্যাসজীবন যাপন—এর মধ্যে প্রাচীন ভারত কোন

বিসদৃশ পার্থক্য দেখতে পায় নি। একেই যথার্থ জীবনবাদী দৃষ্টি বলে। এই সংযোগ ছিন্ন হল বৌদ্ধযুগে। বৌদ্ধধর্ম শুধু অনাত্মবাদী নয়, এ মত জীবনবিরোধী নাস্তিত্বের শূন্যমণ্ডলে মায়াপ্রপঞ্চে উদ্বর্তিত হয়েছে। ফলে বৌদ্ধযুগে এবং তারপরে মানুষ হল পঞ্চস্কন্ধাত্মক ক্ষণভঙ্গবাদী প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র, দেশবাসী হল কাষায়-করণ্ডকধারী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, প্রব্রজ্যা হল জীবনধর্ম, সঙ্ঘারাম কেড়ে নিল গার্হস্থ্যাশ্রম। তার পরের ইতিহাস সকলের জানা আছে। মর্ত্যজীবী ইস্‌লামের ইহকেন্দ্রিক জ্বলন্ত দৃষ্টির সম্মুখে বৈরাগ্যের তামসিক কন্থাধারী জীবন-ভীরুহিন্দু সমাজ ও নেতিবাদী বৌদ্ধসমাজের দুর্গতির ধূমাঙ্কিত কালিমা আজ হাজার বছর ধরে এ জাতির ভালে কলঙ্ক-তিলক হয়ে বিরাজ করছে।

পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বাঙালীর সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মীয় আচার-আচরণে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তাকে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে উনিশ শতকী রেনেসাঁস বলা হয়। এই নবজাগরণ প্রধানতঃ এই পূর্বপ্রান্তের শ্যাম আর্দ্র দেশ থেকেই শুরু হয়েছে—যেমন করে পূর্ব দিগন্তে সূর্য ওঠা শুরু হয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে মানবরসের ধারা বহমান ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে বাহ্যতঃ ধর্ম ও উপধর্ম-বিশ্বাসের ছাপ থাকলেও 'কায়াসাধনা' যে এ জাতির মূলমন্ত্র, তা মধ্যযুগের ধর্মীয় আবরণখানা তুলে ধরলেই চোখে পড়বে। আদি-অস্ট্রিক জীবনধারার কেন্দ্রভূমি বলেই হোক, অথবা তন্ত্রের দেশ বলেই হোক—এদেশে মানবদেহকে কখনই অশুচি বলে দূরে নিক্ষেপ করা হয় নি। উনিশ শতকে তাই জীবনবাদী য়ুরোপীয় সাহিত্য ও আদর্শের সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্রই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় জ্ঞানবিশ্বাস শিথিল হয়ে গেল, এবং প্রাচীন জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে মানবধর্ম প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তাই-ই পাশ্চাত্য বারিবর্ষণের ফলে এই

মাটিতেই নবরূপে অঙ্কুরিত হল।

রামমোহন, 'ইয়ং বেঙ্গল দল,' বিদ্যাসাগর, ভূদেব এবং সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম ও আদর্শকে একটা নতুন ইহসচেতন মানবমুখী জীবনের দ্বারা পরিমার্জিত করে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে, তাঁর অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ রচনা ও বজ্রঘোষী বক্তৃতায় সেই মানব-আদর্শই একটা অভূতপূর্ব গৌরব লাভ করেছে। বিবেকানন্দের সর্বকর্ম-ধ্যানধর্ম এই অসহায় মানবসঙ্ঘকেই নিবেদিত। এ জীবনাদর্শ তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকেই আশীর্বাদ-স্বরূপ লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এমন এক বিচিত্র ধরনের ধর্মগুরু, যিনি ধর্মের সঙ্গে ইহজীবনের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের এবং মুক্তির সঙ্গে ভক্তির সহযোগ ধরতে পেরেছিলেন। পরমহংস ত্যাগী; কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রেমের যোগ হয়েছিল বলে তিনি শুষ্ককাষ্ঠ ত্যাগের অনিকেত যাত্রাপথ ত্যাগ করে 'রসে-বশে' লগ্ন হয়েছিলেন। এই যে বিবর্ণ জীবনকেও পরম ধৃতির মধ্যে উপলব্ধি করা, পাঞ্চ-ভৌতিক জীবনসত্তাকে ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুদ্ব্যোমের অণুপরমাণুরূপে না দেখে চিন্ময় প্রাণকণিকারূপে উপলব্ধি করার গুরুমন্ত্র বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধকের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

২.

বিবেকানন্দের মানবতাবাদ বেদান্ত-আশ্রয়ী—এ কথাটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার।* কারণ বাহ্যতঃ প্রাচ্যের বেদান্তবাদ ও পাশ্চাত্যের হিউম্যানিজম্ বা মানবতাবাদ— উভয়ের মধ্যে কুলগত পার্থক্য আছে, এমন কি একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক বিসদৃশ বলেও মনে হতে পারে। কারণ মানবতাবাদের মূলকথা ইহজীবন, মানুষের বাস্তব

* 'বিবেকানন্দ ও বেদান্ত' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

সত্তার সঙ্গে যার একমাত্র সম্পর্ক। অপরদিকে পৃথক মানবসত্তা, জীবসত্তা ও তন্মাত্রের জগৎকে বেদান্ত অধ্যাস বলে পরিত্যাগ করে দেশকালাতীত সদ্বস্তুতে বিশ্বাসী। তাই বেদান্তবাদী তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত অন্য কোনো সদ্বস্তুতে আস্থা স্থাপনে রাজি নন। বেদান্তের শেষ কথা—ইন্দ্রিয়জ জগতের শুক্তি-ভ্রমকে নস্যাৎ করে নিষ্কল ও নির্বিকল্প ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা। তাই বেদান্তবাদীরা জগৎ-প্রত্যয়কে 'সন্ততি' (series) বলে একে "মায়া নু মতিভ্রমো নু" পর্যায়ে ফেলতে চান এবং অনিত্য জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরালবর্তী অদ্বয়কেই একমাত্র স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। বিশুদ্ধ মানবতাবাদ এবং বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদে এইখানে বড় রকমের পার্থক্য। মানবতাবাদ প্রত্যেক মানুষকে সত্য ও সদ্বস্তু বলে স্বীকার করে, তদতিরিক্ত কোনও সদ্বস্তুর সন্ধান মানবতাবাদের সন্ধিৎসার মধ্যে পড়ে না। দেহদশাধীন, 'মমকার'বন্দী ও জগৎযূপবদ্ধ মানুষের কল্যাণ কামনা এবং মানুষকেই সৃষ্টিধর বলে বিশ্বাস করা মানবতাবাদীদের প্রধান ধর্ম। কোঁৎ, মিল, বেন্থাম—এরা কেউ মানবনীতি, কেউ সমাজনীতি, কেউ রাজনীতির বর্ত্ম দিয়েই মানবতা-বাদকে সূচিত করেছেন, এবং দেবতার স্থানে মানুষকে বসিয়েছেন। তাই মানবতাবাদী ও বেদান্তবাদীদের মধ্যে চিন্তা ও তত্ত্বগত মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়।

আমাদের দেশে রামমোহন থেকে বেদান্তবাদ ও মানবতাবাদ হাত-ধরাধরি করে চলেছে বটে, কিন্তু এ দুয়ের জ্ঞাতিশত্রুতা ঘোচানো সম্ভব হয় নি। রামমোহন নিজে বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, অথচ অশনেবসনে ভোগীবৎ আচরণ করতেন। এমন কি, দৈনন্দিন জীবনে বেদান্তানুশীলন তিনি সব সময় সমর্থন করতেন না। তিনি মনে করতেন যে, এদেশের যুবসমাজ বেদান্ত অনুশীলন করলে ব্যবহারিক জীবনে অকর্মণ্য হয়ে যাবে। তাঁর মতে বেদান্ত পড়ে সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পড়ুয়ারা মায়াবাদী এবং বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে।

তিনি জ্ঞানের জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক করে দেখেছিলেন ব্যক্তিগত আচার আচরণের সঙ্গে বেদান্তের জ্ঞানবাদকে মিশিয়ে ফেলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। বহু-দেববাদের স্থলে বেদান্তপন্থী একেশ্বরবাদ গ্রহণ না করলে বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ে খণ্ড-বিখণ্ড ভারতীয় হিন্দুসমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। কিন্তু বেদান্ত-প্রতিপাদিত মায়াবাদ অবলম্বন করে সাধারণ লোকে জীবনবিমুখ হয়ে পড়বে, নৈষ্কর্ম্যের আড়ালে বসে নিষ্কর্মা হয়ে থাকবে -কঠোর কর্মযোগী রামমোহন কখনও তা চান নি। তাঁর বেদান্তবোধের সঙ্গে বাস্তব জীবনেরই যেন অধিকতর যোগ। ভারতবাসীর কল্যাণ, সামাজিক ক্রমোন্নতি, রাজনৈতিক ঐক্য—রামমোহন প্রধানতঃ এই সমস্ত বাস্তব উদ্দেশ্য নিয়েই বেদান্ত অনুশীলনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি প্রচলিত অর্থে বেদান্তবাদী ছিলেন না, মানবতাবাদের সঙ্গেই তাঁর নাড়ির যোগ ছিল। ঐহিকতা ত্যাগ করে পরত্রের দিকে হাত বাড়ানো তিনি প্রত্যবায় বলে মনে করতেন।

দেবেন্দ্রনাথ বেদান্ত ও উপনিষদের তত্ত্বাদর্শে দৃঢ়নিষন্ন হয়ে উপনিষদের ভক্তিবাদই জীবনে বরণ করেছিলেন। তিনি চরিত্রের দিক থেকে ধ্যানযোগী ছিলেন। কাজেই বেদান্তের যুক্তিমার্গকে নিজের ভক্তিনত চিত্তের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং বেদান্তধর্ম ও ঐহিকতাকে একসূত্রে বেঁধে দেবার জন্য ততটা ব্যাকুল হন নি। আসলে তিনি ছিলেন সাধক ভক্ত, শান্তরসের ভক্তিবাদ তাঁর মূলমন্ত্র। বেদান্তকে তিনি এই দৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন।

কিন্তু যথার্থ মানবতাবাদ বিদ্যাসাগরের মধ্যে গিয়ে একপ্রকার নাস্তিক্যবাদী অথবা সংশয়বাদী ইহচেতনার রূপ ধারণ করেছিল। তিনি ঈশ্বরচেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন কিনা, জগৎ ও জীবনকে জড়বস্তু বলে মনে করতেন কিনা, এবং জড় ও অজড়ের ভেদ সম্বন্ধে সচেতন

ছিলেন কিনা, তাতে নানা সংশয় আছে। 'বোধোদয়ে'র গোড়ার দিকে পরমেশ্বর সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ যোগ করলেও এ বিষয়ে তিনি কোঁতের মতো বিশুদ্ধ 'পজিটিভিস্ট' ছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য অনুসারে[১] বিদ্যাসাগরকে নিরীশ্বরবাদী বলতে হয়। তাঁর জীবনকথা আলোচনা করলে তাঁকে কিছুতেই ঈশ্বরবাদী বলা যায় না। পুরীর সমুদ্রতটের অদূরে জাহাজডুবি হওয়ায় বহু নর-নারী বালবৃদ্ধ জলে ডুবে মারা যায়। এই ঘটনা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর পরমকারুণিক মঙ্গলময় বিধাতার অস্তিত্বে এবং মঙ্গলময়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন :

> "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর, যে নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্রে ডুবাইলেন? আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০।৮০০ লোককে একত্র এক সময়ে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালাইয়া দিলেন? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।"[২]

এদিক থেকে বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য মানববাদীদের সমপন্থী। কারণ তিনি বিশ্বজগৎকে ঈশ্বরব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তারূপেই দেখেছিলেন, অনুমানের চেয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ওপর অধিকতর আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন, এবং মানুষের বাস্তব দুঃখ দূর করবার জন্য সারা জীবন নিয়োগ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমজীবনে কোঁৎ-পন্থী ছিলেন—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে

১. "পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল; চিরকাল-পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?—'পুরাতন প্রসঙ্গ' (নতুন সংস্করণ)

২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর

শিক্ষিত সমাজে কোঁৎ-পন্থী হওয়া ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্য হেতুবাদে বুদ্ধিকে শানিত করে বঙ্কিমচন্দ্র মানবতাবাদের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং হিতবাদ ও ধ্রুববাদের দ্বারা তিনি নিজের যুক্তিকে মার্জিত করেছিলেন। তিনি নানা প্রসঙ্গে ভক্তিভরে কোঁতের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উত্তরকালে 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' আলোচনা করার সময়ে তিনি ঈশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং কোঁৎ-মিলের মানবতাবাদের সঙ্গে গীতার ঈশ্বরবাদ জুড়ে দিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিন্তার জগতের মধ্যে সেতু রচনা করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি ইহমুখী হিতবাদ ও ধ্রুববাদকে আর ততটা আমল দেন নি। কমলাকান্ত তো মিলের ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্‌কে 'উদর-দর্শন' বলে ব্যঙ্গই করেছেন। এই পটভূমিকায় বিবেকানন্দের মানবতাবাদের স্বরূপ ও তাৎপর্য বোঝা যাবে। বস্তুতঃ স্বামীজীর সমগ্র জীবনের মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে সনাতন ভারতের জীবনমুক্তি, অধ্যাত্মপিপাসা, বিশ্ববিরহিত নির্বিকল্প সাধনা-ধ্যান-মনন,—অপর দিকে ইহজগতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় স্থাপনের ইচ্ছা, দেশের কল্যাণ করা, ভারতের সর্ববিধ মঙ্গল চিন্তা, সমাজ-রাষ্ট্র শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে গবেষকের মতো অনুসন্ধিৎসা, মানুষ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ, সর্বত্যাগী অথচ সর্বদুঃখে আত্মদান-কারী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ স্থাপন। একদিকে বরাহনগরের মঠে ধ্যানধারণা, হৃষীকেশে গিয়ে মাধুকরী মাত্র অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হবার ইচ্ছা, মাঝে মাঝে একা থাকার দুর্নিবার বাসনা, গুরুভাইদের সঙ্গ ত্যাগ করে উধাও হয়ে যাওয়া,—অপর দিকে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে প্রচণ্ড রাজসিক বিক্রমে ভারতমহিমা প্রচার করা, এদেশের কোটি কোটি নিরন্ন রুগ্‌ণ নীচজাতির জন্য সীমাহীন প্রেম, পূতিগন্ধময় জাতিকে জীয়নকাঠি ছুঁইয়ে বাঁচিয়ে তোলা—স্বামীজীর জীবন এই দুই বিপরীত মেরুপথে সঞ্চরমাণ।

৩.

প্রথম যৌবনের ধর্মোন্মাদ মুহূর্তে স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধির ভাবরসে নিমগ্ন হতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে হৃষীকেশের চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরসংলগ্ন কুটীরে বাস করে ধ্যানসাধনায় জীবন অতিবাহিত করতে উন্মুখ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড রাজসিক বীরভাব তাঁকে মুমুক্ষু ধ্যানধারণার গভীরে অবলুপ্ত করে রাখতে পারে নি। পরিব্রাজক নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী বিবেকানন্দ তাই পদব্রজে সারা ভারতকে জেনেছেন; দরিদ্র, নিপীড়িত, সঙ্কুচিত মানুষের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার দেখে সিংহগর্জনে বলে উঠেছেন :

> "এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।" ('পরিব্রাজক')

তাই তিনি মুচি মেথরের মধ্যে নব ভারতভাগ্যবিধাতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, মহাশূদ্রদের মহামানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তামসিক বৈরাগ্যের ঘৃণ্য ভান ত্যাগ করে মানব-জীবনবাদী রাজসিকতার সুস্থ স্বাভাবিক প্রকাশ কামনা করেছেন। একবার তিনি তাঁর এক শিষ্যকে নিজের মনের কথাটা চমৎকারভাবে বলেছিলেন :

> "ইচ্ছা করলে ত আমি হিমালয়ের গুহায় সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতে পারি।···তবে কেন ঐরূপ করি না? কেনই বা এদেশে রয়েছি? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আর স্থির থাকতে পারিনে। সমাধি-ফমাধি তুচ্ছ বোধ হয়—"তুচ্ছং ব্রহ্মপদং" হয়ে যায়। তোদের মঙ্গল কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রত। যেদিন ঐ ব্রত শেষ হবে, সেদিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মারব!" ('স্বামি-শিষ্য সংবাদ')

আবার তিনিই বলেছেন :

"কয়দিনের জন্যই বা শরীর ? কয়দিনের জন্যই বা সুখ-দুঃখ ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভিতরের আত্মাকে জাগা, আর বল্—আমি অভয়পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এইভাবে সিদ্ধ হয়ে যা। তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্যপ্রদ নির্ভয়বাণী শোনা— "তত্ত্বমসি," "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" ('স্বামি-শিষ্য-সংবাদ')

এখানে এ দুটি উক্তি খুবই অর্থবহ। বস্তুতঃ স্বামীজীর জীবন, কর্ম ও মননে একদিকে বেদান্তের 'তত্ত্বমসি', আর একদিকে জনজীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম ও সহানুভূতি লক্ষ্য কবা যায়—যা চিরাচরিত বৈরাগ্যধর্মের সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি এ বিষয়ে তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "ভয় কি বাবা ? তোরা কি আর এ জগতের লোক—না-গেরস্ত, না-সন্ন্যাসী ! এই এক নূতন ঢং।" এর অর্থের মধ্যেই স্বামীজীর মানবতাবাদের মূল তাৎপর্য নিহিত আছে। লক্ষ্য করা যাবে, তিনি বক্তৃতা ও উপদেশের ছলে সকলকে বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করতে বলেছেন, বেদান্তকেই বিশ্বধর্ম বলে উপস্থাপন করেছেন, তুচ্ছ মানব-জীবনকে বেদান্তধর্মের মধ্যে স্থাপন করে নতুন সমন্বয়ের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র যদি উনিশ শতকী 'হিন্দু রিভাইভাল' (হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ)-এর জনক হন, তা হলে স্বামীজী হলেন 'বেদান্ত রিভাইভাল'-এর পতাকাবাহী।

রামমোহন বেদান্তধর্মকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি ; তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল পৌরাণিক বহু-দেববাদের বিরোধিতা এবং বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদকে একেশ্বরবাদ বলে প্রচার করে ধর্ম-উপধর্ম-সম্প্রদায়ে-বিভক্ত বিশাল মূঢ় সমাজকে রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ করা। স্বামীজী বেদান্তকে আরও

গভীর দিক থেকে দেখলেন—বেদান্তের অর্থ মানব-জীবনকে অস্বীকার করা নয়, প্রতিদিনের তুচ্ছ জড় জীবন বেদান্তের আলোতেই ভাস্বর হয়ে পড়ে; দুর্বল মানুষ তখন বেদান্তের মহৎ আশ্বাসবাণীতে মত্ত সিংহের মতো গর্জন করে ওঠে, তখন সমগ্র বসুন্ধরার মধ্যে সে নিজেকে অচল-অনড়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। জনজীবনের নিরিখে বিবেকানন্দ বেদান্তের সাত্ত্বিক গুণের মধ্যে রাজসিক গুণ সঞ্চার করে "চলমান শ্মশানের" বুকে "কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন" করেছেন। বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' নির্মোকের মধ্যে মহাপ্রস্থান করে স্বামীজী তো আত্মারাম হয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু এই মানবপ্রেমী মহাসাধকের সাধ্য কি যে আত্মচিন্তার গুহাকক্ষে বন্দী হয়ে থাকবেন? তিনি বলেছেন:

> "হায় হায়, এদেশের গরীব লোকদের কথা কেউ ভাবে না! এই যে মুচিমেথর, চাষামজুর—এরাই তো দেশের মেরুদণ্ড। এরাই তো আমাদের মুখে খাদ্য জোগায়, সেবা করে। মনে কর, তারা যদি একদিন কাজ বন্ধ করে, তা হলে শহরের কি অবস্থা হয়। কিন্তু তাদের কেউ সহানুভূতির চোখে দেখে না, তাদের দুঃখে কেউ সান্ত্বনা দেয় না।" ৩

তাই তিনি বলেছিলেন:

> "আমরা লাখ-লাখ সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষের জন্য কি করেছি? তাদের শুধু তত্ত্বদর্শন শেখাচ্ছি! এ তো নিছক পাগলামি। উপবাসী মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া—এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে? এই কোটী কোটী লোক যদি উপোস করেই মরল, তবে কি করে এরা উঠে দাঁড়াবে? তারা

৩ *Swamiji's Works*, Vol. VII থেকে লেখক কর্তৃক অনূদিত।

কি করে সমাজের শক্তিস্বরূপ হবে ?"[৪]

তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি "গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে স্বর্গের আরও কাছে যাওয়া যাবে ; আমরা লৌহপেশী মানুষ চাই।"[৫] এর মধ্যেই তাঁর বাস্তব জীবনের প্রতি মমতা, আকর্ষণ ও নিষ্ঠা ধরা পড়েছে। এই জন্য তাঁর বেদান্তধর্ম বুদ্ধিবিলাসীর সূক্ষ্ম মনন-রস নয়, সাধকের নিভৃত চিন্তা নয়, তত্ত্বরসিকের ব্রহ্মপদ লাভও নয়—এ বেদান্তধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে গভীর যোগাযোগ। রোমাঁ রোলাঁর একথা অতি সত্য—"Vivekananda's New-Vedantism,··· spread like burning alcohol in the veins of his intoxicated nation."[৬] তাঁর বেদান্তধর্ম তরুণভারতের শিরায় শিরায় অগ্নিদীপ্ত জীবন-চেতনা সঞ্চার করেছিল। বেদান্তের অর্থ ইহজীবন-বিস্মৃতি বা পার্থিব বিমুখতা নয়, বেদান্তের অর্থ—ব্যক্তি-অহং-এর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র সত্তাকে বৃহৎ মানবসঙ্ঘের মধ্যে সমর্পণ করা। স্বামীজী বেদান্তকে মূলতঃ 'লোকহিতায়' অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি কোনোদিন ব্যক্তিজীবন ও ইহসভ্যতার প্রতি বিমুখ বা বীতরাগ ছিলেন না। তাঁর মতে :

> "পার্থিব সভ্যতার বিরুদ্ধে বোকার মত কথা বল কেন? তোমরা এ সভ্যতা থেকে পিছিয়ে আছ, তাই একে নিন্দে কর, আঙুরফল তো টক হবেই। তোমাদের বোকামি না হয় মেনে নিলাম যে, ভারতে পারমার্থিক তত্ত্বে বিশ্বাসী লাখ খানেক ভক্ত-মানুষ আছেন। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোকের পরাবিদ্যা উপলব্ধির জন্য ৩০ কোটী লোককে উপোসী পশু

৪ *Works*, Vol. VII (লেখককৃত অনুবাদ)

৫ *The Life of Swami Vivekananda*, Vol. IV

৬ *Prophets of the New India*—R. Rolland

করে রাখতে হবে নাকি? এদেশের মানুষে উপোস করে কেন? মুসলমানেরা হিন্দুদের হারিয়ে দিলে কি করে? এর কারণ, হিন্দুরা ইহমুখী সভ্যতা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। মুসলমানেরাই তো হিন্দুদের দরজির তৈরি জামা পরা শেখালে। কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাওয়া-দাওয়া শেখে নি। এখনও তো আমরা খাবারদাবারে রাস্তার ধুলো না মিশিয়ে খেতে পারিনে। ঐহিক সভ্যতা, হোক তা বিলাসিতা—খুব দরকার; তা না হলে গরীবেরা কাজ পাবে কি করে? রুটি চাই, ভাত, শুধু ভাত চাই। যে ভগবান ইহজগতে আমাকে দুটো ভাত দিতে পারেন না, তিনি আমাকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে অনন্ত সুখ দেবেন? আমি এমন ভগবানে বিশ্বাস করি না। ভারতকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, গরীবকে খেতে দিতে হবে, শিক্ষা ছড়াতে হবে, পুরুতপুরুতের কবল থেকে সবাইকে রক্ষা করতে হবে। পুরুতের জুলুম চলবে না, চলবে না সমাজের অত্যাচার। প্রত্যেকের জন্য আরও খাদ্য চাই।"[৭]

মনে হচ্ছে, কথাগুলো যেন কোনো ভোটার্থী ময়দান-নেতার নির্বাচনী বক্তৃতা। কিন্তু এর ভেতরকার তাৎপর্যটুকু বুঝে নিলে স্বামীজীর মানবতাবাদ তাঁর ঋজুকঠিন উজ্জ্বল পুরুষকারের মতো দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

বিবেকানন্দের মানবতাবাদ, মিলের হিতবাদ ও কোঁতের ধ্রুববাদ বাহ্যতঃ প্রায় এক ধরনের। স্বামীজী ধর্মজগতের অধিবাসী হলেও জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেককেই শুধু ভালোবাসেন নি, তাদের অন্তরে মনুষ্যত্ব জাগাতে চেয়েছেন, ভীরু হৃদয়ে বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছেন।

৭ *Works* Vol IV (লেখককৃত অনুবাদ)

ভারতের অবহেলিত জনতার প্রতি তাঁর মাতৃসুলভ একটা স্নেহ-ব্যাকুলতা ছিল।) মিল ও কোঁৎ মানব কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান, নীতি প্রভৃতিকে বিচার করেছেন। কোঁৎ অতি পরিষ্কারভাবে, পজিটিভিজ্‌ম-এর মূলতত্ত্ব যে মানবতাবাদ, তা বলেছেন :

> "The study of the positive doctrine leads to the conclusion that man's true unity consisting in living for others. The positive worship has for its main object the development of the feelings conducing such a life." ৮

অন্যের জন্য আত্মত্যাগ কোঁৎ-দর্শনের অন্যতম প্রধান কথা, এবং মানবই সর্বশ্রেষ্ঠ, একথাও তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রচারও করেছেন। মিলের ইউটিলিটারিয়ান মত-ও পজিটিভিজ্‌ম্-এর মত মানবকল্যাণ ও মানবসুখের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—সব কিছুকেই তিনি 'Universal happiness'—এর অন্তর্ভুক্ত করে দেখেছেন। জেরিমি বেন্থামও ইহসুখের মানদণ্ডের দ্বারা আচরণের মূল্য নিরূপণ করেছেন। মিল্ ও বেন্থাম মানব-জীবনকে এক ধরনের নব্য-হেডোনিজ্‌ম্-এর (ঐহিক সুখ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন, অবশ্য তার সঙ্গে তাঁরা সামাজিক নীতিও ভোলেন নি। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লবের রক্তপতাকার তলে মানুষের কল্যাণ ও সুখের কথা তাঁরা বড় গলায় প্রচার করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু স্বামীজীর মানবতাবাদের সঙ্গে য়ুরোপীয় মানবতাবাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। উনিশ শতকের পজিটিভিজ্‌ম্ নর-কে নরোত্তম করতে চেয়েছে—তার অতিরিক্ত

৮ *The Catechism of Positivism*—A. Comte

কিছু নয়। এঁরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণকে পুরোপুরি বরবাদ না করলেও একে কোণঠাসা করে শুধু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষতঃ প্রত্যভিজ্ঞামূলক প্রতীতির ওপর অধিকতর নির্ভর করেছিলেন। কোঁৎ তো ধর্ম ও দর্শনকে পজিটিভিজ্‌ম্‌-এর তুলনায় নীচুতে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, মানবসভ্যতা ত্রিধারায় অগ্রসর হয়েছে। প্রথম ধারা ধর্মের যুগ। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন ইহমুখী সভ্যতায় পিছনে ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পায় নি, তখন সে জড়বস্তু ও প্রকৃতিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করে এক-ধরনের *fetichism*-কেই জীবনচেতনায় গ্রহণ করেছিল। পরে বহু-দেববাদের স্থলে এক-দেববাদের উৎপত্তি হল, জড় প্রকৃতির ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা লোপ পেল, বিশৃঙ্খল ও বিসদৃশ প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে মানুষ চিন্তার ঐক্য আবিষ্কার করল- এই পর্বের নাম দর্শনের যুগ। কিন্তু এই যুগেও মানবমনের চরম উন্নতি হয় নি ; সে উন্নতি এল আধুনিক কালে, উনিশ শতকে—যখন 'পজিটিভ' দর্শনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। এখন জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, প্রকৃতির রহস্যোদ্‌ঘাটনই আধুনিক যুগের মানবধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধুনা মানুষ বস্তুহীন বৃথা দার্শনিক চিন্তায় সময় কাটায় না, বা প্রকৃতির ব্যাপারে কোনো ঐশ্বরিক শক্তিকেও টেনে আনে না। এখন মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝে নিয়েছে যে, বিশ্বের প্রাণবিন্দু হচ্ছে এই মানুষ ; জ্ঞানবিজ্ঞান-লব্ধ আত্মপ্রত্যয় হল তার একমাত্র নিয়ন্তা—ঈশ্বরও নয়, দর্শনও নয়। মোটামুটি কোঁৎ-পরিকল্পিত 'পজিটিভ' দর্শন বা ধ্রুববাদ এই পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।

য়ুরোপীয় মানবতাবাদের ধারায় দেখা যাবে, নরকে নরোত্তম করার দিকেই এ ধরনের চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য ; ধর্মাচার ও নির্বস্তুক মনন-প্রণালীর চেয়ে মানবহিতবাদই এই মতের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়। কিন্তু বিবেকানন্দ মানবহিতবাদী হয়েও মানুষকে শুধু

দেহধর্মী জীব বলে ভাবতে পারেন নি, নর-কে নরোত্তম করেই তাঁর কাজ শেষ হয় নি, তাকে নারায়ণে পরিণত করাই তাঁর মানবতাবাদের মূল লক্ষ্য এবং সেই জন্য তাঁর মানবতাবাদ বেদান্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে অনুস্যূত।

কেউ কেউ বিবেকানন্দের জীবন, কর্ম ও চিন্তার মধ্যে মাঝে মাঝে আপাতঃ-বিরোধ দেখতে পেয়েছেন। কেউ তাঁর চরিত্রকে জটিল বলেছেন।[৯] কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে তাঁর জীবন ও চরিত্রকে আদৌ রহস্যময় ও ব্যাখ্যাতীত মনে হবে না। মানব-হিতবাদ, কল্যাণ ও পবিত্রতায় সুদৃঢ়ভাবে একনিষ্ঠ, কিন্তু মানুষের একমাত্র জৈব সত্তার উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনই তাঁর মানবতাবাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রথমে দেহসত্তা সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু বেদান্তের মধ্য দিয়ে দৃঢ় আত্মবল, শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বহিতে প্রাণদানের ইচ্ছাই তাঁর মানবতাবাদের লক্ষ্য। তিনি যদি শুধু বাস্তব মানুষের সুখদুঃখ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, পরত্রের দিকে না তাকাতেন, তা হলে বিশ্ববাসীর অন্তরে তিনি অনপনেয় স্মারকচিহ্ন হয়ে বিরাজ করতেন না। কেন না তাঁর আগেও অনেকে 'জগদ্ধিতায়' অনেক সদুপদেশ দিয়ে গেছেন, পরেও দেবেন। কিন্তু বিবেকানন্দ মানুষের বড় সত্তাকে দেখেছেন, দুর্বল মানবহৃদয়ে 'অভীঃ' মন্ত্র সঞ্চার করেছেন, পারিয়ার অন্তরে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর নারায়ণ দরিদ্রনারায়ণ। দেহদশাধীন, ইন্দ্রিয়ের ক্রীড়নক ও স্বার্থপরিকীর্ণ ক্ষুদ্র মানবকেরাও যে অমৃতের সন্তান, স্বামীজীর মানবতাবাদ সেই অমৃতমানবের বন্দনাগান, বিশীর্ণ বিবর্ণের মধ্যে বৃহৎ মানবসত্তার অবশ্যম্ভাবী ও

৯ The Swami Vivekananda was a life of striking contrast and moods of infinite liberty, which confounded even his friends at times......" *The Life.*

অভ্রান্ত স্বীকৃতি। এই নব্য-মানবতাবাদের (Neo-humanism) মূলকথা প্রেম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ। বিবেকানন্দ বেদান্তের মারফতে মানুষকে এই উদারতার বিশ্বপরিমণ্ডলে স্থাপন করেছেন। উনিশ শতকের য়ুরোপীয় মানবতাবাদ মোটামুটি পাঞ্চভৌতিক ও ভৌগোলিক মানুষের জয় ঘোষণা করেছে, ঈশ্বরচেতনা সেখানে বাহুল্যমাত্র, হানিকরও বটে। উনিশ শতকের সাগরপারের মানবতাবাদ— নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদ, আর বিবেকানন্দের মানবতাবাদ— সেশ্বরবাদী মানবতাবাদ। বেদান্তই তাঁকে সেই সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে: তাঁর মানবতাবাদ ও বেদান্তবাদ, একে অপরের পরিপূরক।

১০

ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র—মননের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ-কালের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ প্রভাব প্রায়শঃই একতরফা নয়, অনেকটা অন্যোন্য সম্পর্কের মতো। বিশেষতঃ একটা জাতি যখন নানাবিধ পরস্পরবিরোধী পূর্বহেতুর মধ্য দিয়ে যায়, তখন তার মানস-সংস্থানের ভূচিত্রাবলী যে ক্ষণে ক্ষণে রং বদল করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? একচক্ষু রণজিৎ সিংহ নাকি ভাবী ভারতের মানচিত্র সম্বন্ধে বলেছিলেন, "সব লাল হো জায়েগা।" ভূগোলের প্রতি একথা প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু কালের সঙ্গে যে মনের যোগ, তা কখনও একরঙা থাকতে পারে না। বহু বর্ণের বিচিত্র বিলাস মানুষের মনের যেমন ধর্ম, তেমনি একটা জাতিরও মনের কথা। ধর্মতন্ত্রই হোক, আর কর্মতন্ত্রই হোক—বায়ুমণ্ডলের চাপ এড়িয়ে কোন তন্ত্রসাধনই চলতে পারে না। তা নইলে বেদান্তকেশরী বৈরাগ্যব্রতী স্বামী বিবেকানন্দ নিরন্ন ভারতবাসীর মধ্যে নারায়ণকে খুঁজবেন কেন, কেনই-বা প্রাণায়াম-নিদিধ্যাসনাদি ছেড়ে মানবহিতে আত্মদানের জন্য ব্যাকুল হবেন?

ভারতবর্ষে সনাতন কাল থেকে ধর্মোপাসনা, সাধকজীবন এবং কর্মোদ্যোগের সঙ্গে ইহজীবনের সব সময়ে ঐক্য ধরা যায় নি, বা সাধকেরা ধর্ম ও কর্মকে একসূত্রে গাঁথতে চান নি। প্রতিদিনের অপরাবিদ্যালব্ধ শিশ্নোদরপরায়ণতা ও পরাবিদ্যালব্ধ মোক্ষের মধ্যে যোগ ঘটাতে গেলে এবং সমানুপাত রক্ষা করতে হলে রাজর্ষি জনকের মতো হতে হবে; সংসার, ইহজীবন, প্রত্যক্ষকে পরিত্যাগ না করে, তাকে অবলম্বন করেই মায়া-তিমির অতিক্রম করতে হবে। এটাই

আর্যধর্মের যথার্থ আদর্শ। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, এই দুইয়ের মধ্যে যাঁরা যথার্থ ভারসাম্য রাখতে পারেন, তাঁরা সংখ্যায় 'কোটিকে গোটিক'। তার ওপর আবার জীবন-পলাতক বৌদ্ধধর্মের সর্ববৈনাশিক নাস্তিক্যবাদ—এর ফলে উত্তরকালে ভারতবর্ষে জীবনবিমুখতা সাধকদের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ হয়। যিনি পরাবিদ্যার অনুশীলন করবেন তাঁকে অপরাবিদ্যা বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে; মোক্ষ-সাধনার জন্য গৃহকোটর ত্যাগ করে গিরিকন্দর অবলম্বন করতে হবে, এবং যৌবনেই বানপ্রস্থের পথে প্রস্থান করতে হবে,—এক কথায় বস্তু-তন্মাত্রজাত জগৎ-প্রপঞ্চ এবং অধ্যাত্মসাধনার মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ, এ সম্পর্কে এদেশের সনাতন-পন্থীদের মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বোধ হয় এ যুগে সর্বপ্রথম রামমোহন ভোগায়তন ও দেবায়তনের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করলেন। তিনি বেদান্তানুমোদিত ব্রহ্মবাদকে একেশ্বরবাদ বলে প্রচার করেছেন, সেই আদর্শ নিজে গ্রহণ করে অপরকে পৌরাণিক আদর্শ ও বহু-দেববাদ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন, নিজেও ঘোরতর পুরাণ-বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মোক্ষের জগৎ ও কর্মের জগৎকে মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করেন নি। ধর্ম ও তদাত্মক আচরণবাদ তাঁর অনুশীলনের বস্তু হলেও পার্থিব ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি প্রখর। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শান্তরসাস্পদ ভক্তির মধ্যে ডুবেছিলেন বটে, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে বিষয়ী না হলেও উদাসীন ছিলেন না। পিতার পর্বতপ্রমাণ ঋণ-শোধেই তাঁর বাস্তব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সুপ্রমাণিত হয়েছে। আর বিদ্যাসাগরের কথা তো স্বতন্ত্র। তিনি কোন বাক্‌পথাতীত পারমার্থিক সত্তায় বিশ্বাস করতেন কিনা সন্দেহ। পুরোপুরি স্টোয়িক, এপিকিউরিয়ান বা পজিটিভবাদী বিদ্যাসাগর ইহজীবন নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, পরকালের কথা ভাবার অবকাশ পান নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে দেখা যাচ্ছে, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও

সামাজিক আচার-আচরণ-আন্দোলন মৃত্তিকা স্পর্শ করতে শুরু করেছে। জর্জ টমসনের* শিষ্যের দল প্রথমে রাজনীতিকে ভেবেছিলেন আদর্শলোকের সুবর্ণগোলক। সে বিশ্বাস শিথিল হল সিপাহী বিদ্রোহ এবং তজ্জনিত ইংরেজদের পশুবৎ নির্মম ব্যবহারের ফলে। ব্রাহ্ম-সমাজের ঘরভেদী গণ্ডগোলের ফলে ধর্মনীতিগত নির্বিকল্প চিন্তাপ্রণালী বাধ্য হয়েই কঠোর বাস্তবের কলকোলাহলের মধ্যে নেমে এল, এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের ফলে সামাজিক আন্দোলনও ক্রমে ক্রমে ছায়াময় অবাস্তব কলেবর ত্যাগ করে জীবনসমস্যা-সংক্ষুব্ধ কঠিন কায়া গ্রহণ করল। বস্তুতঃ উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে তার পরবর্তী কালে বাঙালীর ভাবরসমুগ্ধ মন বায়বীয় চিন্তাপ্রণালী ত্যাগ করে কঠোর জীবনবাদের সম্মুখীন হয়েছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আলোচনার ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ধর্মালোচনা ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সহনশীল বাস্তববুদ্ধির দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছেন। তাঁর পরিকল্পিত অনুশীলনধর্ম বাস্তব মানবধর্মেরই নামান্তরমাত্র। এই পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যটির জীবন, ধ্যানধর্ম ও কর্ম আলোচনা করলে দেখা যাবে, তিনিও বর্তমান বিশ্বের বাস্তববোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কাষায়বস্ত্র ও দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করেছেন, দুর্বল মানুষকে বাস্তব দৃষ্টিকোণের দিক থেকেই বিচার করেছেন, পরাবিদ্যাকে অপরাবিদ্যার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

২.

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের কর্ম, ধ্যান ও সাধনাকে আধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এবং ব্যবহারিতাকে পরিহার না করে উপযোগকে যোগক্ষেমের সঙ্গে

* 'রবীন্দ্রনাথ ও উনিশ শতক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মেলাতে চেয়েছিলেন। তাই বর্তমান ভারতের জীবনধর্মে তাঁর প্রভাব সুদৃঢ় প্রত্যয়রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। জীবন ও পরিণাম সম্বন্ধে তাঁর এমন একটা বাস্তবনিষ্ঠ সংসক্তি ছিল যে, হৃষীকেশের গুহাগহ্বরে ধ্যান-সাধনায় আত্মমগ্ন না হয়ে, তিনি দুঃখক্ষুব্ধ জনসংঘের মধ্যে নেমে এসেছিলেন, সর্বহিতের জন্য ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রশ্ন করা, সংশয় প্রকাশ করা, অটল সত্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করা সর্বোপরি সাড়ে তিনহাত উচ্চ মানবকে সৃষ্টিচক্রের চক্রধারী বলে স্বীকার করা—এ হল উনিশ শতকী আধুনিকতার ধারা। স্বামীজী গেরুয়া ধারণ করলেও উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব বিশ্বে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, উনিশ শতকের উত্তপ্ত নিশ্বাস তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তাই ধর্মাচার, কর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবননীতি—সব বিষয়ে তিনি বলিষ্ঠ, আশাময়, ক্রিয়াবান মত ব্যক্ত করেছেন। সেই মতানুযায়ী তিনি নিজে কর্মযোগের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছেন, সকলকে জীবনের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন, এবং বাস্তবতাকে পরিহার না করে তাকে জীবনের সঙ্গে মেলাবার উপদেশ দিয়েছেন। আধুনিক ভাবতে তিনি ঋষিকুমার সৃষ্টি করতে চান নি, বলিষ্ঠ বাঁচাবাঁচা বাস্তব মানুষই তাঁর আদর্শ। আধুনিক ভাবতে এই তাঁর সর্বোত্তম দান।

বিবেকানন্দ বেদান্তকে ধ্যান ও ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন, যে-বেদান্ত তত্ত্ব মূলতঃ অনীহ, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, নিষ্কল চেতনামাত্র।* শঙ্করাচার্য-ব্যাখ্যাত বেদান্তসূত্রের মায়াবাদী ভাষ্যের প্রভাবে এদেশে ইহবিমুখী বৈরাগ্যসাধনা মানুষের পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত হয়েছে। সমগ্র সত্তার মূলকথা যদি ব্রহ্মতত্ত্ব হয়, যে ব্রহ্মতত্ত্ব হচ্ছে আপোষরফাহীন অদ্বয়বাদ, এবং যে অদ্বয়বাদ জীবের পৃথক্ সত্তাকে লোপ করে দেয়,

* পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়ময় জগৎ-প্রত্যয়কে অধ্যাস ব্যতীত আর কিছু ভাবতে পারে না—তার দ্বারা আর যাই হোক, জীবসেবা চলে না। কারণ কুম্ভের মৃদাবরণ ভগ্ন হলে অপরিমেয় সমুদ্রজল ও কুম্ভগর্ভলীন গণ্ডূষ-পরিমিত জল—কে কার পরিমাণ করবে? কিন্তু স্বামীজী যুগযুগব্যাপী ধর্ম-সাধনাকে এক অভূতপূর্ব উপযোগবাদের সোপানের ওপরে স্থাপন করেছেন। বেদান্ত তাঁকে বাস্তবজীবনে উদাসীন করে নি, দেহপিঞ্জরের মধ্যে বন্দী মানুষকে নিষ্কামভাবে জগৎহিতে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবকে শিব বলে, microcosm ও macrocosm-এর ভেদ ভুলিয়ে, নরের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করে এবং ভীরুহৃদয়ে প্রচণ্ড পৌরুষ জাগিয়ে স্বামীজী বর্তমানকালের সঙ্গে বেদান্তকে সমন্বিত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "বেদান্ত ভারতীয় ধর্মজীবনকে অতি অবশ্যই ধারণ করে থাকবে।" (অনুবাদ) এই বেদান্তের অর্থ—'Dynamic religion'। সেই প্রচণ্ড প্রাণবান ধর্ম, যা আধুনিক ভারতের তামসিকতা ও জাড্য দূর করে প্রাণসঞ্জীবন মন্ত্র দান করবে তার সম্বন্ধে তাঁর উক্তি স্মরণীয়:

"শুধু বেদান্ত পড়ে কি হবে? আমাদের বাস্তবজীবনে বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বকে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এতদিন ধরে অদ্বৈতবাদ বনেজঙ্গলে আর গিরিকন্দরে বন্দী হয়ে ছিল। আমি একে নির্জনতা থেকে বার করে নিয়ে আসব, আর প্রতিদিনের কর্মে ও বাস্তবজীবনে এর মহৎবাণীকে ছড়িয়ে দেব। অদ্বৈত-দুন্দুভি প্রতি গৃহকোণে ধ্বনিত হোক, পথে-প্রান্তরে, পাহাড়পর্বতে অদ্বৈতবাণী বিচ্ছুরিত হোক। এস ভাই, আমাকে সাহায্য কর, কেবল কাজ করে যাও।" (অনূদিত)*

শিষ্য বললেন, "কিন্তু মশায়, ধ্যানসাধনার মধ্য দিয়েই যে আমার

* স্বামীজীর ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি লেখক কর্তৃক অনূদিত।

মন অদ্বৈতানুভূতি উপলব্ধি করতে চায়, কাজ-টাজ বড় একটা করতে মন চায় না।" তার উত্তরে স্বামীজী সিংহগর্জনে বলে উঠলেন :

"কি ? জড়সমাধিতে হতজ্ঞান হয়ে থাকার কি দরকার ?...... ধরে নিলাম, ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হলে তোর মুক্তি হল। কিন্তু তাতে জগতের কি ? সারা দুনিয়ার লোককে মুক্তি এনে দিতে হবে। আমরা মায়ার জগতে দাবানল জ্বালিয়ে দেব। তবেই তুই অনন্ত সত্যসন্ধ হবি। সে সুখের নিবিড় উপলব্ধি, সে আকাশের মতো অসীম অনন্তবোধ—কে তার মাপ করতে পারে ? সে রকম মনের ভাব এলে তোর বাক্য হরে যাবে, নিজের নিজত্ব কোথায় ডুবে যাবে, তখন তুই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নিজেকে দেখবি, প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাবি। এই অনুভূতি এলে, জগতের সবাইকেই ভালবাসতে হবে, সকলের প্রতি অপরূপ প্রেম ও করুণার উদয় হবে। এর নাম যথার্থ বেদান্ত।" (অনূদিত)

এই কথাটাই তিনি আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন :

"কি জানিস, এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য—পরম পুরুষার্থ, তবে মানুষ ত আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না। ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্যই তোদের বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর।"

('স্বামিশিষ্যসংবাদ')

যথার্থ জ্ঞানলাভ হলে তখন মানুষের সমস্ত কর্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়ে দাঁড়ায়, "আত্মজ্ঞানীর চলনবলন সবই জীবের কল্যাণসাধন করে।" এদিক থেকে তিনি বেদান্তকে 'জগদ্ধিতায়' অর্থে প্রয়োগ করে উনিশ শতকের হিউম্যানিজম্‌কেই একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

তা নইলে এরকম বলবেন কেন ?

> "ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই ; পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না কল্লে, তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না।...ধর্মকথা শুনতে হলে আগে এ দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা লেকচার-টেক্‌চারে বিশেষ কোন ফল হবে না।"
>
> ('স্বামিশিষ্যসংবাদ')

আধুনিক ভারতে অন্নদেবতার উজ্জীবন প্রয়োজন, প্রয়োজন মহাশূদ্র-সঙ্ঘের, "যারা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে।" বেদান্তকে তিনি তাই আধুনিক ভারতের মানুষ-গড়ার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ইহকে বিসর্জন দিয়ে পরত্র-মুক্তিসাধনা একপ্রকার তামসিক স্বার্থপরতা; কুটস্থ-তুরীয় অবস্থা ও মূর্চ্ছার মধ্যে তফাৎ কোথায়, যদি বিশ্বসংসারের হিতে মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিতে না পারে ? তাই তিনি বলেছেন, "অন্নাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্রফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শুনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথার কেউ কান দেবে না।" ('স্বামিশিষ্যসংবাদ') এই হচ্ছে আধুনিকতার বাণী, বর্তমান ভারতের জীবনাদর্শ।

আধুনিকতার যে প্রধান উদ্দেশ্য মানবতার মন্ত্রঘোষণা, জ্ঞানবিজ্ঞানময় বিশ্বকে সত্য বলে চিনে নেওয়া, এবং ধর্মকর্ম—সমস্ত কিছুকে মানুষের বাস্তব জীবনের কল্যাণে প্রয়োগ করা—এক কথায় উপযোগবাদক উপদ্রব বলে না মেনে তাকে বাস্তব জীবন ও মনের জীবনের সঙ্গে এক করে দেখার নব-সমন্বয়বাদই বিবেকানন্দের নব-বেদান্তবাদ। আধুনিক তামসিক ভারতে এ এক নতুন তত্ত্ববাদ, যার মূল হচ্ছে প্রচণ্ড রাজসিকতা।

৩.

(শুধু মানুষের শীলসদাচার নয়, ধর্মকর্ম নয়, আধুনিক ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাদেশিকতা—সমস্ত কিছুকে স্বামীজী আস্তিক্য-ধর্ম অর্থাৎ 'পজিটিভ' দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। জনতাকে এতটা ভালোবাসা, নিরন্নের মুখে অন্ন দিয়ে তার দেহটাকে বাঁচানো, শিক্ষা সম্প্রসারিত করে জড় মনকে চেতন করে তোলা, ব্যষ্টির হাত থেকে সমষ্টির উদ্ধার—এই হল বিবেকানন্দের ঐহিক সাধনা। সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী উনিশ শতকের শেষাংশে যে পরিমাণে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন, অনুশীলন করেছেন, অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিদিনের জীবন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন, এবং বার বার যেভাবে তামসিক বৈরাগ্য ত্যাগ করে রাজসিকভাবে জীবনভোগের কথা বলেছেন, তাতে যে-কোন এপিকিউরাস চমকে উঠবেন। স্বামীজীর সেই উক্তি—"এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যেসব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস্—তাদের ভিতর পনের আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক-আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা ('স্বামিশিষ্যসংবাদ')।" এই রজোগুণের অর্থ—বাস্তব মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। মিলের হিতবাদ, কোঁতের ধ্রুববাদ, রেনেসাঁস ও উত্তর-রেনেসাঁসের মানবতাবাদ, আধুনিক ঐতিহাসিক বিকাশ-বিবর্তনবাদ—সবকিছুর সদুত্তর মিলবে এই রজোগুণের প্রাধান্যে। তাই তিনি জাত-পাঁতের ভেদ লুপ্ত করে দিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করতে চেয়েছেন, ব্রাহ্মণ্য-অধ্যুষিত হিন্দু-সমাজে মহাশূদ্রতন্ত্রের অধিরোহণ কল্পনা করেছেন। এদিক থেকে তিনি আধুনিকতার শুধু প্রচারক নন, বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক আধুনিকতাকেই সমগ্র জাতির পরম পুরুষার্থ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর স্বাদেশিক,

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাবিষয়ক অসংখ্য উক্তির মধ্যে এই আধুনিক মনোভাব যে-ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে তাঁকে ভাবী ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি বলে গণ্য করতে হয়। শ্রেণীসংস্কার, সমাজসংস্কার, জাতীয় ভাবের উদ্দীপন, মানুষগড়ার শিক্ষাপ্রচার,—সর্বোপরি নিষ্কাম, নির্মোহ, স্বার্থলেশহীন উদার মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা—আধুনিক যুগে ও জীবনে তাঁর এই দান একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্য। বিশ শতকের গোড়া থেকে পরবর্তী কালে যাঁরা রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চা করেছেন, সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁরা কোন-না-কোন দিক দিয়ে এই বীর সন্ন্যাসীর উক্তি, আদর্শ ও আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর বাণীর দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, প্রেরণা পেয়েছিলেন। বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, তাঁরা স্বামীজীর 'পত্রাবলী', 'স্বামিশিষ্যসংবাদ' এবং 'কলম্বো-আলমোড়া' বক্তৃতাবলী পাঠ করে দেশের কল্যাণে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হতেন।[১] সে যুগে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা বিপ্লবীদের বাড়ী খানাতল্লাসী করতে গিয়ে প্রায়ই তাঁদের কাছে বিবেকানন্দের গ্রন্থ আবিষ্কার করতেন। সেইজন্য স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর সরকারী 'কৃপাদৃষ্টি' পড়েছিল—সে যুগের সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেবেন কিনা তাও ভাবছিলেন।[২] বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন সভ্যতা, নতুন মানবজীবনবাদ পাশ্চাত্যদেশ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে গোটা পৃথিবীকেই প্লাবিত করবে। আগামী দিনের মানবমুক্তির কথা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছেন:

১ B. N. Datta—*Swami Vivekananda—Patriot and Prophet*, P.213

২ ঐ. পৃঃ. ২১৪

"জনসাধারণ-অর্জিত নতুন প্রভাত ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য-জগতে আসতে আরম্ভ করেছে, সোস্যালিজ্‌ম্, এ্যানার্কিজ্‌ম্ নিহিলিজম্—এরকম আরও কত দল এসেছে, এরা নতুন সমাজবিপ্লবের ধ্বজা ধরে আসছে।" (অনূদিত)

তিনি এই জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছেন—"আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমাদের অন্তরে সংগ্রামী স্পৃহা জাগিয়ে তোলা।" এই মূক বেদনাহত জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বলেছেন :

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ, লাখো নিরন্ন মানুষ, যারা প্রাচীন যুগের দেব-ঋষিদের বংশধর, তারা আজ কোথায় নেমে গেছে? তোমরা কি অনুভব কর, কোটী কোটী মানুষ আজও উপোস করে মরে, যুগ যুগ ধরে তারা উপোস করেই আসছে। ভেবে দেখেছ কি, গোটা দেশেব ওপরেই অশিক্ষা-কুশিক্ষার কালো মেঘ নেমে এসেছে? এতে কি তোমাদের প্রাণমন অশান্ত হয়ে ওঠে না? এতেও কি তোমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে থাকতে পাব? মানুষের এই অধঃপতন তোমাদের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে স্পন্দিত হয় না? এতে তোমরা পাগল হয়ে যাও না? তোমরা এমনই অধঃ-পতনের বশীভূত হয়েছে যে, নামধাম, স্ত্রী-পুত্র-সংসার—এমন কি নিজের দেহটাকে পর্যন্ত ভুলে বসে আছ!" (অনূদিত)

মনুষ্যত্বের এই অপমানই যে সর্ববিধ অকল্যাণের কারণ, সে সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছেন :

"তাদের ছুঁলে পাপ হয়, তাদের সঙ্গে বসলে অপবিত্র হতে হয়, নৈরাশ্যের মধ্যে তাদের জন্ম—সারা জীবন তারা সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই থাকবে। ফলে তারা ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে —যতদূর নামতে পারে। পৃথিবীতে এমন দেশ কোথায়

আছে, যেখানে মানুষ গোরু ছাগলের সঙ্গে থাকে, ঘুমোয়? ···এর জন্য কে দায়ী? আমরাই। উঠে দাঁড়াও, সাহসী হও, সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নাও। অপর পক্ষের দিকে কাদা ছোঁড়ার কোন দরকার নেই। তোমরা নিজের দোষেই কষ্ট পাও। তোমাদের সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ—তোমরা নিজেরাই।" (অনূদিত)

জনসাধারণকে তমোগুণের জড়ত্ব থেকে কি ভাবে রক্ষা করতে হবে? এ সম্বন্ধেও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন :

"তাদের ধর্মের ওপরে হাত না দিয়ে তাদের তুলে ধরতে হবে। ······সাধারণ মানুষই ভারতের একমাত্র আশাভরসা স্থল। ওপরের সমাজের লোকেরা দেহ ও মনের দিক থেকে জাহান্নামে গেছে।······জাতি হিসেবে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছি, সমস্ত দোষত্রুটির এই হচ্ছে একমাত্র কারণ। সেই স্বাতন্ত্র্য আবার দেশবাসীকে ফিরিয়ে দিতে হবে, সাধারণ লোককে তুলে ধরতে হবে। হিন্দু-মুসলমান খ্রীস্টান—সকলেই এই সাধারণ মানুষগুলোকে পায়ের তলায় পিষে মেরেছে। তোমরা দেশের ছোট জাতকে ঘৃণা করে এসেছে, ফলে সারা দুনিয়ার কাছে তোমরা নিজেরাই ঘৃণার পাত্র হয়েছ।" (অনূদিত)

আধুনিক ভারতের মনুষ্যত্বহীন দরিদ্রসমাজের কথা এতটা প্রেম, আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে আর কোন্ দেশনেতা বলেছেন, অনুভব করেছেন, জানি না। মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবজীবনের ওপর যথাযথ মূল্য আরোপ করে, রাষ্ট্র ও সমাজে এক বলিষ্ঠ আশাবাদ, মানবতাবাদ, জনকল্যাণবাদ প্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ নতুন ভারতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরের শতকের সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতারা সেই পথ ধরেই চলেছেন, কিন্তু নিষ্কামভাবে

জনসেবা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন বলে তাঁরা দরিদ্র মানুষের মনে প্রচণ্ড আত্মশক্তি জাগাতে পারেন নি। তাই একচক্ষু হরিণের মতো আমাদের সমাজসংস্কার বা রাষ্ট্রান্দোলন একপেশে হয়ে গেছে। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভোটপত্রের সাহায্য যেখানে যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতা অধিকার করাই একমাত্র রাজনীতি, এবং সেই ভোটভিক্ষু রাজনীতির জন্যই যেখানে সমাজ-আন্দোলনের ক্রিয়াকৌশল অবলম্বিত হয়, সেখানে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূরপরাহত।

তাঁর সবচেয়ে বড় কথা—জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে, তবেই শূদ্রাধমেরা নতুন দ্বিজ-সংস্কার লাভ করবে। অন্ন আর শিক্ষা—একটা দেহকে বাঁচায়, আর-একটা মনকে ক্রিয়াশীল, করে। এই দুয়ের অভাবের নাম তামসিকতা। এই ঘোর তামসিকতা থেকে ভারতকে বাঁচাতে হলে একদল নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, দেশপ্রেমিক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর প্রয়োজন; স্বামীজী সেইজন্যই সারা ভারতে সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গড়তে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, আধুনিক ভারতকে মনুষ্যত্বে দীক্ষিত করতে হলে, পার্থিব জীবন ও ইহমুখী সভ্যতার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। য়ুরোপের কাছ থেকে সেই ধরনের শিক্ষাদীক্ষা নিতে হবে, যাতে তমোগুণকে সত্ত্বগুণ বলে ভুল না হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে কোন এক শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন:

> "আমি কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি বিশেষ মন দিই নি বটে। আমার কাজ অন্যত্র। কিন্তু আমিও এই আন্দোলনকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি, এর আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই আমার আন্তরিক কামনা। নানা জাতের সংমিশ্রণে ভারতে এক-জাতীয়তা গড়ে উঠেছে···। এর দ্বারা ভারতের ঐক্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। যাকে আমরা গণতান্ত্রিক ভাবধারা বলি, এর

উদ্দেশ্য তাই। এখন শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, এর পর বাধ্যতামূলক শিক্ষা সকলের মধ্যে প্রসারিত হবে। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে, তাকে যথাযথ ব্যবহার করতে হবে; ভারতের অন্তরে প্রচুর শক্তি নিহিত আছে, আর তাকেই জাগাতে হবে।" (অনূদিত)

এখানে লক্ষণীয়, রাজনীতি, শিক্ষা, গণতন্ত্র—এসবের মূল লক্ষ্য যে, ভারতের ঐক্যসাধন, জনসাধারণের কল্যাণ, সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়। ভারতকে কি আবার সেই বৈদিক যুগে, কি বৌদ্ধযুগে ফিরে যেতে হবে? না, সেকালের ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করে জন্মগত জাতির বেড়া তৈরি করতে হবে? এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"এখন তা হলে কি করণীয়? আমাদের যা নেই, পূর্বপুরুষদেরও যা ছিল না, যবনদের যা প্রচুর পরিমাণে আছে, তাই আমাদের চাই। তা হচ্ছে স্পন্দমান জীবনপ্রবাহ, যা য়ুরোপের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ঘন ঘন বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা জগৎকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করে তুলছে। আমরা সেই শক্তি চাই, স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ চাই, আত্মবিশ্বাস চাই, চাই অটল সাহস, চাই কর্মে নিপুণতা, চাই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত ঐক্যবোধ, আর চাই নব নব উন্নতির জন্য আকণ্ঠ পিপাসা। অতীতের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে নির্ভর করে থাকার ইচ্ছেকে মাঝে মাঝে পরখ করে বাজিয়ে দেখতে হবে। আমরা চাই সেই বিশাল আত্মদৃষ্টি, যা আমাদের সামনের দিকে অগ্রবর্তী করবে অপরিমেয়ভাবে। আমরা চাই কর্মোদ্যোগী রজোগুণের তীব্রতা, এই রজোগুণ যেন আমাদের শিরায় শিরায় আপাদমস্তক সঞ্চরণ করে।" (অনূদিত)

এই হচ্ছে নব ভারতের প্রবুদ্ধ বাণী। উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক, দেশসেবক—সকলেই এইভাবে চিন্তা

করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত যুগচিন্তা, আধুনিক ভারতের 'চরৈবেতি' বাণী, বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয় স্বামীজীর ধ্যান ও কর্মে অধিকতর প্রচণ্ড-বেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাজ-আন্দোলন, শ্রেণীভেদের প্রতি বৈমুখ্য, সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রতি বিদ্রূপ, দরিদ্র মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, মানুষগড়া শিক্ষারীতির প্রচলন, আর জীবকে শিববোধে বিশ্বহিতে আত্মসমর্পণ—স্বামীজীর জীবনের এই হল ধ্রুব আদর্শ—ভাবী ভারতের পথ-নির্দেশ। আধুনিক ভারতের প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁর মতামত ও বক্তব্যকে এইভাবে কয়েকটি সূত্রে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে :

১. বেদান্ত অনুশীলনের দ্বারা ক্ষুদ্রত্ব বর্জন, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা, নিষ্কামভাবে বিশ্বহিতে প্রাণ সমর্পণ।

২. য়ুরোপীয় জীবনবাদী আদর্শকে বর্জন না করে ঐতিহাসিক, স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনমার্গ বলে গ্রহণ—শূন্য জঠরে তত্ত্বচিন্তার চেয়ে পূর্ণ জঠরে জীবনভোগ অনেক বেশি কার্যকর।

৩. ব্রাহ্মণশাসিত ও অভিজাত-নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার স্থানে সর্ব-মানবের, বিশেষতঃ শূদ্র-পারিয়ার কল্যাণ সাধন ও প্রাধান্য বিস্তার।

৪. তমোগুণের বদলে রজোগুণের দ্বারা কর্মোত্তম সৃষ্টি।

৫. শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজসংস্কারকে ভারতের সমষ্টির কল্যাণে নিয়োগ।

৬. রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মান্দোলন প্রভৃতির মূল কথা—মানবতা। মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, মনুষ্যত্ব সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

আজকের দিনে স্বামীজীর আদর্শ ভারতবর্ষের যথার্থ জীবনাদর্শ বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, পাশ্চাত্য জাতির বলিষ্ঠ জীবনবাদকে গ্রহণ করা অপরাধ নয়। তা বলে তিনি 'হেডোনিস্ট্' ছিলেন না; ঐহিক সুখসাধনই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য তা তিনি বলেন নি। পরহিতে আত্মদান তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেশ। ঐহিকতা বর্জন করে কোন জাতি কখনও বেঁচে থাকতে

পারে না, এই হচ্ছে তাঁর উক্তির তাৎপর্য। ঐহিকতার অর্থ—মানবতা, ঐহিক সুখের অর্থ বার্হস্পত্য বীজমন্ত্র নয়। স্বামীজীর জীবন ও সাধনা মানবিক কল্যাণময় ঐহিকতার অনুকূল—এবং উনিশ শতকের ভারতবর্ষ সে আদর্শ কথঞ্চিৎ স্বীকার করেছিল। অধুনাতন ভারতভূমি কোন্ মন্ত্র জপ করছে জানি না; কিন্তু তা যদি স্বামীজী-নির্দিষ্ট জীবন-সাধনা না হয়, তা হলে এ জাতিকে বিনষ্টির হাত থেকে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও বাঁচাতে পারবেন না। ইদানীন্তন কালের দেশনেতাদের বোল পাল্টালেও ভোল পাল্টায় নি। পাশ্চাত্য জীবনের পরিদূষণ, আর প্রাচ্যদেশের বৈরাগ্য-ত্যাগ-তিতিক্ষা-অহিংসার জয়োচ্চারণ, ধ্বজদণ্ডে 'সত্যমেব জয়তে' লিখে নিষ্কামভাবে অনাচার করা—আজকের ভারতের কর্মকৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না, নিকৃষ্ট কর্মেরও সুরাহা হয় না। এই স্বার্থপর, নির্বীর্য, পরস্পর-বিবদমান, সংশয়াকুল, ভীরু ভারতবাসীর স্থলে স্বামীজী যে ভারতকে জাগাতে চেয়েছিলেন, তা হচ্ছে যথার্থ বীর ভারত, বাস্তব ভারত, সুস্থ, স্বস্থ ও স্বাভাবিক ভারত। তাঁর ভারতবর্ষ শূন্য বৈরাগ্যের ঝুলি খুঁজে চিন্তামণি আবিষ্কারের চেষ্টা করে না। দেহকে স্বীকার করে, বস্তুপ্রত্যয়কে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে জীবসেবার ব্রত নিয়ে ধূলায় নেমে এসে বর্তমান ভারতের যে আদর্শ স্বামীজী দেখিয়েছেন—আসন্ন মহামারীর মধ্যে সেই পথই একমাত্র জীবনের পথ, শ্রেয়োপথ। সেই শক্তি, ত্যাগ, ভোগ, বৈরাগ্য ও হিতবাদী মনুষ্যত্বের পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা ক্লীবতা আশ্রয় করেছি, বিনাশের সাধনা করে চলেছি, তাই আজ বায়ুকোণে প্রলয়ের দেবতা জেগে উঠেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলা যায়:

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ। (১৩৬৯)

বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিশ্বে প্রাচীন ভারতের বেদান্ততত্ত্বকে সর্বমানবের গ্রহণযোগ্য জীবনধর্ম বলে সুপ্রচারিত করেছেন, বনের বেদান্তকে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন, ভোগকে ত্যাগের দ্বারা সংযত করেছেন, বহু ও এক, বিরোধ ও অবিরোধ, দ্বৈত ও অদ্বৈত, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ, জ্ঞান ও ভক্তি, মোক্ষ ও লীলারস প্রভৃতিকে একসূত্রে গ্রন্থন করে তিনি মননের জগতে একটি পরম আশাপ্রদ আস্তিক্যবাদী বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে গিয়ে বেদান্তকে বিশ্বধর্মরূপে প্রচার করেন, তারপর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করে যুব-সমাজকে বেদান্তানুযায়ী ধর্মাদর্শ ও কর্মপন্থা গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজের জীবনেও বেদান্তকে সংশয়াতীত সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই সমস্ত বক্তৃতা ও আলাপ-আলোচনা থেকে বেদান্ত সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বেদান্তের প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রমতে উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তসূত্র—এই প্রস্থানত্রয় মানব জীবনের একমাত্র পথ, যা অবলম্বনে মানুষ 'অভীঃ' হতে পারে, দেশ-কাল-নিমিত্তাতীত অখণ্ড সত্তার সঙ্গে অদ্বয়যোগ লাভ করতে পারে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করে পিতার কাছে ফিরে এলে পিতা দেখলেন পুত্রের পূর্ণ শিক্ষালাভে কতকগুলি অন্তরায় রয়ে গেছে। তাই তিনি নানা উপদেশ দিয়ে পুত্রকে বললেন, "তৎ সত্যং আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই।

অর্থাৎ তুমিই সেই নিষ্কল ব্রহ্ম। পুরাণে আছে ব্রহ্মবাদিনী মদালসা তাঁর শিশুপুত্রকে দোলায় ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলতেন, "ত্বমসি নিরঞ্জনঃ"—তুমি সেই নিরঞ্জন ব্রহ্ম। এই হচ্ছে যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব, যা ভারতবর্ষ চিন্ময় চিন্তামণিরূপে আজও হৃদয়ে ধারণ করে আছে। স্বামী বিবেকানন্দ মৃত ভারতকে সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগাতে চেয়েছেন।

মুণ্ডক উপনিষদ প্রশ্ন করেছেন, "কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।"—কী সেই বস্তু যাকে জানলে সব জানা হয়? ভারতের বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ, বেদান্তসূত্র ও গীতা সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আধুনিক ভারতের আর এক ব্রহ্মবাদী অথচ রাজসিক স্বভাবের বীর্যবান পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ সেই পরম 'অভীঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন; মানুষকে ভালবেসে, জীবসেবাকে আত্মধর্ম বলে গ্রহণ করে স্বামীজী বেদান্তকে জীবন্ত সত্যরূপে সর্বাত্মক স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বেদ যেন দুইপক্ষবিশিষ্ট অনন্ত আকাশচারী মহাগরুড়। একটি ডানা কর্মকাণ্ড ও যাগযজ্ঞসঙ্কুল; আর একটি ডানা জ্ঞানকাণ্ড সাধনার উচ্চতম উপলব্ধি, উপনিষদ। বেদের এই অন্তভাগ বেদান্ত নামে পরিচিত হয়েছে। উপনিষদের সংখ্যা প্রচুর, সবগুলির প্রামাণিকতাও সংশয়াতীত নয়; বহু চিন্তাবীর ও মুনিঋষি নিজ নিজ ধ্যানলব্ধ সত্যকে উপনিষদ বলে প্রচার করেছিলেন। আনুমানিক খ্রীস্টীয় চতুর্থ অব্দে বাদরায়ণ ব্যাসসূত্র 'বেদান্ত সূত্র' নামে ৫৫৫টি সূত্রে সঙ্কলিত হয়। তারপর খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্ত সূত্রের মায়াবাদী অদ্বৈতভাষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় মনন ও সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে এই শাস্ত্র গৃহীত হয়ে আসছে। শঙ্করাচার্য তাঁর 'শারীরক ভাষ্যে' জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব ও অদ্বয়ত্ব স্থাপন করেছেন। জগতের ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোন পারমার্থিক

সত্তা নেই, মায়ার বশে জীব ও জগতের ওপর যে স্বাতন্ত্র্য আরোপিত হয়, তা অধ্যাস মাত্র। বস্তুতঃ জগৎই ব্রহ্ম—"জগৎ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" জীবনমুক্তি সম্বন্ধে বেদান্ত বলছেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান, ব্রহ্মকথা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ও নিষ্ঠার দ্বারা যখন জীবের মায়া ছিন্ন হবে, তখন এই জীব-শরীরেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটবে—একেই বলে নির্বিকল্প সমাধি বা জীবনমুক্তি। অবশ্য সমাধি ভঙ্গের পর ব্যুত্থান হবে, যখন জীব আবার দ্বৈত ও বিকল্পাত্মক জগতে ফিরে আসবে। কিন্তু জীব ব্রহ্মোপলব্ধির পর এ জগতে ফিরে এলেও মায়া আর তাকে বাঁধতে পারবে না, সমস্ত দ্বৈতানুভূতির পরপারে গিয়ে সে আত্মারাম হবে। বিদেহমুক্তি বা মোক্ষ হল জন্মজরামরণচক্রের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, যখন জীব আর দ্বৈত জীবনপ্রবাহে ফিরে আসবে না, ঘটের জল সমুদ্রে মিশে লবণাম্বুতলে আত্মহারা হয়ে যাবে।

বেদান্ত সূত্রের বিবর্তবাদী অভেদাত্মক অদ্বয় মতকে দ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ মেনে নিতে পারেন নি। রামানুজের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদে ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকৃত হয়েছে। জীব ও ব্রহ্ম অদ্বৈত নয়, জীবও ঈশ্বর-করুণা লাভ করতে পারে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারা এবং ঈশ্বরকৃপায় তার কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়। তাঁর মতে মায়াধীশ ব্রহ্ম আর মায়াবশ জীব অভেদ হবে কেমন করে?

আজ প্রায় দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে বেদান্ততত্ত্বের দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা ও টীকাভাষ্য নিয়ে নানা প্রস্থানভেদ, স্তরভেদ চলে আসছে। এখন দেখা যাক স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তকে কোন্ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, এবং আধুনিক যুগে বেদান্তানুশীলনে স্বামীজীর ভূমিকাই বা কি।

একথা স্বীকার্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, কর্ম, সাধনা—সমস্ত কিছুর মূল কথা বেদান্ত এবং বেদান্তের অদ্বৈতবাদী শাঙ্করভাষ্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তিনি অদ্বৈত ভূমানান্দ ও জীবনমুক্ত সমাধি

লাভ করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা মায়াযবনিকা ছিন্ন করে সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদ্বয়-সম্পর্ক সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ভারতের নানা স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতায় তাঁর জীবন-সাধনার সঙ্গে বেদান্তের নিগূঢ় সম্পর্ক খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি পশ্চিমের সামনে তাদের আসন্ন বিনাশের পট খুলে ধরেছিলেন, ভোগকে ত্যাগের দ্বারা সংযত করতে বলেছিলেন, মনুষ্যত্বহীন বর্তমান ভারতবাসীকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন—এর কারণ, অদ্বৈত বেদান্তের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আনুগত্য। তিনি বুঝেছিলেন, সমুদ্র-জলের লবণস্বাদের মতো ব্রহ্ম যখন সর্বত্র রয়েছেন, ইতরভদ্র সবই যখন ব্রহ্মময়, আব্রহ্মস্তম্বে যদি একই প্রাণধারা বহমান হয়, তখন তোমার সঙ্গে আমার তো ভেদ নেই, আমি যদি আমাকে ভালবাসি, বিশ্বের প্রতিও তো সেই মৈত্রীযোগ সঞ্চারিত হবে। সুতরাং ব্রহ্মবোধে জীবসেবা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা কর, অন্নহীনকে অন্নদান কর, শিক্ষাহীনকে চক্ষুষ্মান কর, আতুরের ব্যথা দূর কর।

পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দের বেদান্ত বক্তৃতা শুনবার জন্য বস্তুবিজ্ঞানীরাও গবেষণাগার ছেড়ে চলে আসতেন, অধীর আগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর আলোচনা শুনতেন। ওদেশের বিজ্ঞানসাধকেরাও বেদান্তের মধ্যে বিজ্ঞানের সমর্থন পেয়েছেন।

স্বামীজী দ্বৈত ভেদবাদ ও অদ্বৈত অভেদবাদ, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি, মোক্ষ ও লীলারস—সমস্ত পার্থক্যকেই একের মধ্যে ধারণ করেছেন। কারণ তিনি এক জীবন্ত বেদান্তবিগ্রহকে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন—ইনি শ্রীরাম-কৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন বেদান্তের দ্বৈত ও অদ্বৈতরূপের, জ্ঞান ও ভক্তির সার্থক সমন্বয়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ও আদেশ লাভ করে বেদান্তের মতবৈষম্যকে সমন্বয়ের মধ্যে নিয়ে গেছেন। তাই তিনি শঙ্করাচার্যের জ্ঞানবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েও

নির্মমতার অভিযোগে আচার্যদেবের প্রতি একটু অনুযোগ করেছেন। আবার বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও গোপীপ্রেমকেও সাধনার এক অনির্বচনীয় তুরীয় উপলব্ধি বলে শ্রদ্ধা করেছেন। কিন্তু বর্তমান ভারতের দুর্দশা দেখে তিনি দ্বৈতবাদের স্থলে অদ্বৈতবাদের মন্ত্রে দুর্বলকে বল দিতে চেয়েছেন, মেরুদণ্ডহীন ভারতের অন্তরে ব্রহ্মতত্ত্ব সঞ্চারের জন্য ভক্তির আতিশয্যকে ক্ষণকাল বন্ধ রাখতে বলেছেন। আসলে তিনি মায়ামমতাহীন মোক্ষসাধক মাত্র ছিলেন না। বেদান্তকে তিনি দৈনন্দিন জীবন, ব্যবহারিক প্রয়োজন জাতিগঠন, চরিত্র বিকাশ—এ সমস্ত বাস্তব ব্যাপারে নিয়োগ করতে চেয়েছেন। শঙ্করাচার্য বেদান্তকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে ভারতীয় মনীষার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, রামানুজ বেদান্তকে ভক্তির বিল্বদলে অভিষিক্ত করেছেন, আর স্বামী বিবেকানন্দ কর্মময় বাস্তব জীবনে, প্রাতিভাসিক ও অধ্যাসের জগতে সেই বেদান্তকেই একমাত্র মানবধর্ম ও বিশ্বধর্ম বলে প্রচার করেছেন। এজন্য অনাগত কালের কর্মী, প্রেমিক ও সাধক তাঁকে অজস্র সাধুবাদ দেবেন। দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে যাঁরা আসবেন, তাঁরাও তাঁকে পূর্বাচার্য বলে প্রণাম নিবেদন করবেন। (১৩৬৯)

১.

মানুষের ব্যক্তিত্ব হল কমলহীরের মতো। কমলহীরে থেকে আলোক-সম্পাত হলে যেমন বিচিত্র বর্ণবিভা বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি বিশেষ ব্যক্তির চিন্তভাবনা, আদর্শ ও জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যক্তিগত অনুভূতি সত্তার চারদিকে প্রজ্ঞার আলোককণিকা বিকীর্ণ করে। সে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা ভগিনী নিবেদিতার কথা স্মরণ করি। এই বিদেশিনী কী ভাবে নিজের কুলগত সংস্কারকে জীর্ণ নির্মোকের মতো পরিত্যাগ করে, জন্মান্তরীণ পুণ্যফলের মতো একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির—এমন কি, বিপরীত জীবনতত্ত্বকে নিজে শিরোধার্য করলেন, সম্মুখচারিণী হয়ে পিছনের সেতুটি পর্যন্ত নিজের হাতে বিনাশ করে এলেন, সে কাহিনী মহাকাব্যের মতো বিশাল, গীতিকবিতার মতো মধুর, উপন্যাসের মতো অভিজ্ঞতাময়, নাটকের মতো ঘটনার চমৎকারিত্বে বিচিত্র।

নিবেদিতার প্রতিভা সহস্রমুখী, চরিত্র গহনগভীর, প্রত্যয় নিশিত তরবারি। কর্মে তিনি অনলস, চিন্তায় তিনি প্রাচীন-নবীনের সমন্বয়, নিষ্ঠায় তিনি বাকস্তম্ভিনী,—ত্যাগ ও তিতিক্ষায়, ধৈর্য ও বীর্যে তাঁর মতো নারীচরিত্র গত দু'চার শতকের বিশ্বের ইতিহাসে চোখে পড়ে না। বিদেশিনী এই নারী জাতিস্মর হয়েই যেন স্বামীজীর ছায়াতলে এসেছিলেন। বিবেকানন্দের দীপ্ত দীপশলাকা তাঁর অন্তর-প্রদীপটিকে অনির্বাণ শিখায় জ্বালিয়ে দিয়েছিল। জন্মের পূর্বেই তাঁর জননী তাঁকে দেবতার চরণে নিবেদন করে দিয়েছিলেন। কুমারী মার্গারেট নোব্‌ল নিজেকে ভারতের চরণে নিবেদন করে দিয়ে

দ্বিজত্ব লাভ করলেন। পৃথিবীর সংস্কৃতি ও ধর্মের ইতিহাসে এ ঘটনা অভিনব।

নিবেদিতার প্রতিভা ও চরিত্র বিচিত্র বলে সমসাময়িক অনেকে তাঁকে নানাভাবে দর্শন করেছেন। কেউ ছিলেন তাঁর বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ, কেউ গুরুজনের মতো শ্রদ্ধার্হ, কেউ বালকের মতো স্নেহের পাত্র—ভর্ৎসনার পাত্রও বটে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেরই নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রত্যেককেই তিনি ভারতপ্রেমের দীপ্তি ও দাহ দান করেছিলেন। ভারতের যুগযুগান্তব্যাপী ঐতিহ্য ও ধর্মসাধনাকে শ্রদ্ধা করে, জীবনের কেন্দ্রস্থলে হিন্দুধর্মকে স্থাপন করে ভারতকে পুনরায় প্রাচীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম, তিল তিল করে জীবনের সব কিছু সমর্পণের কাহিনী আজকের দেশবাসীর কাছে অপরিচিত নয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে "নিবেদিতা" শীর্ষক একটি উপাদেয় প্রবন্ধে এই মহীয়সী মহিলার জীবন ও সাধনার স্বরূপ নানা দিক থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে এই প্রবন্ধটি তাঁর 'পরিচয়ে' সঙ্কলিত হয়েছিল। এর দু'মাস পূর্বে আশ্বিন মাসে দার্জিলিঙের শীতার্ত প্রভাতে মর্ত্যতনু ত্যাগ করে নিবেদিতার অমৃত-আত্মা দিব্যধামে যাত্রা করে। রবীন্দ্রনাথ এ সংবাদে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন তা এই প্রবন্ধ থেকেই বোঝা যাবে। রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর—এঁদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের ভক্তিপুষ্পগুলিকে শিল্পচন্দনের রসে গন্ধবাসিত করে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতি ও সংস্কৃতিগতভাবে কতটা মুগ্ধ করেছিলেন, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিতে অপূর্ব ভঙ্গীতে দিয়েছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, নিবেদিতার চরিত্র সে যুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কতটা প্রভাবিত ও চমৎকৃত করেছিল, তাঁদের

উক্তি থেকেই তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে।

স্বামীজী নিবেদিতার সম্বন্ধে সকলের কাছে বলতেন, "নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশ, কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র।······নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।"* বাস্তবিক নিবেদিতা দীনদরিদ্র ভারতবাসীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেই এসেছিলেন, দারুণ কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর ধ্বজদণ্ড শিরে বহন করে তিনি ভারত-বাসীর মনুষ্যত্ব জাগাতে চেয়েছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করতে পারব না। দেশ উপযুক্ত হলে তাঁর কদর বুঝবে।" শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতাকে অনুপমা করে তুলেছেন কয়েকটি রূপব্যঞ্জনার বর্ণসম্পাতে। নিবেদিতার তাপসী মূর্তিকে অবনীন্দ্রনাথ এই ভাবে চিত্রিত করেছেন: "গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগ্‌রা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।" "চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া" মূর্তিমতী মহাশ্বেতার সঙ্গেই যিনি তুলনীয়া, "তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনের বল পাওয়া যেত।······নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল, কি করে বোঝাই যে কেমন চেহারা, দুটি যে দেখিনি আর, উপমা দেব কি?" এই নিরুপম সৌন্দর্য, যিনি "সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ", তাঁর সেই অপার্থিব লাবণ্য ও অনমনীয় বীর্য ভারতীয় মনীষীদের যে কত দিক থেকে আকৃষ্ট করেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে সমসাময়িক ইতিহাসের মধ্যে। যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হত না, তাঁরাও তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা

* এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত কোন কোন তথ্য ও উদ্ধৃতি প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'ভগিনী নিবেদিতা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

করতেন। ব্রাহ্মসমাজের বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। বিপিনচন্দ্র নিবেদিতার হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও আসক্তিকে তেমন পছন্দ করতেন না। ফলে দু'জনের বাক্যালাপে প্রায়শই স্ফুলিঙ্গের বর্ষণ হত। কিন্তু দু'জনের মত ও আদর্শ ভিন্ন হলেও বিপিনচন্দ্র এই মহীয়সী রমণীকে শ্রদ্ধাদানে কৃপণতা করেন নি। তিনি বলেছেন, "নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালোবাসিতেন, ভারতবাসীও ততটা ভালোবাসিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।" দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *History of Bengali Language and Literature*-এর পাণ্ডুলিপি নিবেদিতাকে দিয়ে দেখিয়ে এবং সংশোধন করিয়ে নিতে প্রায়ই বোসপাড়া লেনের নিবেদিতার বাসায় আসতেন। নিবেদিতা প্রতিদিন সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দীনেশচন্দ্রের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর কর্মৈষণার মধ্যে গীতার নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত বিগ্রহকে দেখতে পেয়েছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "এরূপ নিঃস্বার্থ, আত্মপরভাব-বিরহিত, প্রতিদান সম্পর্কে শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী—কার্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম-কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম।" বিনয় সরকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তির্যক ভাষায় বলেছিলেন, "নিবেদিতা তুখোড় মেয়ে, মগজটা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাবনিষ্ঠা, রোমান্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার ছিল ভরপুর। সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মারফৎ ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়ে।" সে যুগের অগ্নিহোত্রী বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদের সকলেই তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, তারকনাথ দত্ত প্রভৃতি বিপ্লবীরা তাঁর কাছ থেকেই নবজীবনের দীক্ষা লাভ করেছিলেন। এমন কি, তৎকালীন গুপ্ত আন্দোলন ও রক্তক্ষরা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, এমন কথাও বিপ্লবের ইতিহাসকারেরা মনে করেন। আবার অপর দিকে শিল্পী নন্দলাল বলেছেন, ভারতশিল্পের যথার্থ মূল্যাবধারণা সম্বন্ধে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন নিবেদিতা। নিবেদিতার বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সে যুগের ভারতের জ্ঞানী, কর্মী, দেশসেবক, সমাজসেবী, বিপ্লবী, শিল্পীকে নব নব জীবনপ্রত্যয় দিয়েছিল। কমলহীরে থেকে বিচ্ছুরিত আলোক-কণিকা কত দিকে ছড়িয়ে পড়ে তা কে বলতে পারে?

২.

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নিবেদিতার স্বরূপ আলোচনা করব। তাঁর 'নিবেদিতা' প্রবন্ধটি নিবেদিতার দেহত্যাগের অল্প পরেই রচিত হয়েছিল। নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক ছিল, ঠাকুরবাড়ীতে নিবেদিতার যাতায়াতও ছিল। একদা রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে নিজ সন্তানের শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার শিক্ষাসম্পর্কে আলাপাদি হয়। কবিগুরু এই প্রসঙ্গে তারই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নিবেদিতার চারিত্র-পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়েছেন। যখন তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন, তখন নিবেদিতার সদ্য তিরোধানে তাঁর মন শোকাচ্ছন্ন। তবু তিনি শোকের মেঘাপসারণ করে নিবেদিতার উর্জস্বল স্বরূপকে দিব্যবিভায় তুলে ধরেছেন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় মিতবাক। "রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমসাময়িক হইলেও উভয়েই পরস্পর সম্বন্ধে আশ্চর্য-ভাবে উদাসীন। একের সমসাময়িক রচনার মধ্যে অন্যের উল্লেখ নাই।......বিবেকানন্দের ধর্মবিজয় সমসাময়িক ভারতের চিত্তকে

এমন আশ্চর্যভাবে মথিত করিয়াছিল, অথচ রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনায় কোথাও তাহার পরিচয় পাই না" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী', ২য় খণ্ড)। অবশ্য বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে একেবারে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন তা নয়। স্বামীজীর তিরোধানের ছ'বৎসর পরে তিনি একটি প্রবন্ধে ('পূর্ব ও পশ্চিম'—১৩১৫ সনের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত) বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন :

"অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝ-খানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার লইবার পথ রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" *

('সমাজ')

এখানে পরিমিত ভাষায় তিনি বিবেকানন্দের প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা

* আর এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্ত প্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরাজ বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র।" ('স্বদেশ'—"সমাজভেদ")
এখানে এ মন্তব্যের তাৎপর্য, রাষ্ট্রতন্ত্রে-উদ্বুদ্ধ ইংরেজ জাতি বিবেকানন্দ ও ধর্মপাল প্রচারিত ধর্মসাধনার প্রতি উদাসীন, কারণ ধর্ম তাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ নয়।

স্থাপন করেছেন। কিন্তু তা হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিবেকানন্দের জীবনসাধনা, বিশেষতঃ ধর্মবিশ্বাস ও কৃত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না, যদিও স্বামীজীর নরসেবাব্রত, শিক্ষা-প্রচার, সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা ও আধুনিক মনোভাব সঞ্চারের প্রয়াসকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন বলে মনে হয়। নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচার বিশেষ কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি তাই স্বামীজীর শিষ্যা নিবেদিতাকে সাধারণ খ্রীস্টান মিসনারি মহিলাদের ভগিনীস্থানীয় মনে করেছিলেন :

> "আমি ভাবিয়াছিলাম, সাধারণতঃ ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন, ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।" ('ভগিনী নিবেদিতা')

অর্থাৎ নিবেদিতার ধর্মবিশ্বাস অনেকটা খ্রীস্টান মিসনারিদের মতো সঙ্কীর্ণ, পরমত-অসহিষ্ণু, অযৌক্তিক এবং রক্ষণশীল। তবে তিনি খ্রীস্টানী আদর্শ গ্রহণ করেন নি, বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুর স্মার্ত, আচারী ধর্মাদর্শ ও সনাতনী ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই, প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের মন নিবেদিতার প্রতি পুরোপুরি প্রসন্ন হতে পারে নি। ভেবেছিলেন, তৎকালীন হিন্দুসম্প্রদায়ের হাস্যকর 'আর্যামি'র মতো এঁর ধর্মাদর্শও একপ্রকার উগ্র অহং-বোধের নামান্তর। তাই তাঁকে শুধু তাঁর সন্তানদের শিক্ষয়িত্রীরূপে কল্পনা করে তাঁর কাছে সেই প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সামান্য আলাপেই তিনি ভগিনীর মধ্যে অসামান্যা নারীকে প্রত্যক্ষ করলেন, যাঁকে সাধারণ ধর্মপ্রচারিকার পংক্তিতে স্থাপন করতে তিনি স্বতই কুণ্ঠা বোধ করেছেন। নিবেদিতা বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী হয়ে এদেশে আসেন নি, তিনি "বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে" আত্মনিবেদন করেছিলেন, "সেখানে তিনি পাড়ার

মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে ; শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন।" বস্তুতঃ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও সমগ্র জাতির জীবনে শিক্ষা জাগিয়ে তুলবার স্বপ্ন দেখছিলেন। এই অংশে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মানসিক ঐক্য স্থাপিত হল। নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে বললেন, "বাহির হইতে কোনো একটি শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিষটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি।" এ আদর্শ রবীন্দ্রনাথেরও মনোগত আদর্শ, যা তিনি উত্তরকালে শান্তিনিকেতনে মূর্ত করতে চেয়েছেন। তবে এই যে 'জাতিগত নৈপুণ্য' ও 'ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতা' –শিক্ষার এ আদর্শ মূলতঃ বিবেকানন্দেরই শিক্ষাদর্শ। নিবেদিতা গুরুর কাছ থেকে, শিক্ষার মূল আদর্শ যে "জাতিগত নৈপুণ্যের" পটভূমিকায় ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ্য স্ফুরণ, তাই লাভ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে নিবেদিতার শিক্ষাদর্শের প্রয়োগগত কিছু পার্থক্য আছে। নিবেদিতা মূলতঃ ভারতীয় হিন্দুর প্রচলিত সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে, মেয়েদের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে স্বীকৃতি দিয়ে যে শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা করেছিলেন, তাতে হিন্দুর নানা ধরনের ঘরোয়া সংস্কারের চালাও ব্যবস্থা ছিল। তাঁর স্কুলে খুব ঘটা করে সরস্বতী পূজো হত, তিনি তাতে বালিকার মতো উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়ে যোগদান করতেন, স্থানীয় মেয়েদের কথকতা ও চণ্ডীপাঠের আসরে আহ্বান করতেন, মুখে মুখে তাদের পৌরাণিক গল্প শোনাতেন, গীতাপাঠের আসরে তিনি সাগ্রহে যোগ দিতেন, মেয়েদেরও যোগ দিতে বলতেন। তাঁর বিদ্যায়তনে কুমারী, সধবা, বিধবা—সবরকম ছাত্রীই ছিল। লোকে বলত 'সিস্টার নিবেদিতার স্কুল'। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বোসপাড়া লেনের স্কুলটি রামকৃষ্ণ গার্লস স্কুল নামে অভিহিত হবে। য়ুরোপীয়েরা বলতেন 'বিবেকানন্দ স্কুল'। কিন্তু নিবেদিতার লোকান্তরের পর এই

স্কুলটি রামকৃষ্ণ মিসনের অন্তর্ভুক্ত হলে এর নাম রাখা হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিসন সিস্টার নিবেদিতা গার্ল্‌স স্কুল'।

নিবেদিতা কন্যা, মাতা, বধূদের জীবনে সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে, প্রাচীন ও নবীন ঐতিহ্যকে সমন্বিত করে যে শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিলেন, তার প্রয়োগবিধি ও খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না; কিন্তু নিবেদিতা যে সাধারণ স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়ে ভারতীয় নারীর স্বাভাবিক শিক্ষাসংস্কারকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তাদের মনের প্রবণতা অনুসারে শিক্ষা-বিধিকে কেটেছেটে নিতে প্রস্তুত হয়েছেন, এজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুরূহ সাধু প্রচেষ্টাকে বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

নিবেদিতা "একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।" রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার এই আশ্চর্য, অপরিমেয়, নিত্যশুদ্ধ আত্মনিবেদনকে ভক্তের দৃষ্টিতে আরতি করেছেন। ১৮৯৯ সালে ২৫শে মার্চ নিবেদিতাকে দিয়ে স্বামীজী শিবপূজো করিয়ে নিলেন, তারপর তাঁকে ব্রহ্মচারিণীব ব্রতে দীক্ষা দিলেন, তাঁকে ভগবানের চরণে নিবেদন করে দিয়ে কুমারী মার্গারেট নোবলের নতুন নামকরণ করলেন—নিবেদিতা। এই দিন নিবেদিতার নব জন্মলাভ হল। সেই পবিত্র প্রভাতের কথা স্মরণ করে নিবেদিতা লিখেছেন, "সেই প্রভাতটি জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত।" সেইদিন থেকে তিনি শুধু ঈশ্বরের কাছে নয়, সমগ্র ভারতের কাছে নিবেদিত হলেন। তার জন্য তাঁকে ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসিনীর মতো সুকঠোর ব্রতকৃত্য পালন করতে হয়েছে। কিন্তু আসলে তিনি সমস্ত ভারতের কল্যাণ, মুক্তি, উৎকর্ষ ও গৌরবকে জাতির জীবনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবার বাসনায় সমস্ত জীবন সমর্পণ করেছিলেন। অভ্যস্ত জীবন ও স্বদেশীয় আচার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে দরিদ্র ভারতের সেবায় তাঁর সুমহৎ

আত্মনিয়োগকেই আত্মনিবেদন বলে। কলকাতায় প্লেগের সময়ে তাঁর বরাভয়প্রদায়িনী মূর্তি জঘন্য বস্তির নীরন্ধ্র অন্ধকারকে আলোকিত করে তুলেছিল। এ দেশকে কতটা ভালোবাসা যায়, নিজেকে কতটা নিঃশেষে ও নিষ্কামভাবে দান করা যায়, তিনি যেন তারই পরীক্ষা করেছেন। এই আত্মনিবেদন, যাকে প্রকৃত আত্মবিসর্জন বলা যায়, তার মহত্তম কল্যাণের দিকটি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয়ে তিনি কলকণ্ঠে বলেছেন :

> "প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার মনে ছিল, যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছুই না—ভয় নয়, সঙ্কোচ নয়, আরাম নয়, বিশ্রাম নয়।" ('পরিচয়')

এই যে আরামবিরামহীন অনলস কর্মসাধনা, যাকে আমরা 'ফলিত নিষ্কামতত্ত্ব' নাম দিতে পারি, তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের জনসাধারণ। এদের সেবা করা, যত্ন করা, চক্ষুষ্মান করা, এই ছিল নিবেদিতার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। শুধু যদি অধ্যাত্মমুখী ও ব্যক্তিগত ধর্মসাধনা তাঁর উদ্দেশ্য হত, তা হলে তিনি সেভিয়ার দম্পতির মতো শৈলসানু আশ্রয় করে মুক্তিসাধনায় কালক্ষেপ করতেন।* কিন্তু সে পন্থা পরিত্যাগ করে তিনি ভারতের মূক জনসাধারণকে যেন সন্তানের

* অবশ্য সেভিয়ার দম্পতী বৃদ্ধবয়সে নতুন করে কর্মোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলেও শ্রীমতী সেভিয়ার ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার সঙ্গে পাহাড়ী জাতিদের সেবাকর্মের ভারও নিয়েছিলেন।

মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সন্তানের মতোই আদর করতেন। রবীন্দ্রনাথ 'লোকমাতা' নিবেদিতার এই অপূর্ব মমত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন :

"কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপ্‌ল'-কে, এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত, তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের ওপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।" ('পরিচয়')

অথচ এই 'আওয়ার পীপ্‌ল' বলে তিনি যাদের বুকে টেনে নিতেন, তাদের কাছ থেকেই প্রতিকূল ও অসম্মানজনক ব্যবহার পেতেন বেশী। তিনি দীক্ষা নিয়ে ব্রতচারিণী হয়েছিলেন, নিত্যশুদ্ধ জীবন-যাপন করে গেছেন, হিন্দুধর্মের তত্ত্ব ও আচারানুষ্ঠানের কৃত্য প্রকৃত হিন্দুর চেয়েও নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন। কিন্তু খ্রীস্টান জনক-জননী থেকে মর্ত্যদেহ পেয়েছিলেন বলে হিন্দুর সমাজ ও দেবমন্দিরের দ্বার অনেক সময় তাঁর মুখের ওপরেই রুদ্ধ হয়ে যেত। তাঁর স্কুলের কোন কোন ছাত্রী তাঁর স্পৃষ্ট জল পানে সঙ্কুচিত হত, গৃহের দাসীও কর্মাবসানে স্নান করে শুদ্ধ হত। বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো মহাশয় ব্যক্তিও নিবেদিতার দেওয়া মিষ্টান্ন সেবনে ও জলপানে অতিশয় বিব্রত বোধ করতেন। আমাদের এই সমস্ত ছোটখাট আচার-বিচারের গণ্ডীর সীমা নিবেদিতাকে নিশ্চয়ই বিদ্ধ করত, কিন্তু তিনি হাসিমুখেই সে সব অসম্মান সহ্য করেছিলেন। এ জাতিকে তিনি যথার্থই প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। একি শুধু রোমান্টিক অতীতকে ভালোবাসা? সংস্কৃত পুঁথিপুরাণে পড়া কল্পিত

ভারতবর্ষের দিকে কল্পনানয়নে চেয়ে থাকা? এ হল প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ; ধূলামাটি মেখেই তিনি ধূলা থেকে মানুষকে তুলে নিয়েছেন। শুধু মহৎ আইডিয়াকে ভালোবাসলে তিনি কিছুতেই এ জাতির নীচতা ও অসম্পূর্ণতার ত্রুটিকে ভুলাতে পারতেন না। মা তো সন্তানের দোষগুণ বিচার করে না, সন্তান যত অকৃতী, যত অবুঝ, যত দুরন্ত, মায়ের স্নেহ যেন তারই প্রতি তত বেশী উৎসারিত হয়। নিবেদিতা নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা আচার-বিচারের গণ্ডী টেনে তাঁকে বিমুখ করেছি, সব সময়ে প্রসন্ন মনে দুয়ার খুলে অভ্যর্থনা করতে পারি নি।

৩.

নিবেদিতা যে ভারতকে ভালোবাসতেন, সে ভারত প্রতিদিনের ধূলিমলিন ভারতবর্ষ, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে যে ভারত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো নিষ্প্রভ হয়ে ছিল। নিবেদিতা সেই ভস্মাবশেষ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বহ্নির দাহিকা শক্তিকে আবার জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অথচ যাঁদের নিয়ে তাঁর কাজ-কারবার, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর মতের মিল ছিল না। যাদের তিনি ভালোবাসতেন, সেবা করতেন, তারা অনেক সময়ে তার যোগ্য ছিল না। অনেকে তাঁকে নানাভাবে প্রতারণাও করেছে। তবু তিনি এই হতভাগ্য জাতিকে "শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো" ভালো-বাসতেন কি করে? এই তত্ত্বকথাটি রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> "শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে-তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও যে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্ল চিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না ; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন, সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।" ('পরিচয়')

সতী-উমা কদাচারী, ভস্মভূষিত, শ্মশানবাসী শিবের মধ্যে ভাবের রস খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই হেমন্তকুমারী নগ্নক্ষপণকের গলে বরমাল্য দিয়েছিলেন। নিবেদিতাও এ দেশের দীন-দুর্বল জনসাধারণের বাইরের মলিনতা দেখে বিমুখ হন নি, এদের প্রাণপুরুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মানুষগুলিকে সস্নেহে বুকে তুলে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোন প্রতিকূল সমালোচক বা বিদেশী এই জনসাধারণকে কোন কঠোর কথা বললে, ব্যঙ্গ করলে নিবেদিতা রুদ্রাণীর মূর্তিতে আবির্ভূত হতেন। যে রাজশক্তি এদেশের ওপর চণ্ডনীতি চালাচ্ছিল, সে শক্তি তাঁরই স্বদেশ থেকে উত্থিত হয়েছে ; তাই তাদের প্রতি তাঁর মনে শুধু দুর্নিবার ঘৃণা সঞ্চিত হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তিনি সমকালীন বিপ্লবী আন্দোলনকে কতদিক থেকে যে সহায়তা ও প্রভাবিত করেছেন তার কথা সে যুগের

বিপ্লবীরা ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করতেন। ভারতবর্ষকে ভালোবাসা তাঁর আত্মার অত্যাজ্য ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তাই সেই ভারতবর্ষের অঙ্গে যারা হস্তক্ষেপ করতে চায়, তারা ইংরেজ শাসকই হোক, বিদেশী খ্রীস্টান মিসনারি হোক, বা নব্য 'রিফর্ম্‌ড্‌ হিণ্ডুজ' হোক, তিনি তাদের সামনে করালী মূর্তি ধরে অবতীর্ণ হতেন। এই জন্যই তিনি সর্বাগ্রে ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার এতটা প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

ধর্মমতে নিবেদিতা ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু, এর সঙ্গে তাঁর মনে ছিল গভীর শাক্তভাব। আদ্যাশক্তি তাঁর হৃদয়ে বল সঞ্চার করেছিলেন। রাষ্ট্রদর্শনে তিনি চূড়ান্ত পথের পথিক। ঘোর বিপ্লবী, যারা শুধু হোম-রুল চাইত, ইংরেজের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের নিরাপদ আশ্রয়তলে বাস করতে পারলেই নিজেদের ধন্য মনে করত, তিনি তাদের ভীরুতাকে বাক্যবাণে ভস্ম করতে চাইতেন। শাসক-শোষক ইংরেজের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল দুর্নিবার। শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাই সে যুগের বিপ্লবীরা তাঁর চারদিকে বৃত্ত রচনা করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত বিপ্লবী তাঁর কাছ থেকে আদর্শলাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ ভারতের রাজনৈতিক পটতলে নিবেদিতা বজ্র-ধারিণী হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই অসহিষ্ণু আইরিশ কন্যা ভারতকন্যকা হলেন বটে, কিন্তু শিরাধমনীর মধ্যে আইরিশ রক্তের তাণ্ডব মিলিয়ে যায় নি। তাঁর রাজনীতিতে আপোষ-রফার স্থান ছিল না। বজ্রবৎ অমোঘ আঘাতে অত্যাচারীর ওপর ভেঙে পড়াই তাঁর রাজনীতি। ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতা ছিল তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁর স্কুলের মেয়েদের কাছে প্রাচীনকালের বীর ভারতের কথা বলতে বলতে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন, ভাবমুগ্ধচিত্তে বলে উঠতেন "ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করবে—ভারতবর্ষ,

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা, মা!" এই বলে তিনি নিমীলনয়নে জপমালা নিয়ে জপ করতেন, "ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, মা, মা, মা!"

এক সময়ে নিবেদিতা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সেই ধরনের একখানি পাতাকার নিদর্শনও দেখিয়ে-ছিলেন—"গাঢ় রক্তবর্ণের জমির উপর সোনালী সূতার বজ্র ও উহার পার্শ্বে লেখা 'বন্দেমাতরম্'।" এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড রকমের যোদ্ধৃত্বভাব ফুটে উঠত। তাঁর চরিত্রের চারিদিকেই কোমলতার সঙ্গে প্রধর্ষী আক্রমণের ভাব ছিল। ১৯০৫ সালে তিনি *Aggresive Hinduism* নামে যে পুস্তিকা রচনা করেন তাতে তিনি হিন্দু ধর্মের বৈকল্য দূর করে তাকে বীর্যের মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার নিকট-সংস্পর্শে এসে তাঁর চরিত্রে "প্রবল শক্তি" ও "যোদ্ধৃত্ব" ভাবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন—যাকে তিনি "দুর্দান্ত জোর" ও "বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড স্নেহ" বলেছেন। নিবেদিতার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা বোধ করলেও এই "বলবান আক্রমণের বাধা" কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের একই সঙ্গে "গভীর বাধা" এবং "গভীর ভক্তি" জাগ্রত হয়েছিল। গভীর ভক্তি কেন জেগেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার ত্যাগপূত বৈরাগিণী মূর্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সবিস্তারে তা বলেছেন। কিন্তু তাঁর চিত্ততলে নিবেদিতার প্রতি বাধা এল কোন্ রন্ধ্রপথে, তার কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ শান্তরসাস্পদ ঔপনিষদিক ভক্তি ও বৈষ্ণব লীলারসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হিন্দুর পৌরাণিক ঐতিহ্য এবং বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম-দর্শননীতি তাঁর মনোমতো এবং প্রীতিকর না হওয়াই স্বাভাবিক।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলায় ব্রাহ্মমতাদর্শ হীনবল হয়ে পড়ে। পূর্বেই তা ত্রিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং যুক্তিবাদ ও স্বদেশ-প্রেমকে পৌরাণিক হিন্দু আদর্শ আশ্রয় করে, প্রাচীন ঐতিহ্যকে যুগোপযোগী রূপ দান করে জনমনে এবং শিক্ষিত ভারতবাসীর চিত্তে অভিনব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একে কেউ কেউ Hindu Revival, Neo-Hindu Renaissance, Re-orientation of nationalism with Hindu bias অথবা Re-orientation of Hinduism with national bias * ইত্যাকার নাম দিয়ে থাকেন। এ সব নামরূপের চটকদারী বৈচিত্র্য বাদ দিলেও একটা ঐতিহাসিক তথ্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এই যুগে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজাদর্শের পটভূমিকায় হিন্দুচেতনার নবায়ন শুরু হয়েছিল। একে 'হিন্দু' নাম দিয়ে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার জন্য বিষণ্ণ এবং লজ্জিত হবার কারণ নেই। কারণ যাঁরা এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, তাঁরা কেউ-ই অযুক্তিবাদী সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিলেন না। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও উদারতা সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন নিঃসংশয়। কিন্তু তাই বলে অন্য ধর্ম বা অন্য সম্প্রদায়কে হীন দৃষ্টিতে দেখেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'—এর চেয়ে উদারতর ধর্মবোধ পৃথিবীর আর কোন্ ধর্মে পাওয়া যাবে? আরও একটি কথা, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে কয়েকজন য়ুরোপীয় ভারততাত্ত্বিক প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের অনেক সিদ্ধান্ত ও অনুসন্ধান-প্রণালীর গুণগত ও গবেষণাগত মূল্য যাই হোক না কেন, বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি-সংহিতাসংক্রান্ত তাঁদের প্রশংসাবাণী ও ভক্তির উচ্ছ্বাস এদেশের ইংরেজীশিক্ষিত-সমাজকে

* রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য।

বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ করেছিল। ম্যাক্স্‌ম্যুলর এদিক থেকে হিন্দু-ভারতের প্রভূত উপকার করেছিলেন।

সমসাময়িক কালে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বিশুদ্ধ যুক্তিমার্গের আধারে পৌরাণিক সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ নতুন দিকে মোড় ফিরল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে স্মৃতি-সংহিতা-সাহিত্য-পুরাণের অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরে নতুন করে শ্রদ্ধাবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তুলল। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডে, অর্থাৎ বাংলাভাষী অঞ্চলে এবং ইংরেজীশিক্ষিত-সমাজে প্রসার লাভ করল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ সমগ্র ভারতের নানা স্তরেই নতুন আশার বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চার করেছিল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের পুরাতন ঐতিহ্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা ও গ্রহণের ইঙ্গিত প্রভৃতি ব্যাপার, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রবীন্দ্রনাথ—যিনি উপনিষদের ভাবরস, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্ত ভক্তি এবং বৈষ্ণব লীলারসে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি খুব একটা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখেন নি। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নব্য হিন্দুধর্মের আত্মপ্রসার, দলগঠন, শিক্ষিত যুবসমাজকে স্বদেশপ্রেমাত্মক হিন্দুচেতনায় দীক্ষাদান—ইত্যাদি ব্যাপার কবিগুরুর ততটা মনঃপূত হয় নি। হিন্দুর এই নবজাগরণকে তিনি বোধ হয় প্রধর্ষী ও আগ্রাসী উগ্রতা বলে মনে করতেন এবং গোরার উদ্ধত উক্তির মধ্যে সেই দিকটার তীব্র দম্ভ ও দুর্বলতাকে ফোটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইরিশ গোরার সঙ্গে আইরিশ মার্গারেট নোব্‌লের কোন দিক দিয়েই মিল ছিল না। গোরার হিন্দুসংস্কারের অনেকটা উচ্ছ্বাস হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিক্ষা ও উপদেশের ফল। তাঁর প্রভাবেই সে উগ্র সনাতনী হয়ে উঠেছে। "দেশের যাহা-কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা" করবার সাধনা তার যতই আন্তরিক হোক, আসলে

সে আইডিয়ার সাধনা করেছে, মানুষের নয়। কাজেই দেশভ্রমণের উপলক্ষে যখন তার সঙ্গে নানা-সংস্কারে-জড়িত ও জাড্য-আশ্রিত বৃহৎ পিণ্ডবৎ হিন্দুসমাজের যোগ ঘটল, তখন তার তথাকথিত সুমহৎ হিন্দুত্বের খোলস ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল, নন্দের অপমৃত্যু-রূপ একটি ঘটনায় তার বিশ্বাসের গ্রন্থিও শ্লথ হয়ে গেল। তার চিন্ত-পরিবর্তনের এই হল নঙর্থক দিক। এর অস্ত্যর্থক দিক হল পরেশবাবুর সীমাগণ্ডীহীন উদার মানবধর্ম এবং সুচরিতার স্নিগ্ধ-সুকুমার নারী-হৃদয়ের স্পর্শ। সুতরাং যে মুহূর্তে গোরা আবিষ্কার করল, সে জন্মসূত্রে ভারতীয় নয়—খ্রীস্টান কেল্টিক সন্তান, সে মুহূর্তেই তাঁর হিন্দুসংস্কারের শেষ বন্ধনটুকুও শিথিল হয়ে গেল। নিজ গোত্রপরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞাত গোরার হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা মোহ মাত্র, তাই সেই মোহ ভঙ্গ হতে বিলম্ব হয় নি। কিন্তু নিবেদিতার 'যোদ্ধৃত্ব' বা 'জোর-জবরদস্তি'র মূলে কোন মোহমুগ্ধতা বা অজ্ঞতা ছিল না। ভারতের চিরাগত সংস্কার, তার মনপ্রাণের গূঢ় রহস্য এবং ভাবতের বিভিন্ন শ্রেণীসম্প্রদায় সম্বন্ধে এই বিদেশিনী যেভাবে সচেতন ছিলেন, এ যুগের খুব কম ভারতীয়ই তার নাগাল ধরতে পারবেন। বিবেকানন্দের উপদেশ ও নির্দেশেই নিবেদিতার সমগ্র সত্তা প্রকৃত ভারতবর্ষকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, এবং অত্যন্ত গভীর ভাবে ভারত-আত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সে ভারতবর্ষ একাধারে ধ্যানের ভারতবর্ষ, জ্ঞান ও কর্মের ভারতবর্ষ, অতীতের গৌরবময় ভারতবর্ষ, বর্তমানের হতশ্রী ভারতবর্ষ,—গভীর পরিচয় না ঘটলে এই হতভাগ্য দেশের অসহায় জনসাধারণের প্রতি তাঁর মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহমাধুর্য এভাবে ক্ষরিত হতে পারত না। তিনি যে আবেগব্যাকুল কণ্ঠে এই মূক জনতাকে 'Our pople' বলতেন, তা রাজনীতিকের বাক্‌চাতুরী নয়; যথার্থই তিনি ভারতবর্ষকে মায়ের মতোই লালন করতে চেয়েছিলেন। এদেশের দোষত্রুটি, অবক্ষয়—সব সত্ত্বেও তিনি এই ভারতভূমিকে

ভালোবেসেছিলেন। সে ভালোবাসায় কেউ আঘাত দিলে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে পড়তেন, তখন এই বীরাঙ্গনার কণ্ঠ থেকে বজ্র এবং নয়ন থেকে অগ্নি বিচ্ছুরিত হত। তাঁর সেই প্রচণ্ড প্রবল ইচ্ছা-শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ততটা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। নিবেদিতার প্রবল শক্তি, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "দুর্দান্ত জোর", অর্থাৎ "পাশ্চাত্য স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা"—এটা রবীন্দ্র-নাথের কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য হয় নি।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার, তার সঙ্গে দলগড়া ও মতপ্রচারের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বদেশ ও স্বসমাজ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের মতাদর্শের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না, কিন্তু মূলেই ছিল বিরোধ। একথা অবশ্য ঠিক, "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাস হইতে এত পৃথক যে, কাহারও পক্ষে কাহারও মতের সমর্থন আশা করা যায় না।"* এই জন্যই হিন্দুধর্মের কাছে নিবেদিতার একান্ত আত্মসমর্পণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। নিবেদিতার হিন্দু সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন :

> "আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি, তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন, একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্তচিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির:মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমান

* প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড

কালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে, কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।" ('পরিচয়')

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বর্তমানে আমরা যে আচার-অনুষ্ঠান, বারব্রত পালন করি এবং পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকি, নিবেদিতার হিন্দুধর্ম সে রকমের ছিল না। আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে সমগ্র হিন্দুধর্মের যা-কিছু শ্রেয়, যাকে ভারতধর্ম বলা যায়, নিবেদিতা তারই অনুরাগিণী হয়েছিলেন। তাই তিনি বুদ্ধদেবকে অতিশয় ভক্তি করতেন, মুসলমান জাতির প্রতিও তাঁর সাধারণ আচারী হিন্দুর মতো কোন অপ্রসন্ন মনোভাব ছিল না। হিন্দু-ভারতের যে-গৌরব তার সাহিত্যে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে ও শিল্পের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তিনি তাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাকেই সর্বত্র প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের অন্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তার প্রতি চক্ষুষ্মান করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আচারপরায়ণ হিন্দুধর্মের কৃত্যমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চান নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

"যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।" ('পরিচয়')

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মূল তাৎপর্য হল, নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনুরাগিণী হয়েছিলেন বলে আমরা আমাদের হিন্দুয়ানির সঙ্কীর্ণ কোটর থেকে তাঁকে দেখছি এবং "আমরা বলিতেছি, তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই।" হিন্দুধর্মের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগ থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের কোন কক্ষেই স্থান নির্দেশ করা যায় না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে,

> "তাঁহার (বিবেকানন্দের) আদর্শায়িত হিন্দুসমাজের সাধ্য ছিল না যে, আইরিশ মহিলা মিস্ মার্গারেট নোবল্‌কে ভগিনী নিবেদিতা আখ্যা দিয়া হিন্দুসমাজের কোনো পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া দিতে পারে। সনাতন ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার বর্জন না করিয়া কোনো ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার সহিত পংক্তিভোজন করাও অসম্ভব ছিল" (রবীন্দ্র-জীবন, ২য়)।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, নিবেদিতা ব্রহ্মচর্যধর্মে দীক্ষা নিলেও এ বিচিত্র ধর্মের স্মৃতি-সংহিতাশাসিত প্রকোষ্ঠে তাঁর স্থান হওয়া সুকঠিন—সে কথা তাঁর চেয়ে কে বেশী জানত? ছুঁৎমার্গের তীব্রতা এই বৈরাগিণীকে নিজের জীবনে বহুবার বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়েছে। অশিক্ষিত সমাজের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত যুবকদের কেউ কেউ যখন তাঁর সঙ্গে পানভোজনের ব্যবধান রক্ষা করে চলতেন, তখন তিনি যে মনে মনে কত ব্যথা পেতেন তার সংবাদ আমরা কতটুকুই-বা জানি? তবু তিনি নিষ্ঠাবান আচারী হিন্দুর মতো আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন, কখনও কখনও আমিষ আহার ত্যাগ করতেন, দেবদেবীর পূজানুষ্ঠানে সোৎসাহে যোগ দিতেন—কালীপূজা-সংক্রান্ত তাঁর বক্তৃতা ও পুস্তিকা সুপরিচিত। শুধু হিন্দুর উচ্চতম ধর্মসাধনা ও দর্শনপ্রস্থান নয়, এ

ধর্মাদর্শের নানাবিধ কৃত্য ও কুলসংস্কারকে তিনি অনুসরণ করতেন, পালন করতেন। সুতরাং তাকে শুধু ভারতপ্রেমিক ইণ্ডোলজিস্ট বলে দেখলে তাঁর যথার্থ স্বরূপ বোঝা যাবে না। হিন্দুর আচারমার্গ পরিত্যাগ করে তিনি শুধু হিন্দুত্বের নির্যাসটুকু নিয়েছিলেন—তাঁর চরিত্রকথা থেকে তা মনে হয় না। মনেপ্রাণে, আচারে-অনুষ্ঠানে, জ্ঞানে-কর্মে-সাধনায় এই বিদেশিনী হিন্দু হবার দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন। সে সাধনার উত্তরসাধক ছিলেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ।

নিবেদিতা মনুষ্যত্বের গৌরবে আমাদের ধন্য করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর অর্জিত হিন্দু সংস্কারকেও অস্বীকার করা যায় না। সে যাই হোক, এই দুই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দুস্তর মতপার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের আরও একটি কারণ—নিবেদিতার চণ্ড রাজনীতি। এদিক থেকে তিনি বিপ্লবী আদর্শের জ্বলন্ত শিখাস্বরূপিণী ছিলেন। তাঁর ভারতপ্রেম নিতান্ত অহিংস ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ১৯০১ সালে একবার বাগবাজারে নিবেদিতার বাসায় এসে আলাপাদি করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের প্রতি এই বিদেশিনীর উচ্ছ্বসিত প্রেমের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু "কথাবার্তায় আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন ঐক্যের সূত্র ধরা পড়িল না।" এর কারণ বোধ হয়, নিবেদিতার হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের প্রতি একনিষ্ঠ আসক্তি এবং রাজনৈতিক মতের উত্তাপ। মডারেট পন্থার মোলায়েম দেশসেবা নিবেদিতার চক্ষুশূল ছিল, ইংরেজের স্তাবকতা তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। নরম পন্থী দীনেশচন্দ্র সেনকে তিনি প্রকাশ্যেই কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন, "দীনেশবাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সেদিক দিয়ে আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নয়, মর্মপীড়া দেয়…।" তাঁর দেশসেবার মধ্যে যে প্রচণ্ড দাহ

ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সমস্ত কারণে একদিকে তিনি নিবেদিতার প্রতি যেমন যথার্থ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তেমনি আবার ভগিনীর চারিত্রিক ঋজুতা ও বিপ্লবী মনোভাবের চণ্ডতাকে (যেগুলিকে তিনি বোধ হয় বিবেকানন্দের প্রভাব বলে মনে করতেন) পরিহার করে চলতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে, উপন্যাসে, আলোচনায় প্রধর্ষী দেশপ্রেমকে কখনও স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। নিবেদিতা এসব ব্যাপারে আইরিশ-বিপ্লবের আদর্শে অগ্নিকণা ছড়াতে চাইতেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলবার জন্য তিনি আগ্রাসী স্বদেশপ্রেমকে অধিকতর মূল্য দিতেন। সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনও রকম মিল ঘটা সম্ভব ছিল না। তবু এ বিরোধ ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিরতিশয় ভক্তি করতেন। তিনি সেকথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে বলেছেন, "তাঁর সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।"

আদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও লোকমাতা নিবেদিতার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। মর্ত্যদেহ পরিত্যাগের পূর্বে রোগাতুর নিবেদিতা আবৃত্তি করতেন—"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরার্মি এধি।" এতো রবীন্দ্রনাথেরই মনের প্রার্থনা। মৃত্যুর পূর্বে নিবেদিতাকে বুদ্ধবাণী (নিবেদিতারই অনুবাদ) শোনানো হয়েছিল :

"Let all things that breathe, without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path! In the East and in the West, in the North, and in the South, let all

beings that are without enemies, without obstacles, overcoming sorrow, and attaining cheerfulness, move forward freely, each in his own path."

সেই চিরন্তন পথ ধরেই নিবেদিতা সাধনা করেছিলেন, নিজের পৈতৃক কুলসংস্কার ভুলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবনাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, এদেশের মাটিতেই তাঁর শেষশয্যা রচিত হয়েছিল, চিতাভস্ম সংগ্রহ করে শোকাচ্ছন্ন অনুরাগীর দল নতমস্তকে শীতার্ত শৈলনিবাসে ফিরে গিয়েছিলেন। তারই অল্প কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি রচিত হয়। তাই এতে তাঁর ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতি ও ভক্তি এমন নিবিড় ভক্তির রসে ভরে উঠেছে। (১৩৭৩)

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ধর্মচেতনা

রামমোহন—কেশবচন্দ্র

১.

অধুনা কারও কারও মনে 'ধর্ম' শব্দোচ্চারণে ভীতি ও অনীহার সঞ্চার হয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান কালের বিজ্ঞানমুখী, যন্ত্রমুখর ও ইহবাদী সভ্যতার বাহ্বাস্ফোট সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষ চেতনাবহির্ভূত ঐশী শক্তির সর্বতোভদ্র সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে এখনও অনেকে আস্থাশীল। কিছুকাল পূর্বে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে ভগবান-সম্পর্কীয় "মস্তিষ্ক-কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি" সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে, এমন কথা জড়বাদী এবং কার্যকারণাত্মক বিশ্ববিবর্তনে-বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা মনে করতেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও পরমাণুতত্ত্বের বিস্ময়কর উন্নতি সত্ত্বেও শিক্ষাভিমানী প্রগতিশীল মানুষের মন থেকে ঐশী চেতনার কিছুমাত্র বিলুপ্তি ঘটে নি। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকগণ মাপজোখের সাহায্যে এবং অনুসন্ধিৎসার বকযন্ত্রে রহস্যতত্ত্বকে পরিশ্রুত করে মনে করেছিলেন— অতঃপর মানুষের কাছে কোনও কিছুই আর দুর্জ্ঞেয়, রহস্যমণ্ডিত ও ঐশী ব্যাপার বলে শ্রদ্ধাভক্তির বিল্বদলে পূজা পাবে না। কিন্তু বিশ শতকের যুগান্তকারী আবিষ্ক্রিয়া সত্ত্বেও পরমরহস্যের চাবিকাঠি এখনও নিরুদ্দেশ অবস্থায় রয়ে গেছে। মেটারলিঙ্কের সেই হতাশা-ব্যঞ্জক উক্তিটি: "The uncertainty remains"—অনিশ্চয়তার অন্ধকার দূর হল কই? বরং নব নব আবিষ্কারের ফলে রহস্যান্ধকার অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। তা সে যাই হোক, ঐশী সত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের মানস-প্রবণতা মানুষের সংস্কৃতিকে যে নানা

দিক থেকে বৈচিত্র্য দিয়েছে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে যে এর একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব রয়ে গেছে, তা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ষোল-আনা আয়োজন হয়েছিল বিশেষ বিশেষ ধর্মবোধ ও ঈশ্বরচেতনাকে কেন্দ্র করে। বাংলা দেশ বড় বিচিত্র ভূমি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবেগোন্মত্ত রসসাধনা যেমন এদেশকে প্লাবিত করেছিল, তেমনই একই কালে নব্য ন্যায়ের ক্ষুরধার প্রকর্ষ বাঙালী-মেধার এক অবিনশ্বর পরিচয় রেখে গেছে। সে যুগে সম্পূর্ণ আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত অনেক নৈয়ায়িক-বাঙালী ব্রজেন্দ্রনন্দনের দোহাই পেড়ে গ্রন্থারম্ভ করতেন। দেবভাষায় লেখা এ সমস্ত দার্শনিক চিন্তা ও মননপ্রণালী ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সামান্য পরিচয় নিলেই দেখা যাবে, লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি অটল বিশ্বাস এই যুগের বাঙালীর সাহিত্যাশ্রয়ী মনোধর্মকে প্রভাবিত করেছে। "কানু ছাড়া গীত নাই"—এ প্রবচনের 'কানু'কে যদি সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে বিধৃত করে দেখি তা হলে এর নির্গলিতার্থ যথার্থ বলেই মনে হবে। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে সমসাময়িক কালের ইতিহাস ও সমাজের গভীর ছাপ পড়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-কে ছেড়ে দিলে ইতিহাসাশ্রয়ী আর কোন কাব্যই দৃষ্টিগোচর হবে না। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর কোন কোন স্থানে ইতিহাসের সঙ্কেত আছে বটে, কিন্তু ইতিহাস ও রূপকথা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাবৎ কবিকুল তাঁদের সমসাময়িক দেশ-কালের কথাকে বড় একটা আমল দিতেন না। তাঁদের কেউ কেউ বিভিন্ন দেব-দেবীর লীলারসে মুগ্ধ হয়ে মন্দিরা-চামর সহযোগে পাঁচালীর রীতিতে আখ্যান আবৃত্তি করতেন, কেউ-বা কীর্তনের সুরে এবং আখরের

টানে এমন ভাবোদ্রেক করতেন যে, ভাবগ্রাহী ভক্তের দল ঘন ঘন' দশাপ্রাপ্ত হতেন। ইতিমধ্যে দেশ ও সমাজের আমূল পরিবর্তন শুরু হল, সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবীর রঙ্গমঞ্চে যবনিকা নামল। বর্ম-চর্মপরা কুশীলবের দল বেগম ও তোয়ফাওয়ালীদের কর ধারণ করে অতি দ্রুত নেপথ্যবিধানের অন্তরালে অদৃশ্য হলেন। ইংরেজ বণিকের রাজত্ব শুরু হল, ক্রমে ক্রমে শাসনে, আচরণে, শিক্ষাদীক্ষায় যুগান্তরের সূচনা হল। শুরু হল ঊনবিংশ শতাব্দী, পূর্ব-ভারতের শ্যাম প্রান্তরে পশ্চিম-সমুদ্রের লোনাজল তরঙ্গ-বিক্ষোভে ভেঙে পড়ল।

২.

রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল্ নিদ্রাভঙ্গের পর দেখেছিল, তার চারপাশের তামাম দুনিয়া বিলকুল বদলে গেছে। যদি কোন মন্ত্রবলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গৌড়জনকে উনিশ শতকের কলকাতায় এনে ফেলা যেত, তবে সে ব্যক্তি রিপ্ভ্যানের চেয়েও বিমূঢ় হয়ে যেত। রামমোহনের বেদান্ত-উপনিষৎ-অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, বিচার-বিতর্ক; ব্রাহ্মণেতর সমাজের হাতে অশূদ্রপরিগ্রাহী শাস্ত্রগ্রন্থের আবির্ভাব; হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ভূরিভোজ; সাময়িক পত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন; 'ইয়ং-বেঙ্গল'-দের যে-কোন ধর্মবোধ ও পারমার্থিকতার বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার— এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা থেকে মনে হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড়-যুবকদের চাপে এবং পাশ্চাত্যের ইহমুখী ও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে বাঙালীর দীর্ঘকাল-লালিত ধর্মচেতনা বুঝি লুপ্ত হয়ে গেল। কোনও এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সময়ের শিক্ষিত বাংলার মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন: "পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া

গেলেন।"[১] কথাটা নেহাত লঘুধরনের নয়। রামমোহনের যুগেই (১৮১৫ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) হিন্দু কলেজ-প্রদত্ত প্রত্যক্ষ-জ্ঞানমূলক বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রভাবে জড় জগতের বাইরে অন্য কোন অচিন্ত্য চৈতন্যের কথা নবীনসমাজে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্বে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট রামমোহন বেদান্তসূত্রের অনুবাদ-ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ এবং উপনিষদের অনুবাদ প্রচার করে অপরিণত বাংলা গদ্যকে গভীর আলোচনার বাহন এবং বিতর্কের আয়ুধে পরিণত করলেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মান্দোলন ও বিচারবিতর্কের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষিপ্ত হয়ে বাংলা গদ্য অতি অল্পকালের মধ্যেই যৌবনের দার্ঢ্য অর্জন করল।

অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব ও রামমোহনের একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তাপ্রণালীর মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রের ঐকাতত্ত্ব (unitarianism) এবং ইসলামীয় মোতা-জেলা-মুওয়াহিদ্দিনি সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদ রামমোহনের পারমার্থিক চিন্তার নিয়ন্ত্রণ-রজ্জু কিনা, সে-বিষয়ে ভেবে দেখা দরকার। রামমোহন-আশ্রিত একেশ্বরবাদ ভৌমসম্পর্কে আকাশচারী। দৈনন্দিন জীবন ও কর্মব্যাপারে বেদান্ততত্ত্ব প্রয়োগ করলে গোটা জাতটাই কর্মভীরু, অলস ও দিবাস্বপ্নবিলাসী হয়ে উঠবে, রামমোহনের এই ধরনের আশঙ্কা ছিল। তাই বেদান্ততত্ত্বের প্রচারক হয়েও তিনি দৈনন্দিন ও বাস্তব জীবনে বেদান্তের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন নি।[২] একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রচারণার মূলে রামমোহন অনেক সময়ে

১. বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্য। (নতুন সংস্করণ, পৃঃ ১৩১)

২. এ বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পারমার্থিক কারণের চেয়ে জাগতিক ব্যাপার ও বাস্তব প্রয়োজনকে অধিকতর মূল্য দিতেন। একদা তিনি তাঁর বন্ধু ও উপরওয়ালা ডিগ্‌বিকে লিখেছিলেন যে, হিন্দুদের আচারধর্ম রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির বাধাস্বরূপ।[৩] এই উল্লেখ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষায় বেদান্তপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য 'political advantage and social comfort'; সুতরাং তাঁকে 'a theo-philanthropist' বলা বোধ হয় সর্বথা যুক্তিযুক্ত হয় না।[৪] তাঁর মানবহিতৈষণা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু বিশুদ্ধ পারমার্থিকতাও তাঁর জীবনধর্ম নয়। বৈষয়িক জীবন ও বেদান্তচর্চার মধ্যে তিনি কখনও কখনও পৃথক সীমারেখা টেনে দিতেন, কখনও-বা সমাজ ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মতো[৫] স্থূল ও স্থাবর প্রয়োজনকে বেদান্তপ্রচারের ব্রত বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বেদান্তের মায়াবাদের প্রতি তাঁর কোন মায়া-মমতা ছিল না। কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যের পোষণ ও বিকাশে তাঁর গুরুতর প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের অমসৃণ ও অনভ্যস্ত বাংলা গদ্যে বেদান্ত ব্যাখ্যা ও বিচার করে এবং নানাবিধ বিতর্কমূলক আলোচনায় গদ্যভাষাকে

৩. প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪. *Calcutta Review*-এ (১৮৪৫ সাল) কিশোরীচাঁদ মিত্রের উক্তি।

৫. দেবেন্দ্রনাথও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মূলে কতকটা এই মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি মনে করেছিলেন: "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে।" —সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী,' ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১০৬

অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে তিনি বাংলা গদ্যের জড়ত্বমোচনে বহুলাংশে সফল হয়েছিলেন।

রামমোহনের সমসাময়িক পুরাতন আদর্শের পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন লৌকিক ভাষায় বেদান্তপ্রচারের ঘোর বিপক্ষতা করেন এবং তাঁকে অতি কটু ভাষায় আক্রমণ করে 'পাষণ্ডপীড়ন' (১৮২৩) নামে একখানি প্রতিবাদ-পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকার কটুকাটব্য বাদ দিলে দেখা যাবে, বেদান্তপ্রচারের ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে কাশীনাথ ও তাঁর দলভুক্ত পুরাতন পন্থীদের একস্থলে ঘোরতর ব্যবধান ঘটে গিয়েছিল। রামমোহন বেদ-উপনিষদ-বেদান্ত-তন্ত্রকেই একমাত্র প্রামাণ্য এবং বিশুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্র বলে মনে করতেন, কিন্তু পুরাণাদির প্রতি তাঁর ছিল দারুণ বিতৃষ্ণা। যে সমস্ত পুরাণ ও কাব্যগ্রন্থে কৃষ্ণলীলার আদিরসাশ্রিত উদ্দাম বর্ণনা আছে, তিনি অপ্রামাণিক বলে সেগুলিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীচৈতন্যের প্রতিও তিনি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।[৬] কিন্তু কাশীনাথের মূল বক্তব্য হল, প্রাকৃত জনসাধারণের জন্য পুরাণের পারমার্থিকতা অবশ্য স্বীকার করতে হবে; অপরদিকে বেদান্ত শাস্ত্রের মতো গুহ্যবিদ্যাকে সর্বসাধারণের ভাষায় প্রকাশ করে রামমোহন যেন কুলবধূকে হাটের মাঝে বিবস্ত্রা করেছেন। সে-যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরও অভিমত— পুরাণশাস্ত্র ও দেবদেবীর প্রতি রামমোহনের অবজ্ঞা দেখান উচিত

৬. 'পথ্যপ্রদানে' (১৮২৩) রামমোহন গৌরাঙ্গদেব ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্বন্ধে সব্যঙ্গে বলেছিলেন: "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাঁহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"—সাহিত্যপরিষদ প্রকাশিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী'—৬, পৃঃ ১০৪

হয় নি, এবং বেদান্তের মতো গভীর ব্যাপারকে বাংলা ভাষার মতো সর্বজনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করে রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রের অমর্যাদাই করেছেন।* সে যুগে যে সমস্ত পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মণপণ্ডিত রামমোহনের বেদান্ত-প্রচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিবাদের ধারা কতকটা এইরকম: রামমোহন পুরাণ ও পৌরাণিক দেবদেবীকে নস্যাৎ করে বেদান্তকে যে একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, তা কোনমতেই হিন্দুর শাস্ত্র ও ঐতিহ্যসম্মত নয়। নর, নরোত্তম, নারায়ণকে নমস্কার করে ও দেবী সরস্বতীর জয়ধ্বনি করে মহর্ষি বেদব্যাস যে-গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রত্যবায়গ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্রেও কি নানা দেবদেবীর বন্দনা ও পূজোপাসনা নেই? বহু-দেববাদ হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থেই স্বীকৃত হয়েছে। পরবর্তী কালের মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণে-উপপুরাণে সেই আদর্শ আরও বিস্তারিত আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। বেদান্ত-উপনিষদে বিধৃত ব্রহ্মবিদ্যা হল রাজবিদ্যা—জনসাধারণের জন্য নয়। অধ্যাত্ম চেতনা ও পরমার্থিক সাধনায় যাঁরা তুঙ্গশীর্ষ অবলম্বন করেছেন ব্রহ্মবিদ্যায় শুধু তাঁদেরই অধিকার। 'অদীক্ষিত' ব্যক্তির হাতে যদি সুগোপ্য ব্রহ্মবিদ্যা পড়ে, তা হলে "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার"—এই রকম বিড়ম্বনা হয় না কি? অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় কখনও বেদান্তবিরোধী ছিলেন না। কারণ, তিনি স্বয়ং কলকাতার বাসায় পুঁথি থেকে ছাত্রদের শঙ্করাচার্যের টীকাসহ উপনিষদ পড়াতেন—একথা রামমোহন নিজেই বলে গেছেন।[৭] তবে যা সুগভীর চিন্তার

* পূর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৭. 'কবিতাকারের সহিত বিচারে' (১৮২০ খ্রীঃ অঃ) রামমোহন লিখেছিলেন: "ঐ সকল মূল উপনিষদ ও আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য

ব্যাপার, সাধকের স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসনের আসনে যার প্রতিষ্ঠা, তাকে রামমোহন অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়ে হিন্দুশাস্ত্রের অগৌরব করেছেন—মৃত্যুঞ্জয় ও কাশীনাথের এই হল সুদৃঢ় অভিমত।

পুরাণ-বিরোধিতা ও বেদান্ত-উপনিষদের আনুগত্য রামমোহনের মৃত্যুর (১৮৩৩) পব কিছুকাল হৃতবল হয়ে পড়লেও যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পকালের মধ্যেই রামমোহনেব পথ ধরে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধর্মালোচনা-সংক্রান্ত শাখাটিব পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯) এবং অক্ষয়কুমাব দত্ত-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) হল তাঁর মতপ্রচারের প্রধান বাহন। এই সভা ও পত্রিকায় বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যোগদান করাতে দেবেন্দ্রনাথ নিজেব সাধ্যসাধনের আদর্শকে সেযুগেব বুদ্ধিজীবী মহলে সুপ্রচার কবতে বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় তিনি ঋগ্‌বেদ অনুবাদ শুরু করলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের theism-এর আদর্শের জন্য বেদান্ত ও উপনিষদের ওপর ভিত্তি কবলেন। প্রথমতঃ বলা যেতে পারে, তিনি বেদান্তসূত্রের তত্ত্বকথার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। জীবনের প্রথম দিকে তিনি হিন্দুর পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে অন্তরের অধ্যাত্ম-ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে শান্তি পেলেন না। তখন তিনি য়ুরোপের প্রকৃতিবাদী জড়দর্শন আলোচনায় মগ্ন হলেন, তাতে শুধু অন্তরের প্রদাহ বেড়েই গেল। অতঃপর তিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ চর্চায় শান্তি পেলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞাতেই

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের বাটীতে এবং কালেজের ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্ঞ লোক জানিতে পারিবেন…।"—সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'—২, পৃঃ ৬৮

বেদান্তধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে লিখলেন: "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।" বিশুদ্ধ রীতিতে বেদ-অধ্যয়ন করার জন্য ১৮৪৩ সালে বৃত্তি দিয়ে তিনি কয়েকজন তরুণকে কাশীধামে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে বুঝলেন, উপনিষদই বেদের সার ভাগ; তাই বেদের কর্মকাণ্ডপোষক অংশ তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলেন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী'-র সম্পাদক তাঁর শিষ্য অক্ষয়কুমার দত্তের ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। পরিশেষে তিনি অক্ষয়কুমারের মতের পোষকতা করে বেদের অভ্রান্ততা এবং অপৌরুষেয়ত্ব পরিত্যাগ করেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য ও আর্যধর্ম-প্রণালীর বিবর্তন জানবার জন্য তিনি বেদচর্চা সমর্থন করেছিলেন, নিজেও ঋগ্‌বেদ অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বেদান্তে তাঁর অনীহা ছিল না, বরং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মই যে তাঁর অন্বেষ্টব্য তা তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫০ সালে তাঁর 'ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যা' নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতেই সর্বপ্রথম মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রতি তাঁর বিরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই সময় তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের প্রতি পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে এবং পরেও দেখা যাচ্ছে, একাধিক স্থলে তিনি বেদান্তের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। ১৮৪৬ সালে তিনি বলেছিলেন: "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে…।" কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী থেকে দেখা যাচ্ছে, এই 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য' শব্দের অর্থ বাদরায়ণ সূত্র বা তার শাঙ্কর ভাষ্য নয়,—এ হল ব্রহ্ম-প্রতিপাদক উপনিষৎ। এ বিষয়ে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে খোলাখুলিভাবে বলেছেন:

"আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া

> গ্রহণ করিতাম। বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না; যেহেতু, তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে, যদি উপাস্য-উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত-দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।"[৮]

এখানে তাঁর ধর্মসাধনা সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা সংশয়ের অবকাশ নেই। তিনি মূলতঃ ছিলেন শান্তরসের ভক্তিবাদী। এদিক থেকে বৈষ্ণব দ্বৈতবাদী ভক্তির সঙ্গে তাঁর বিশেষ বিরোধ নেই। তবে লীলাবাদী বৈষ্ণব ভক্ত দয়িত-দয়িতা-সম্পর্কজাত আদিরসকে মন্থন করে ভক্তিরসে পরিস্নাত হতে চান, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে পিতাপুত্রের স্নেহরসের সম্পর্ক স্থাপন করতে অভিপ্রয়াসী। তাই তিনি ধর্মসাধনার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে উপনিষদকে গ্রহণ করলেন। অবশ্য সমস্ত উপনিষদকেই তিনি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে এগারখানি উপনিষদ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দেখলেন, দেশের মধ্যে উক্ত এগারখানি উপনিষদ ছাড়াও 'গোপালতাপনী উপনিষৎ' (বৈষ্ণব), 'গোপীচন্দনোপনিষৎ' (বৈষ্ণব:), 'স্কন্দোপনিষৎ' (শৈব), 'সুন্দরীতাপনী উপনিষৎ' (শাক্ত), 'কৌলোপনিষৎ' (তান্ত্রিক)—এমন কি 'আল্লোপনিষৎ'-ও (যার মধ্যে ইসলামের আল্লাহ্ ও উপনিষদের ব্রহ্মের সংমিশ্রণ করা

৮. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ১৭৭

হয়েছে[৯]) প্রচলিত ছিল। তখন দেশের মধ্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন উপনিষদের মোট সংখ্যা ছিল এক শ' সাতচল্লিশ। ইতিপূর্বে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে বেদ-বেদান্তের ঐশিকতা নিয়ে তাঁর প্রখর তর্কবিতর্ক হয়েছিল। ফলে তিনি বেদবেদান্তকে আর ঈশ্বরমুখনিঃসৃত ভাগবতী বাণী বলে গ্রহণ করতে পারলেন না, কিন্তু উপনিষদের প্রতি আনুগত্য ছাড়তে পারলেন না।

উপনিষৎ-আখ্যাত অনেকগুলি গ্রন্থই নিতান্ত অর্বাচীনকালে রচিত সাম্প্রদায়িক ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত আর কিছু নয়। কিন্তু প্রামাণিক বলে গৃহীত উপনিষদগুলির সমস্ত যুক্তিই দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিভাববিভোর, দ্বৈতবাদী ও শান্তরসাস্পদ চিত্ত মেনে নিতে পারল না। শাঙ্কর ভাষ্যের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাও তাঁর মনঃপূত হল না।[১০] তখন তিনি ব্রাহ্মমতাদর্শের চুম্বক রচনার জন্য নতুন করে বিশেষ বিশেষ উপনিষদ থেকে তাঁর মনোমত শ্লোক সংগ্রহ ও বৃত্তি রচনায় প্রস্তুত হলেন। ইতিপূর্বে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে তিনি ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক মাণ্ডুক্য উপনিষদ পাঠ করেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি প্রশ্ন, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত উপনিষদের কোন

৯. সম্রাট শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্‌ উপনিষদে আসক্ত ছিলেন এবং ৫২ খানি প্রচলিত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ করেছিলেন। তিনি উপনিষদের তত্ত্বের সঙ্গে সুফীতত্ত্ব ও অন্যান্য অধ্যাত্ম তত্ত্বের সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। বেদান্ত-উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব এবং ইসলামি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের 'তৌহীদ', হিন্দুশাস্ত্রের 'সোঽহম্‌ অস্মি' এবং ইসলামি শাস্ত্রের 'অনল হক্' একই রকম। সুতরাং 'আল্লোপনিষদ' রচিত হলে বিস্ময়ের কারণ নেই।

১০. দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (৩য় সং), পৃ: ৭৭

কোন শ্লোকে তিনি প্রাণের আরাম খুঁজে পেলেন না। যে এগারখানি উপনিষদকে তিনি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যেও অনেক বাক্যের সঙ্গে (বিশেষত যেখানে অদ্বৈতবাদের গন্ধ আছে) তিনি আপস করতে পারলেন না (যেমন বৃহদারণ্যকের 'সোঽহমস্মি' এবং ছান্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' বাক্যে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈততত্ত্ব)। ব্রহ্ম-জীবের সাযুজ্যকল্পনা তাঁর মতের সঙ্গে মিলল না। ১৮৪৩ সালে তিনি যে উপনিষদের ওপর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ১৮৪৮ সালে নৈরাশ্যভরা কণ্ঠে সেই উপনিষদ সম্বন্ধে বলতে বাধ্য হলেন: "এই উপনিষৎ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না। হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না" (আত্মজীবনী, পৃঃ ১৬৫—৬৬)। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১০।৩—৬ এবং মুণ্ডকোপনিষদের ৩।২।৭ বাক্যে যে নির্বাণ-মুক্তির কথা বলা হয়েছে, তাকে তিনি একেবারে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন: "হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না" (আত্মজীবনী, পৃ, ১৭২)। এর অর্থ হল, তিনি হৃদয়ের সম্মতিকেই ধর্মানুভূতির মূল নিয়ামক শক্তি বলে গ্রহণ করলেন—দ্বৈতবাদীদের মূল অবলম্বন হল হৃদয়াবেগ। সে যাই হোক, তিনি কয়েকখানি উপনিষৎ থেকে মনোমত বাছাবাছা শ্লোক ও বাক্য সঙ্কলন করতে প্রবৃত্ত হলেন, যার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সংযোগ আছে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। তিনি দিব্যভাবে ও ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে উপনিষদের কিছু কিছু নির্বাচিত বাক্য বলে যেতে লাগলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেগুলি তদ্দণ্ডে লিখে নিলেন। উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক ও বাক্যসমষ্টি, যাকে ব্রাহ্মধর্মের 'theistic বীজ' বলা হয়েছে, সেগুলি পরে গ্রন্থাকারে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে প্রকাশিত হয়। এটি ১৮৪৮ সালের শেষভাগে সঙ্কলিত হয়,

১৮৪৯-৫০ সালে প্রকাশিত হয়, ১৮৫১-৫২ সালে এর অনুবাদ-সংস্করণ প্রচারিত হয় এবং ১৮৬১ সালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় এর তাৎপর্য প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন: "দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাঁহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি।" এখানে আত্মপ্রত্যয়, জ্ঞান ও হৃদয়কেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাভূমি বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে, উপনিষদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অচলা ভক্তি থাকলেও জ্ঞানাত্মক আত্মপ্রত্যয়কেই তিনি সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর আত্মপ্রত্যয় চিদাত্মক হলেও আসলে তাঁর সমস্ত ধর্মচেতনা ব্যক্তিগত ভক্তিবাদ অর্থাৎ শাস্তরসাস্পদ দ্বৈতভক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

৩.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যদিও সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলন নব্যশিক্ষিত বাঙালীকে উচ্চকিত করে তুলল, তবু ধর্ম-চেতনা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এইযুগে দেখা যাচ্ছে অগুয়েস্ত্ কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) ধ্রুবদর্শন বা পজিটিভিজম্-এর বিশেষ প্রভাব ছিল। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষকে সেই সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন মানববাদী কোঁৎ। নবশিক্ষিত বাঙালীসমাজে এই ফরাসী দার্শনিকের উদার মানবধর্ম প্রবল আধিপত্য লাভ করেছিল। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—এঁরা ছিলেন কোঁতের গোঁড়া ভক্ত। তালতলায় নীলমণি কুমারের বাড়িতে এঁরা এবং আরও অনেক শিক্ষিত বাঙালী কোঁৎ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য 'পজিটিভিস্ট্ ক্লাব' স্থাপন করেছিলেন।

তখন এদেশে যে-সমস্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান আসতেন তাঁদের কেউ কেউ এবং কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের দু'চার জন কোঁতের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমজীবনে বহুদিন কোঁৎ-ভক্ত ছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র-পরিকল্পনার পটভূমিকায় তাঁর কোঁৎ-অনুরক্তি এবং 'ধর্মতত্ত্ব'-এ অনুশীলনধর্ম ব্যাখ্যায় এর নির্যাস সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে।[১১] শেষের দিকে তাঁর ধর্মাদর্শে পাশ্চাত্য পজিটিভিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে, অনুশীলন তত্ত্ব (Religion of Culture) এবং ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার সংযোগ-সাধনের চেষ্টা দেখা যায়। সেশ্বর সাঙ্খ্যবাদের অনুকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের কোঁৎ-অনুরক্তি শেষপর্যন্ত সেশ্বর কোঁৎ-বাদে পর্যবসিত হয়। অবশ্য কৌতুকের বিষয় এই যে, স্বয়ং কোঁৎ-ও ধর্মীয় মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। হিউম্যানিটির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা অগুয়েস্ত্‌ কোঁৎ হিউম্যানিটিকেই যীশু-জননীরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ম্যাডোনা যেন একটি শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করে আছেন, কোঁৎ তাঁকেই মানবধর্ম বা 'হিউ-ম্যানিজম্‌'-এর প্রতীক বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বাঙালী কোঁৎ-ভক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ কোঁৎ-কে আর্যঋষির সমতুল্য মনে করতেন। তিনি ম্যাডোনা-মূর্তিকে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে শাড়ীপরা নারীরূপেই পরিকল্পনা করেছিলেন। এই নারীর রাঙাপাড় শাড়ী পরনে, কপালে সিঁদুরের কোঁটা, কোলে স্তন্যপানরত শিশু। এঁকে তিনি ম্যাডোনা না বলে 'নারায়ণী' নাম দিয়েছিলেন।

১১. বঙ্কিমচন্দ্র লীলার "The substance of Religion is Culture" এবং কোঁতের "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying-point for all the separate individuals"-বাক্যে মানবধর্মেরই জয় দেখতে পেয়েছিলেন।—'ধর্মতত্ত্ব', ক্রোড়পত্র, 'খ'।

আসল কথা, এই সমস্ত ভারতীয় কোঁৎ-পন্থীরা পুরোপুরি হিন্দুধর্ম ছাড়তে পারেন নি। যোগেন্দ্রচন্দ্র তো "জবাকুসুম সঙ্কাশং" সূর্যস্তব পর্যন্ত কোঁৎ-প্রবর্তিত পজিটিভিজ্‌ম্‌ তত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতো যুক্তিবাদী কোঁৎ-পন্থীরা অবশ্য এই সমস্ত হিন্দুয়ানির বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না, এবং কোঁৎকে বিশুদ্ধ মানবপ্রেমিকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের আধুনিক সংস্কৃতিতে কোঁৎ-দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ কোন গবেষণা হয় নি। যদি হত, তা হলে বাংলা সাহিত্যে এই বিচিত্র দার্শনিক মনোভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য প্রকাশিত হতে পারত। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য কোঁৎ-দর্শন-চর্চার অনেক সূত্র নির্দেশ করে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে দু'চার কথা আলোচনা করা যেতে পারে, অবশ্য ইতিপূর্বে সে সম্বন্ধে (দ্রঃ 'বিবেকানন্দ ও মানবতাবাদ') কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ আবহাওয়া এবং টুলো পণ্ডিতের ঘরে যাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছে, সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ধরনের শিক্ষায় যাঁর কৈশোর-যৌবন গঠিত হয়েছে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা কি করে যে আধুনিক য়ুরোপীয় মননের অধিকারী হয়েছিলেন, গীতার জ্ঞান-কর্ম-প্রেমকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তারই সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে কখনও সংশয়বাদে, কখনও নাস্তিক্যবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ভাবলে হতবাক হতে হয়। বিদ্যাসাগর পরবর্তী জীবনে ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনে হিন্দু কলেজের যে-কোন সেরা ছাত্রের মতোই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজের কর্ণধার হয়ে শিক্ষাসংস্কারের ইচ্ছায় সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ও রক্ষণশীল শিক্ষাবিধিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শে

ঢেলে সাজতে চেয়েছিলেন। দেবভাষার সংরক্ষক ও পরিপোষ্টা হয়েও তিনি সংস্কৃত কলেজের সাধারণ শিক্ষাবিধি থেকে বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্র এবং ন্যায়-মীমাংসা প্রভৃতি আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে নিরর্থক বলে তুলে দেবার সুপারিশ করেছিলেন।[১২] উপযোগবাদে (প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্) বিশ্বাসী বিদ্যাসাগর মানুষের বাস্তব কল্যাণের প্রতি অধিকতর সচেতন ছিলেন, যে বিদ্যার সঙ্গে ঐহিক প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই, তাকে তিনি জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে মানতে চান নি।

তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ভক্তশিষ্যের কোন কোন উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি হিন্দুর প্রচলিত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও স্মার্ত সংস্কারের প্রতি কিছু উদাসীন ছিলেন। হিন্দুর উপবীত, বিবাহ ও ঔর্ধ্বদৈহিক সংস্কার অবশ্য তিনি সামাজিক রীতি অনুসারে মেনে চলতেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারে তিনি কোন দিনই আসক্ত ছিলেন না। যদিও তিনি অন্তরঙ্গদের কাছে বলতেন: "ধর্মকর্ম সব দলবাঁধা কাণ্ড" ('বিদ্যাসাগর'—বিহারীলাল সরকার), তবু তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের মতো তিনি কখনও হিন্দুধর্ম ও আচরণবিধির বিরুদ্ধে ক্রুশেড ঘোষণা করেন নি, অথবা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মতো হিন্দুর স্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কৃতিকে বর্জন করার কথাও বলেন নি। আসলে তিনি নরের বাস্তব দুঃখবেদনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, নারায়ণের কথা ভাববার বিশেষ সময় পান নি, সেরকম

১২. বিদ্যাসাগর বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলেছেন। এমন কি সমগ্র হিন্দুদর্শনকে 'অপদার্থ' বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। দ্রষ্টব্য: 'Iswar Chandra Vidyasagar as an Educationist'—B. N. Banerjee (*Modern Review*, October, 1927); ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্যসাধকচরিতমালা—১৮)

মানসিক প্রবণতার অধিকারীও ছিলেন না। কেউ তাঁর কাছে নীতি-উপদেশ চাইলে তিনি গীতার কথা বলতেন, কিন্তু নিজে কোন পারমার্থিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা তাঁর রচনা থেকে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। 'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে (১৮৫১) তিনি বালকদের জন্য নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্পর্কে নিবন্ধ লিখলেও ঈশ্বরসম্বন্ধে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন। শোনা যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধে [১৩] তিনি নাকি 'বোধোদয়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ঈশ্বরবিষয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ যোগ করেছিলেন।[১৪] এটি পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জিত হয়ে নিম্ন রূপ ধারণ করে: "ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড় সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন;

১৩. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর (১৮৯৫), পৃঃ ৫২১

১৪. প্রথমে বোধ হয় এই অনুচ্ছেদের আকার কতকটা এইরকম ছিল: "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।" দেবেন্দ্রনাথ নাকি ১৮৪১ সালে সর্বপ্রথম 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' বাক্যটি বক্তৃতায় ব্যবহার করেছিলেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর (৩য় সংস্করণ পৃঃ ৬৯) সম্পাদকের মতে, 'বোধোদয়'-এর উক্ত অনুচ্ছেদ দেবেন্দ্রনাথের উক্তির অনুকরণ। সে যাই হোক, বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিষয়ক 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এই উক্তি গোঁড়া হিন্দুদের অনেকেই সমর্থন করেন নি। বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' এবং সুবলচন্দ্র মিত্রের *Iswar Chandra Vidyasagar* গ্রন্থে সেই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। বিহারীলাল তো স্পষ্টই বলেছেন: "বোধোদয় হিন্দুসন্তানের সম্যক্ পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা।"—'বিদ্যাসাগর' (চতুর্থ সংস্করণ), পৃঃ ২৪৮

ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।"[১৫] তাঁর অন্য কোন রচনায় বড় একটা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নেই, বরং তিনি হিন্দুধর্মের অলৌকিকতার পরিপন্থী ছিলেন। 'সীতার বনবাস'-এ (১৮৬০) সীতার পাতালপ্রবেশ বর্জন করে মানসিক আঘাতে জনকনন্দিনীর আকস্মিক মৃত্যু বর্ণনা করেছেন—এর জন্য সে যুগের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা কিছু কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। 'শকুন্তলা'-র (১৮৫৪) অনুবাদেও তিনি অলৌকিক ব্যাপার যথাসম্ভব বাদ দিয়েছিলেন। কেবল 'আখ্যানমঞ্জরী'-র (১৮৬৩-১৮৮৮) দু'একটি গল্পে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে বটে, তবে 'আখ্যানমঞ্জরী' তাঁর মৌলিক রচনা নয়, ইংরেজী কাহিনীর বাংলা গদ্যে অনুবাদ। মূলে যেখানে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে, সেগুলিকে তিনি বাদ না দিয়ে অনুবাদে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মমত কতকটা প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত ছিল বলে তাঁর কোন কোন জীবনচরিতকার (বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র) তাঁকে যথার্থ হিন্দু বলে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং তাঁর তথাকথিত অহিন্দু মতামতের জন্য, এঁদের কেউ কেউ তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন, তিনি কিন্তু শিক্ষাগুরুকে নাস্তিক বলেই প্রচার করেছেন।[১৬]

১৫. দেবকুমার বসু-সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৩

১৬. 'পুরাতনপ্রসঙ্গে' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনবিহারী গুপ্তের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে একবার নাস্তিক, আর একবার অজ্ঞেয়বাদী বলেছেন। বিপিনবিহারীর প্রশ্ন, "বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন?" দ্বিজেন্দ্রনাথের উত্তর—"ঐ একরকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী।"—'পুরাতন প্রসঙ্গ' (নতুন সং), পৃঃ ২৯৩

বিদ্যাসাগরের বন্ধুবান্ধবের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, বাল্যে তিনি নাকি প্রতিমাপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না, প্রখর মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও উপবীত সংস্কারের পর বাল্যে গায়ত্রী ভুলে গিয়েছিলেন এবং পিতার কাছে তার জন্য যথেষ্ট তর্জিতও হয়েছিলেন। উত্তরকালে পিতা ও পিতামহীর অনুরোধ সত্ত্বেও গুরুর কাছে দীক্ষা ও মন্ত্র নেন নি ; উইলে নানাখাতে অর্থ বরাদ্দ করলেও দেবসেবা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, পূজাপার্বন প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারে এক কপর্দকও দিয়ে যান নি ; কাশীধামে গিয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরে দেবদর্শনের প্রয়োজন বোধ করেন নি, তার পরিবর্তে জনকজননীকেই সাক্ষাৎ শিবদুর্গা জ্ঞানে ভক্তি প্রকাশ করেছিলেন। একখানি যাত্রীবাহী জাহাজডুবির ফলে বহু বালবৃদ্ধ-বনিতার বিনা কারণে প্রাণ বিনাশ হলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও পরমকারুণিকত্বে ঘোর অনাস্থা ব্যক্ত করে বলেছিলেন : "এইসকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।"[১৭] অন্য একসময়ে বলেছিলেন : "'এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা বেশ বুঝি ; তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এসকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না" (চণ্ডীচরণ, পৃ. ৫৪১)। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি ঈশ্বরকে সমদর্শী বলে স্বীকার করেছিলেন। এইসমস্ত উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, ঈশ্বরসত্তায় তিনি ঘোরতর অবিশ্বাসী নন, কিন্তু ঈশ্বরসাধনার জন্য কোন নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বা সাধন-প্রণালীর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। প্রাজ্ঞ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চয় করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তাঁর মন্তব্যটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য : "স্বর্গের দেবতার তাঁহার

১৭. চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর', পৃঃ ৫২২

কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন” (রামেন্দ্র রচনাবলী, ১য়, সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ)।

অবশ্য শেষজীবনে জীবনসংগ্রামে ও লোকবঞ্চনায় ক্ষতবিক্ষত বিদ্যাসাগর বোধ হয় বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। অখিল-উদ্দিন নামে এক মুসলমান বাউলকে তিনি কলকাতার বাড়িতে আনিয়ে মাঝে মাঝে তার দেহতত্ত্ববিষয়ক গান শুনে মানসিক প্রদাহ থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি পেতেন। অখিল-উদ্দিন যখন একতারা বাজিয়ে গাইত:

তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,
আপনার নামটি রাখব কোথা
সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাঞি চাঁদ বাউলে বলে—
সে নাম ভুলব নারে প্রাণ গেলে।

তখন কঠোর মানববাদী এবং ঈশ্বরচেতনায় সংশয়ী বিদ্যাসাগরের অশান্ত ক্লান্ত চিত্ত কি আপন সত্তার গভীরে ডুব দিয়ে “ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিন,” গানের এই প্রশ্নের সমাধানে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হত? সে যাই হোক, তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকলেই তাঁকে নাস্তিক বা সংশয়বাদী বলে জানলেও তাঁর রচনা থেকে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই সময়ে বা এর কিছু পূর্ব থেকে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে খ্রীস্টান মিসনারী সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড আধিপত্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে কেউ কেউ ভারতীয় সাধনায় আবার ফিরে এলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ডিরোজিওর বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের প্রভাবে প্রথম

যৌবনে কিছুদিন শালগ্রামশিলার ঐশ্বরিকতা অস্বীকার করেছিলেন এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতের এই পুত্রটি যজ্ঞোপবীতকে নিতান্তই সূত্রগুচ্ছ বলে কয়েকদিনের জন্য পরিত্যাগও করেছিলেন। অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ভূয়োদর্শী পিতা বিশ্বনাথের উপদেশে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ডিরোজিও-ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার পান এবং পুনরায় স্মার্ত হিন্দুর দেববিশ্বাসে ফিরে আসেন। পরবর্তী কালে তিনি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের পুনর্গঠনের জন্য সদাচার সুনীতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, পুরাতন দেব-বিশ্বাসকেও নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্মাদি গ্রহণ করে ভারতবর্ষকে ঐহিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে বটে, কিন্তু হিন্দুর পৌরাণিক স্মার্ত বিশ্বাস ও আচার পরিত্যাগ করলে চলবে না। যুগধর্মের সঙ্গে নিত্যধর্মের বিরোধ ঘুচিয়ে যথাসম্ভব সমন্বয়ের পথ নিতে হবে। বিশুদ্ধ হিন্দুয়ানী যে নিন্দনীয় অপকর্ম নয়, এবং আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবনের সঙ্গে যথার্থ হিন্দুধর্মের কোন বিরোধ নেই, একথা তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'আচারপ্রবন্ধে' আলোচনা করেছিলেন এবং আদর্শ গৃহস্থের গৃহজীবনের যথার্থ অবলম্বন কি হবে, তা দেখাবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' এবং 'সামাজিক প্রবন্ধে'র অনেক স্থলে হিন্দুর সনাতন আদর্শ, স্মৃতিশাসিত সমাজব্যবস্থা, গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়; তার সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশের হিতচিন্তাও ব্যক্ত হয়েছে। ধর্মমতের দিক থেকে ভূদেব শেষপর্যন্ত গীতাকেই সার বলে জেনেছিলেন। দল-উপদলগত বিবাদে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব খর্ব হতে থাকলে গীতার প্রভাবই শিক্ষিত বাঙালী-সমাজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

৪.

এই যুগে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৯৩) নাম ধর্মসংক্রান্ত আলোচনায় একটু বিচিত্র বোধ হতে পারে। অদ্ভুত প্রতিভাধর, বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী, ইংরেজী শিক্ষা-হিন্দুকলেজ-ডিরোজিও-প্রভাবের শ্রেষ্ঠ ফল প্যারীচাঁদ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী-সমাজে ও ইংরেজসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। দেশবিদেশ থেকে তিনি প্রতিভার উপযুক্ত সম্মানও পেয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং আরও খানকতক আখ্যানের রচনাকার সুরসিক ব্যক্তি বলেই জানে। বাংলা কথা-সাহিত্যের জন্মলগ্নে গদ্যলেখকরূপে তাঁর আবির্ভাব অত্যন্ত শুভ যোগাযোগ বলে বিবেচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কিন্তু আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃৎ বলে সম্মান করতে হবে। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন এবং বৈষয়িক জ্ঞান-সম্পন্ন পিতার পুত্রদ্বয় প্যারীচাঁদ এবং কিশোরীচাঁদ আধুনিক বাংলা সংস্কৃতিতে সুপরিচিত। পাশ্চাত্য ধরনের কৃষিবিজ্ঞানচর্চা, কৃষিবিজ্ঞান-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে প্যারীচাঁদ শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর জীবন ও কর্ম অভিনব বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সাহিত্যচর্চা, কৃষিবিজ্ঞান আলোচনা, প্রেততত্ত্বচর্চা ও থিয়োজফির নানা শাখাকে তিনি পরিপুষ্ট করেছিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন বিদ্যার মধ্যে আত্মীয়তার যোগাযোগ বড় একটা চোখে পড়ে না। কৃষিবিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার বিশিষ্ট সম্পর্ক কোথায়, তা হয়তো সুরসিক টেকচাঁদ ঠাকুর বলতে পারতেন।

প্যারীচাঁদ প্রথম যৌবনে হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ডিরোজিও-

চক্রের প্রভাবে এসেছিলেন এবং তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'-সুলভ কালাপাহাড়ী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি অশন-বসনের কদাচারকে প্রগতি বলে মনে করতেন না। প্রথম যৌবনেই তিনি ধর্মবিষয়ক ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ পড়ে গভীরভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হন এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন "There is but one God of infinite perfection."[১৮] সে যুগের নব্যশিক্ষিত কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী যুবকদের মতো তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হলেন—"I became a theist or a Brahma." ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তাঁর আত্মিক জীবনের বিস্ময়কর পরিবর্তনের সূচনা হয়। স্ত্রীর প্রতি নিবিড় দাম্পত্য প্রেম তাঁকে ক্রমে ক্রমে প্রেততত্ত্বের দিকে টেনে নিয়ে গেল। এর পর তিনি বাইরের ধর্মচর্চা থেকে সরে এসে গভীরভাবে প্রেততত্ত্ব আলোচনায় মেতে উঠলেন। বোধ করি অশরীরী স্ত্রীর ছায়া-সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল প্যারীচাঁদ বিদেশ থেকে প্রেততত্ত্ববিষয়ক বহু গ্রন্থ আনিয়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলন শুরু করে দিলেন। প্রেততত্ত্ববিষয়ক বিদেশী সাময়িক পত্রে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল, পাশ্চাত্যের প্রেততত্ত্ব-সংক্রান্ত সভা ও কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয় স্থাপিত হল। ১৮৮২ সালে লণ্ডনে 'Central Association of Spiritualists' গঠিত হলে তিনি তার সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হলেন। তার কিছু আগে (১৮৮০) এদেশে 'United Association of Spiritualists' স্থাপিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। ইংরেজীতে-লেখা প্রেততত্ত্ব-সংক্রান্ত তাঁর যে-সমস্ত প্রবন্ধ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলির অধিকাংশই তাঁর *The Spiritual Stray Leaves*

১৮. প্যারীচাঁদের *On the Soul* গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।

(1879) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। এ ছাড়াও তাঁর *Stray Thoughts on Spiritualism* (1880), *On the Soul : Its Nature and Development* (1881), *Notes on the Soul* (1908—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত), *Yoga and Spiritualism* (1909) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর অধিকাংশ রচনা সংগৃহীত হয়েছিল। 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী, (১৮৭১), 'ঈশ্বর উপাসনা,' 'উপাসনা' প্রভৃতি আখ্যান ও তত্ত্বগ্রন্থে তিনি প্রথমে প্রেততত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা প্রভৃতি আলোচনার পর অধ্যাত্মবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে জীবতত্ত্বের সম্পর্কবিষয়ে যে সমস্ত আলোচনা করেন, তাতে একদিকে হিন্দুর ষড়্‌দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি যেমন তাঁর নিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল, তেমনি কর্নেল ওলকট ও মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির থিয়োজফিতেও তাঁর প্রবল অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৮৮১ সালে পাশ্চাত্য থিয়োজফি প্রচারের নেতা কর্নেল ওলকট কলকাতায় এলে শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন, এবং ৫ই এপ্রিল (১৮৮২) কলকাতা টাউন হলে তিনি 'Theosophy : The Scientific Basis of Religion' এই শিরোনামায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। প্যারীচাঁদ সেই সভার সভাপতি হয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ থিয়োজফি সম্বন্ধে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কিকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ওলকট-সংবর্ধনা সভায় (১লা মে, ১৮৮২) তিনি মাদাম সম্বন্ধে বলেন : "The most exalted lady Madame Blavtsky, at whose feet I feel inclined to kneel down with grateful tears……" সুতরাং অধ্যাত্মবিদ্যা প্রসঙ্গে তিনি ব্লাভাট্‌স্কির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। ১৮৭৫ সালে নিউইয়র্কে ওলকট-ব্লাভাট্‌স্কির নেতৃত্বে থিয়োজফিকাল সোসাইটি গঠিত হয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, "To promote the study of the esoteric religious philosophies of the

East." সুতরাং এ যুগে থিয়োজফি-প্রেমিক পাশ্চাত্য-চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতীয় দর্শন ও গুহ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

প্যারীচাঁদ বিশ্বাস করতেন: "The end of spiritualism is Theosophy. Spiritualists and Theosophists should, therefore, be united and bring their thoughts to bear on this great end."[১৯] প্রেততত্ত্ব শেষপর্যন্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বে পৌঁছে দেয়, পাশ্চাত্য থিয়োজফিস্টদের মতো প্যারীচাঁদ একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যে দৃঢ় নিষণ্ণ ছিলেন। বিদেশী থিয়োজফিকে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা বুঝে নিতে গিয়ে তিনি ভারতীয় মুনিঋষিদের বিহিত মার্গই অনুসরণ করেছেন এবং আত্মার অবিনাশিতা ও জীবাত্মা-পরমাত্মার পারস্পরিক সম্পর্কবিষয়ে ভারতীয় মোক্ষশাস্ত্রের অনুবর্তন করেছেন। কর্নেল ওলকটের সংবর্ধনাসভায় প্যারীচাঁদ এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন: "What the *Maharshis* and *Rishis* had taught in the *Vedas*, *Upanishadas*, *Yoga*, *Tantras* and *Puranas*, is, that Divinity is in humanity, and that life assimilated to Divinity is the spiritual life—the life of *Nirvana* which is attainable by extinguishing the natural life by *Yoga*, culminating in the development of the spiritual life." এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্ব

১৯. ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র *Theosophist* পত্রে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Inner God' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। এই প্রসঙ্গ ও অন্যান্য তথ্যের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যারীচাঁদ মিত্র' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

ছাড়িয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার মূল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর বাংলা নিবন্ধগ্রন্থ 'যৎকিঞ্চিৎ' এবং আধ্যাত্মিক রূপক-উপন্যাস 'অভেদী'-তে রহস্যবাদ-সংক্রান্ত অনেক গূঢ় সংকেত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী থিয়োজফিস্টরা বুদ্ধিজীবী সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ; তার মূলে ছিল প্যারীচাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব। তাঁর বাংলা গ্রন্থগুলি এবং ব্রহ্মসঙ্গীতগুচ্ছ ('গীতাঙ্কুর') এ বিষয়ে মৌলিকতা দাবি করতে পারে। তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা ও গভীর ভাবনিষ্ঠ রচনা থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> "হে পরমাত্মন্! তুমি স্বর্গের স্বর্গে বিশেষরূপে বিরাজ করিতেছ। অসংখ্য দেবতারা সুমধুর সঙ্কীর্তনে মগ্ন থাকিয়া তোমার অভিবাদন ও প্রেমানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তুমি সামান্যরূপে সকল বস্তু ও জীবে আছ। তুমি জ্যোতি-স্বরূপ, গতিস্বরূপ আকর্ষণস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, সম্মেলনস্বরূপ, সৌন্দর্যস্বরূপ, সুগন্ধস্বরূপ, সুরম্য ধ্বনিস্বরূপ। তুমি সর্বনিয়ন্তা —সর্বসুখদাতা। বাহ্য রাজ্যে যেমন দিবাকর প্রজ্জ্বলিত, তেমনি অন্তররাজ্যের তুমি সূর্য। তোমার জ্যোতিতে আত্মার মালিন্য ও তিমির তিরোহিত হয়—যে আত্মা যত পরিশুদ্ধ ও জ্ঞানে প্রেমেতে পূর্ণ, সেই আত্মাতেই তুমি বিশেষরূপে বিরাজ কর, তখন সেই আত্মাই তোমার স্বর্গের স্বর্গ হয়। তোমার অস্তিত্ব প্রত্যেক নিশ্বাসে, প্রত্যেক দৃষ্টিতে, প্রত্যেক প্রাণে, প্রত্যেক ধ্যানে, প্রত্যেক ভাবে জাজ্বল্যমান।"
> ('যৎকিঞ্চিৎ')

৫.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজের পুরাণবিরোধিতা এবং উপনিষদ-বেদান্তানুরক্তি ইংরেজী-শিক্ষিতসমাজে প্রচুর প্রভাব বিস্তার

করেছিল। এমন কি, কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বেপরোয়া ইয়ং-বেঙ্গলদল যে নবীনসমাজকে গ্রাস করতে পারে নি, তার অন্যতম কারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ সরল ভাষায় উপনিষদের বিশেষ বিশেষ বাক্যর অনুবাদসহ যে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ ১ম ও ২য় (১৮৫০—১৮৫২) এবং 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৫২) প্রকাশ করেন, তার দ্বারা ও বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বিশেষতঃ তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণে যে আত্মস্থ ভক্তি ও পবিত্রতার সাত্ত্বিক ভাব দেখা যায়. গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য বিশেষ-ভাবে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।

পরবর্তী কালে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের অধ্যাত্ম রচনাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁরই বাসনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিতে ('অদ্বৈতমতের সমালোচনা'—১৮৯১, ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচনা—১৮৯৭, 'ব্রহ্মজ্ঞান ও 'ব্রহ্মসাধনা'—১৯০০, 'হারামণির অন্বেষণ'—১৯০৮, 'গীতাপাঠ'—১৯১৫, ইত্যাদি) একাধারে ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের যে নিগূঢ় সমন্বয় দেখা যায়, বাংলার দার্শনিক সাহিত্যের ইতিহাসে তা সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। তাঁর রচনা থেকে এমনি একটি বুদ্ধিদীপ্ত দার্শনিক আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ

> "আত্মশক্তির উদ্দীপন যে কত বড় মঙ্গল, তাহা আমরা জানিয়াও জানি না। আমাদের আত্মশক্তি রীতিমত পরিস্ফুট হইলে আমাদের কোন অভাবই থাকে না। আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না। আমাদের নিজের আত্মশক্তি যে কতবড় মঙ্গল তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে পরমাত্মার আত্মাশক্তি—অর্থাৎ জগৎব্যাপারে যে শক্তি

ঘটিতেছে সেই ঐশী শক্তি কত বড় মঙ্গল তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিবে না।"

(অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র)

এই সমস্ত অধ্যাত্ম-চিন্তাকে তিনি পরিচ্ছন্ন যুক্তিমার্গের দ্বারা এমন-ভাবে সাজিয়েছেন যে, নিগূঢ় তত্ত্ববিদ্যা যুক্তিবুদ্ধির গোচরীভূত হতে পেরেছে। পরবর্তী কালে বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিজস্ব ধর্মানুভূতি ও দর্শনচিন্তার কথা অতি ঋজুভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অজ্ঞেয়বাদীদের তিনি নাস্তিক বলেই মনে করতেন। তাঁর উক্তি: "এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পারি, কিন্তু তাহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন?" এইপ্রসঙ্গে তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় শঙ্করাচার্যের বৈদান্তিক মত স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন:

"শঙ্কর বলিলেন—প্রকৃতির লীলাকে খবরদার বিশ্বাস করিও না; ওকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইজন্য ওকে আমি অবিদ্যা বলিতে চাই। বুদ্ধির দ্বারা উহার ভিতর হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে; উহা অবিদ্যা, মায়া, illusion তোমাকে ফাঁকি দিবেই দিবে। কাণ্ট যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলেন। শঙ্কর ওপথ একেবারেই ধরিলেন না।...আসল কথাটা শঙ্কর যেমন ধরিয়াছেন, তেমন আর কেহ ধরিতে পারেন নাই। এখন, যে-আমি না থাকিলে জগৎ থাকে না, সৃষ্টি মিথ্যা হয়, সে-আমি কি একটা accident? সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটা কি একটা accident-এর উপর নির্ভর করিতেছে? তবে যদি না হয়, তবে?" ('পুরাতন প্রসঙ্গ')

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এই প্রশ্ন অতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের সমস্ত

তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক ও অধ্যাত্মবাদী সাধকের মনে কখনও সংশয় জাগিয়েছে, কখনও নাস্তিক্যের গহ্বরে সমস্ত চৈতন্যকে নিক্ষেপ করেছে, আবার কখনও-বা আত্মপ্রত্যয়ের ত্বরিৎ তড়িতালোকে চিদানন্দময় শিবতত্ত্বকে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' থেকে রক্ষা করেছে। আর্যবাণীর অনুবর্তন করে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যে তত্ত্ববিদ্যার যে আয়োজন করেছেন, এবং যার ফলে আমাদের দর্শনসাহিত্যের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছে, এখনও তাঁর সেই কৃতিত্বের যথার্থ পরিমাপ হয় নি।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ এবং শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে তার প্রতিক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) যোগদান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নানাভাবে উপকৃত করেছিল। বৈষ্ণববংশের সন্তান কেশবচন্দ্রের ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, পাশ্চাত্য দর্শন, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল শুদ্ধা ভক্তি। নানাবিধ প্রগতিশীল আন্দোলন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত নানা ব্যাপারের তিনি ছিলেন কর্ণধার, যুবসমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত শীলসাধনা ও যমনিয়মের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক নিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দর্শন যখন তাঁর মানসিক প্রদাহকে শান্ত করতে পারল না, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' পাঠ করে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করে ব্রাহ্ম হলেন। বাগ্মী, প্রগতিশীল, অথচ ধর্মনিষ্ঠ যুবক, কলকাতার বিদ্বৎগোষ্ঠীর নেতা কেশবচন্দ্র মহর্ষির গভীর সান্নিধ্যে এসে ধর্মৈষণার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মানসিক প্রবণতার দিক থেকে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য ছিল। মহর্ষি ছিলেন উপনিষদের রসে

লালিত শাস্ত ভক্তির মানুষ। তার চেয়ে বড় কথা—তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাই ধর্মসাধনার প্রধান পথপ্রদর্শক। উপনিষদ তাঁর একমাত্র শরণ্য হলেও তিনি প্রচলিত উপনিষদের সবগুলিকেই শিরোধার্য করতেন না। বরং তিনি উপনিষদ থেকে মনোমত শ্লোক ও বাক্য বাছাই করে এবং কোন কোন শ্লোকের তাৎপর্য অমান্য করে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ চিন্তার অধিকতর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। যুবক কেশবচন্দ্রকে মহর্ষি পুত্রাধিক স্নেহ করলেও তাঁর মনঃপ্রকৃতির মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে সচেতন হন। পরে প্রবীণ মহর্ষি ও নবীন ব্রহ্মানন্দের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। মতপার্থক্য শেষপর্যন্ত মতবিরোধে পর্যবসিত হল। ১৮৬৪ সালের শেষভাগে অতিশয় প্রগতিশীল এবং আবেগপ্রবণ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখা দিল, নবীনেব দল কেশবের দিকে ঢলে পড়লেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ-পবিচালনা ও সম্পত্তির ভার নিজহস্তে গ্রহণ করলেন। এব ফলে ১৮৬৪ সালের পৌষ মাসে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগী নবীন ব্রাহ্মের দল (তাবকনাথ দত্ত, উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি) দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করলেন এবং তাব কিছুকাল পরে ১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (The Brahmo Samaj of India) স্থাপন করলেন। উদার ধর্মীয় মনোভাবের ফলে কেশবচন্দ্র সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেব সঙ্গ কবে তিনি ধন্য হলেন। "Jesus Christ: Asia and Europe" বক্তৃতায় এমনভাবে খ্রীস্টপ্রীতি প্রকাশ করলেন যে, শুধু বাঙালীরাই নয়, অনেক য়ুরোপীয় রাজকর্মচারী ও বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ আশা করেছিলেন যে, কেশব ত্বরায় খ্রীস্টান হবেন। খ্রীস্টানী অনুতাপ ও আদিম পাপভীতি, বৈষ্ণবদের লীলারস ও স্মরণকীর্তন, শাক্তের মাতৃভাব, মহম্মদীয় ধর্মের প্রবল ভ্রাতৃত্ববোধ

ও সাম্য—এ সমস্তই তিনি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আরও নানাপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি যুবসমাজকে প্রবলবেগে নিজ কক্ষপথে টেনে নিলেন। মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন কোন দিক থেকে কিছু রক্ষণশীল ও হিন্দুভাবাপন্ন ছিল বলে অধিকাংশ নবীন ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করলেন।[২০] ধর্মীয় উন্মাদনা ও অধ্যাত্ম ভাবাবেগে কেশব যেন মাতাল হয়ে উঠলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্রাহ্ম-প্রতিকূল প্রধান ব্যক্তিও বৈদ্য কেশবচন্দ্রকে সদ্‌ব্রাহ্মণের গৌরব দিতে দ্বিধা করলেন না।[২১] অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী স্বাভাবিক কারণেই কেশবচন্দ্রের অতি-প্রগতিবাদ, উদ্দাম ভক্তিভাব এবং খ্রীস্টধর্মানুরক্তি বিশেষ পছন্দ করতেন না। নানাকারণে কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অপ্রসন্নতা সঞ্চারিত হয়েছিল।[২২] একবার তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক পত্রে

২০. আদি ব্রাহ্মসমাজের এই বিব্রতাবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর একবার রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন: "আপনারা (অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজ) একটা গলির মধ্যে পড়েছেন, আর সেই গলির একদিকে হিন্দুরা, অন্যদিকে অত্যগ্রগামী ব্রাহ্মেরা চাপিয়া ধরিয়াছে।" (চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর,' পৃঃ ৫১৩)

২১. 'ধর্মতত্ত্বে' (পৃঃ ৬২) বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্য কেশবচন্দ্রকে সদ্‌ব্রাহ্মণ বলেই ঘোষণা করেন এবং তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যগ্রহণও অনুমোদন করেন।

২২. অবশ্য কেশবচন্দ্রের তিরোধানের (১৮৮৪) পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (মাঘ, ১৮০৫ শক) তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি প্রচুর প্রশস্তিবাক্য ব্যয় করা হয়েছিল। যথা—"এই শ্রীমান ধর্মপ্রচারক্ষেত্রে অটল পদে দাঁড়াইয়া যে কল্যাণসাধন করিয়াছেন, জগৎ তাহা কখনও ভুলিবে না। ইহার পবিত্র উপদেশ দীপ্ত দিবালোকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া অনেককেই মনুষ্যত্বের পথ দেখাইয়াছিল।"

কেশবচন্দ্রের অভিনব ধর্মমতের কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন :

"ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার (কেশবচন্দ্র) সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই-বা কোথায় ? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে ? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান্-দি-বেপটাইষ্টের দ্বারা বেপটাইষ্ট্ হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুশা, যীশা, সক্রেটিসের সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে?...... কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্যবিরোধই উপস্থিত হইতেছে।"

(শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৃ, ৮০-৮১)

এখানে দেখা যাচ্ছে, কেশবচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়, বিশেষতঃ খ্রীস্টান-ধর্মানুরক্তি মহর্ষির আদৌ পছন্দ হয় নি। কেশব ভক্তির আবেগের দ্বারা উদ্বেল হয়ে সর্বধর্মের মধ্যে সার সত্যের সন্ধান করেছিলেন—সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে। উপরন্তু বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর কেটেছে ; ফলে উচ্ছ্বসিত ভক্তিবাদ তাঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। সেই ভাবাবেশের ফলে তিনি এদেশের পুকুরের জলে জর্ডন নদীর তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেতেন, কখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্তনের অনুকরণে খোল-করতালসহ নগ্নপদে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নগরসঙ্কীর্তন করতে বেরুতেন এবং

সভক্ত ভক্তি-মুক্তির গান গাইতেন। কখনও খ্রীস্টানী অনুতাপানলে বিলাপ করতেন, কখনও-বা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের মতো পুলকে-প্রেমে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে পড়তেন, ঘন ঘন শ্রীহরির নামকীর্তন করতেন। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের এই ধরনের বাড়াবাড়িকে আদৌ সমর্থন করতেন না। কথাপ্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন :

"কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোন ধার ধারিতেন না, ভারতবর্ষের প্রাচীন culture-এর ভিতরকার কথা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; যতটুকু বুঝিতে পারিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চাত্ত্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিলে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন; নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতি ছাচে তাহার নাম দিলেন- New Dispensation—নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতি attitude লইলেন,-- এইখানে সমস্ত reform movement-টা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল। তিনি উপনিষৎ ছুঁইলেন না, বাইবেল পড়িলেন। তাই কি হিব্রু অথবা গ্রীক শিক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন?··· তিনি কীর্তন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তার নববিধানে কীর্তনের প্রসার বাড়িয়া গেল। এদিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের[২৩] কাছে আনাগোনা করিতে লাগিলেন।"[২৪]

('পুরাতন প্রসঙ্গ', নতুন সংস্করণ, পৃঃ ২৯৫-২৯৬)

২৩. শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে। *Indian Mirror* পত্রিকায় (২৮এ মার্চ, ১৮৭৫) এই সাক্ষাতের বিবরণ মুদ্রিত হয়েছিল। তার থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হচ্ছে: "We met one

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই বিরস মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ধর্মসাধনার মননের দিকটাকে অপ্রধান করে আবেগমূলক সাধনার দিকে কেশবচন্দ্র বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই একই সঙ্গে বুদ্ধ-খ্রীস্ট-মহম্মদ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার জন্য তিনি তাঁর অনুরাগী যুবসমাজকে প্রভাবিত করেন। তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খ্রীস্টান ধর্ম, অঘোরনাথ গুপ্তের (সাধু অঘোরনাথ) বৌদ্ধশাস্ত্র, গিরিশচন্দ্র সেনের ইসলাম শাস্ত্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের গীতা ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের ('চিরঞ্জীব শর্মা') গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মনিবন্ধ-সাহিত্যের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করেছিল—একথা স্বীকার করতে হবে। বলা বাহুল্য, তাঁদের কর্মোদ্যমের মূলে ছিল কেশব-ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক স্পর্শ।

কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের কোন কোন অংশ যেমন মহর্ষি ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মনঃপূত হয় নি, তেমনি তাঁর কোন কোন আচরণও অতি-প্রগতিবাদী তরুণ শিষ্যেরাও শিরোধার্য করতে পারলেন না।

(a sincere Hindu devotee) not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit." ('কেশবচন্দ্র সেন'-পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬৫)

২৪. শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথই নন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হন নি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে মাতাল স্বামী পূর্ণ এবং তার কেশবভক্ত স্ত্রী বিধুমুখীর মধ্যে কথোপ-কথনে কেশবচন্দ্র সেনকে 'স্যানজা' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে। স্ত্রী এজন্য সক্ষোভে বলল: "আমাদের পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন, পাপীর গতি শ্রীপতিতপাবন সেনমহাশয়কে কিনা তুমি স্যান্জা বল্লে?" মাতাল স্বামী বিদ্রূপভরে কেশবের আশ্রমকে 'সাঁইজির গির্জা' বলেছিল।

১৮৬৮ সালের দিকে অত্যন্ত ভাবাবেগের বশে কোন কোন কেশব-ভক্ত "কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন"।[২৫] এর ফলে কেশবগোষ্ঠীতে নরপূজা ও গুরুবাদের প্রকাশ্য অনুপ্রবেশ দেখে তাঁর তরুণ শিষ্যদের কেউ কেউ শঙ্কিত হলেন। তাঁরা মনে করলেন, কেশবচন্দ্র উন্নত ব্রাহ্ম আদর্শ ছেড়ে দিয়ে 'হিঁদুয়ানি'-র মধ্যে চলে যাচ্ছেন। কেউ কেউ এতে অতি স্থূল প্রতীকোপাসনা বা পৌত্তলিকতার গন্ধ পেলেন। ক্রমেই তরুণ ব্রাহ্মদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। কেউ কেউ তাঁর সংঘ ও সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই এই উত্তাপ মন্দীভূত হয়ে আসে। কেশবের ভক্তি ও প্রগতিশীল সমাজসংস্কারবোধ নবীন সমাজকে দীর্ঘদিন মাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ১৮৭২ সালের দিকে কেশবের ভক্তসমাজে আবার লোষ্ট্রপাত হল। কোনও বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ ভক্তের দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শেষপর্যন্ত ব্যাপার আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কেশবচন্দ্রের অনুকূলে তার নিষ্পত্তি হলেও তাঁর বিরুদ্ধে একদল নবীন ব্রাহ্মের প্রতিকূলতা বেড়েই চলল। শিবনাথ শাস্ত্রী হলেন এই উপদলের নেতা। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৪) তাঁর সম্পাদনায় কেশববিরোধী নবীনদলের মুখপত্র 'সমদর্শী' মাসিকপত্র প্রকাশিত হল এবং এতে কেশবের মত ও আচরণের প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। আরও নানা কারণে তাঁর সঙ্গে নবীনদলের প্রচ্ছন্ন বিরোধ ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। কিন্তু লোষ্ট্রপাত ক্রমে বজ্রাঘাতে পরিণত হল ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একে 'কুচবিহার পর্ব' বলে। ১৮৭৮ সালের ৬ই মার্চ

২৫. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ, সংস্করণ), পৃঃ ২৪৬

কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহার-রাজের বিবাহ সংঘটিত হলে, কেশবের বিরুদ্ধে তাঁর গোষ্ঠীর কেউ কেউ প্রবল প্রতিবাদ করলেন। তখন তাঁর কন্যার বয়স তের বৎসরের সামান্য বেশী। এই বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইনের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নি বলে তরুণদল তাঁকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র পদত্যাগে সম্মত হলেন না। তখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ ১৮৭৮ সালের ১৫ মে তারিখে কলকাতা টাউন হলে সমবেত হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন—কেশবের সঙ্গে তাঁদের বিরোধের এইভাবে নিষ্পত্তি হল। শিবচন্দ্র দেব, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি কেশববিরোধী ব্রাহ্মযুবকেরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। কেশবচন্দ্রও অল্পদিন পরে 'নববিধান' বা 'New Dispensation' নামে নতুন নামে নিজপ্রভাবাধীন আর এক ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করলেন এবং তার জন্য নতুন নিয়মকানুন তৈরী করলেন।[২৬] সে যাই হোক, ১৮৭৮ সালের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে তিনখণ্ড হয়ে গেল—মহর্ষি-প্রভাবিত আদিব্রাহ্মসমাজ, কেশব-প্রতিষ্ঠিত নববিধান এবং নবীনদলের ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের ঐক্য ত্রিধাবিভক্ত হলে শিক্ষিতসমাজের ওপর এর

২৬. কেশবের ঘোর প্রতিবাদী শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর এই সময়ের আচরণ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন: "ইহার কিছুদিন পরে (অর্থাৎ কুচবিহার বিবাহের পর) কেশবচন্দ্র তাঁহার নিজের বিভাগীয় সমাজের 'নববিধান' নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণীর গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইলেন।" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', নিউ এজ্ সংস্করণ, পৃঃ ২৪৮)

প্রভাবও কিঞ্চিৎ হ্রাস পেতে আরম্ভ করল এবং বাংলার ধর্মজাগরণের আর এক পর্বের শুরু হল—এটির নাম দেওয়া দেতে পারে বঙ্কিমপর্ব। হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুত্থান এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য—যাকে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল Hindu Revival বলেছিলেন।

বাংলার ধর্মচেতনায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব যে সুগভীর তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যেও তাঁর জ্বলন্ত ভক্তি ও অধ্যাত্মানুভূতির এমন প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে যে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ভাষণ এবং 'জীবনবেদ', 'মহোৎসব', 'সাধুসমাগম', 'আচার্যের প্রার্থনা' প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁর ভাবোন্মাদনাময় স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে। অবশ্য "কেশবচন্দ্রই প্রথম বাংলা ভাষায় মিস্টিসিজ্‌ম আনয়ন করেন" এই মন্তব্য সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও "তিনি ছিলেন ভাষা-শিল্পী—নূতন শব্দপ্রণয়নে ছিল তাঁহার অশেষ দক্ষতা",[২৭] তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ধর্মচিন্তায় প্রবলভাবে ভাবাবেগ ও ব্যক্তি-চিত্তকে মিশ্রিত করে, তিনি একটি বিশিষ্ট গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন, সেকথা তাঁর 'জীবনবেদ', 'সাধুসমাগম' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেই বোঝা যাবে। এখানে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কয়েকটি গদ্যানুচ্ছেদ উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১. "কেহ কোন কীর্তি রাখিতে চাও, কেহ প্রচারক হইবে মনে কর, কেহ ব্রত লইয়া লোকের মঙ্গল করিবে, এরূপ যদি মনে করিয়া থাক কিছুদিনের জন্য একবার বনে যাইতে হইবে। দ্বিজ হইতে চাও, একবার দণ্ডধারী হইয়া অন্ততঃ কয়েকপদ ঘুরিয়া আসিতেই হইবে। এই যে উপনয়নসংস্কারের

২৭. শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'কেশবচন্দ্র সেন' থেকে উদ্ধৃত

ব্যবস্থা হিন্দুরা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার উপকার আমাদিগকে লইতে হইবে। যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, ঈশ্বরের হাতে যদি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর যে জন্তু আছে, তাহাকে মারিতে হইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাড়াইতে হইবে। কিছুদিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড়মড় করিয়া হৃদয়ের হাড় ভাঙিবে, অবশেষে চমৎকার ভাগবতী তনু লাভ হইবে। বাঁচিতে যদি প্রয়াস কর, একবার মর। ঈশার ন্যায়, বুদ্ধের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় কষ্টযন্ত্রণার মধ্যে ফিরিয়ে এস।" ('জীবনবেদ')

২. "শাক্য, সর্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্যমন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে। তোমার যে এতবড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে! কিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল? বিশ্বজননী যখন তোমার সৃজন করিলেন, তখন তোমার প্রাণের ভিতর এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিলে?…হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবনবৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতরে নির্বিকার হরি কি অপূর্ব চিত্তরঞ্জক সমগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন।" ('সাধুসমাগম')

৩. "পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়রা, কলিকাতার পায়রা, কোন্নগরের পায়রা, ফরাসডাঙ্গার পায়রা গণনা করা যায়। আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার। গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ দিবে। তুমি বাঙালী কালো, তুমি

কান্তি আরো কালো, তুমি ইংরেজ সাদা। কিন্তু আকাশের সব এক। চিদাকাশে পায়রা-আত্মা উড়িল, জ্ঞানসূর্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গ সকল উড়িতেছে। হিংসা, নিন্দা নীচে, চিন্তা দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা মাটিতে বাস করিলেই হয়; আকাশে এসব কিছুই নাই। অতএব পায়রা হও দেখি, যোগবলে আকাশে উড় দেখি? আমাদের যোগিগণ পাখী হইতেন, ধ্যান-সমাধিতে চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেন। আমার মন-পাখীও উড়িয়া গেল।" ('মাঘোৎসব: পায়রা উড়ান')

এ ভাষার আবেগ, সাত্ত্বিকতা ও গভীর তাৎপর্য বাংলা নিবন্ধ-সাহিত্যের একটা বিচিত্র দিক খুলে দিয়েছে। ব্রহ্মানন্দের চরিত্র ও মন এই উক্তির মধ্যে দর্পণে-প্রতিফলনের মতো প্রকাশ পেয়েছে। এই রীতির সঙ্গে বিরাট পৌরুষের বীর্যোত্তাপ সঞ্চারিত হলে এটি একটি অভিনব রসরূপ লাভ করিতে পারত, যার বিশিষ্ট পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দের কোন কোন গদ্যরচনায় ফুটে উঠেছে।

কেশবচন্দ্রের প্রভাবের পর বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরবের দিন শুরু হল। হিন্দুর পৌরাণিক ঐতিহ্য, যা এতদিন খ্রীস্টান মিসনারী ও ব্রাহ্মগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তার আবার সুদিন এল। এই সময়ে পাশ্চাত্য দেশেও ভারতের পুরাণ, স্মৃতিসংহিতা, মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র, ষড়দর্শন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল। ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের যে অংশের প্রতি এতদিন ধরে শিক্ষিত বাঙালীরা বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, সেই পুরাণ ও মহাকাব্যকেন্দ্রিক আদর্শকে সশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র নবপ্রবুদ্ধ চিদাত্মক প্রবণতা ও মানব-হিতবাদের আদর্শে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণ শুরু করলেন; অনৈসর্গিকতা ও ভাবাবেগের উন্মত্ততা পরিহার করে তাঁরা বিশুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির নিরিখে

শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হলেন এবং ভগবান বাসুদেবের মানবাদর্শকে যুগ-ধর্মের দ্বারা শোধন করে নিয়ে ভাগবতী চেতনা ও নব্য-মানবতাবাদকে (neo-humanism) গীতাতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধকের সন্তানেরা—বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ, মহাতাপস অভেদানন্দ প্রভৃতি অগ্নিহোত্রীর দল ভারতের মনে এমন দিব্যদাহ সৃষ্টি করলেন যে, অগ্নিগর্ভ শমীশাখার প্রতি তন্তুতে বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেল, তার স্পর্শ সঞ্চারিত হল বাংলার জীবন ও সাধনায়, বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্যে। সে অন্যযুগের কাহিনী, অন্যভাবের ইতিহাস। (১৩৭৪)

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে সপ্রশংস বক্তব্য বুদ্ধিজীবী মহলে উপহসিত হলে বিস্ময়ের কারণ নেই। বাঙালীর আত্মনিন্দা অনেক সময় ব্যসনে পরিণত হয়। বিশেষতঃ বর্তমান কালের সাহিত্য-রসিকেরা প্রাক্তনের প্রতি প্রায়শঃই উন্নাসিক ঔদাসীন্য অবলম্বন করে থাকেন। তাঁদের মতে যা কিছু অধুনাতন, তাই-ই গ্রহণযোগ্য, যা কিছু ভূতকালের অন্তর্ভুক্ত, তাই-ই উপহাসের বিষয়। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথকেই নস্যাৎ করে দেবার সববিধ আয়োজন করা হয়েছে, সুতরাং শরৎচন্দ্রকে অবহেলার দ্বারা উড়িয়ে দেওয়াই তো স্বাভাবিক। ট্র্যাডিশন ও এস্‌টাব্‌লিশমেন্টের ঘোর বিরোধী 'ক্ষণভঙ্গবাদী' রসিকেরা পিছন ফিরে তাকাতে গররাজি, হাতে-হাতে নগদবিদায়ের প্রতি তাঁদের অপরিসীম আকর্ষণ। ইদানীং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা তাদের কাছে ভাবালুতা বলে মনে হবে। তাই তাঁরা বলেন, শরৎ-সাহিত্য বুদ্ধিমান পাঠককে আনন্দ দিতে পারে না। সুলভ আবেগ, সহজ করুণরস, মধ্যবিত্ত সমাজের দু'চারটে গলদ নিয়ে ভাবাবেশের অতিরেক—আর যাই হোক উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের মতে শরৎচন্দ্র বিশ শতকের গোড়ার দিকের মধ্যবিত্ত সমাজের যে ক্ষয়িষ্ণু চিত্র এঁকেছেন, তা দেশ ও কালের দ্বারা এতটা সীমাবদ্ধ যে, বাংলার বাইরে এবং একাল ছাড়া অন্যকালে তার কদর হওয়া দুরূহ। কথাটার যথার্থ অর্থ কি আলোচনা করা যাক।

শরৎ-সাহিত্য চোখের জলের সাহিত্য। সহজিয়া জীবনের করুণ রসের প্রাচুর্য তাঁর জনপ্রিয়তার তুরুপ। তিনি গার্হস্থ্য জীবনের বিশ্বাসযোগ্য আবেগবহুল রেখাচিত্র এঁকে সাধারণ পাঠক, কিশোর-কিশোরী এবং

গৃহিণীদের প্রচুর চোখের জল বর্ষণ করিয়েছেন। কিন্তু ট্র্যাজেডির গভীর বেদনা তিনি কি আঁকতে পেরেছেন? পেরেছেন দুঃখ-দুর্ভর জীবনের অন্ধকার-শীতল গ্লানিকে ফুটিয়ে তুলতে? তাঁর সাহিত্যে মহৎ বিরাট কিছু আমরা পেয়েছি কি?

কথাটা মিথ্যে নয়। বাস্তবিক বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মতো কল্পনার উৎসার তাঁর আয়ত্ত হয় নি, গল্প কাহিনীর প্লট-গঠনও চিক্বণতার পরিচয় দেয় না, চরিত্রগুলিও নিতান্ত পাঁচাপাঁচি মানুষ। হয় বালবিধবা, আর না হয় কুলত্যাগিনী মেয়ের দুটি-চারটি অশ্রুসজল প্রতিবাদ, কিংবা পল্লী-বাংলার প্রতিদিনের পাঁচালী, ভবঘুরে, কর্মহীন, অবসন্ন, স্ত্রীলোকের অঞ্চলস্থ গোটাকতক পুরুষচরিত্র—এই নিয়েই তো তাঁর কারবার। সুতরাং তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে এত কি ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের প্রয়োজন?

শরৎ-সাহিত্যে ভাবাবেগ আছে, বেদনার করুণরসের স্নিগ্ধ ছবি আছে, সমাজ ও সংস্কারের পীড়নে ক্ষতবিক্ষত নর-নারীর রক্তাক্ত বর্ণনাও যে নেই তা নয়। কিন্তু এতেই কি তাঁর বক্তব্য শেষ হয়ে গেল? এ-কথা মনে রাখতে হবে, শরৎচন্দ্র প্রচারের হাতিয়ার বেঁধে গণসেবায় কোমর বেঁধে অবতীর্ণ হন নি, বা সমাজ সংস্কারের বাসনায় সমাজতত্ত্বের বই ঘেঁটে উপন্যাস লেখবার জন্য ব্যাকুল হন নি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মূল কথা, মানুষের ছোটখাট সুখদুঃখ, আর বেদনাময় জীবনকথা—যে জীবন বৃহৎ মহৎ বিশাল নয়। মানুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের বিবর্ণ পাতায় যে এত অশ্রুলবণাক্ত আবেগ লুকিয়েছিল, তা কে জানত? ছোট ছোট ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের চেনা মানুষ যে কি রকম অচেনা হয়ে ওঠে, তা তাঁর গল্প-উপন্যাসে বোঝা যাবে।

ইদানীং আমরা কথাসাহিত্যের কাহিনীকে বুদ্ধির জারকরসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ভোগ করতে ভালবাসি। কিন্তু যতই মননকে প্রাধান্য দিই

না কেন, আমরা অনেকেই অল্পাধিক আবেগধর্মী। যে-আবেগ নিছক রোমান্টিক অশরীরী ভাবপ্রবণতা নয়,—যা তীব্র বেদনা ও কষ্টের ওপর ভিত্তি করেছে, তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত পাঠকের অন্তরে ঘা দেবেই। হোক সে কাহিনী দুর্বল, চরিত্রগুলি নিতান্তই সাধারণ—তবু যথার্থ দুঃখ-বেদনার কথা মহৎ বৃহৎ না হলেও পাঠকের অন্তরে আকর্ষণ করে থাকে।

কৌতূহল, সজাগ বুদ্ধির ঔৎসুক্য, সমাজতত্ত্বের নানা কথা, মানবমনের গভীর তলায় শায়িত নানা প্রবৃত্তির প্রতীকদ্যোতনা—ইত্যাদি অভিনব ব্যাপারে আমরা চমৎকৃত; তাই আধুনিক পাঠক বলবেন, শরৎ-সাহিত্য নেহাৎ আবেগতরল গল্পকথা মাত্র। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পাঠক যখন মুগ্ধ ভাবে কোন গ্রন্থের মধ্যে ডুবে যায়, তখন সে যেন তার হারানো কৈশোরেই ফিরে যায়। তখন তার সজাগ বুদ্ধির বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে। সে মুগ্ধভাব কেটে গেলে অবশ্য পাঠক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে বসে। কিন্তু সেই যে পাঠকচিত্তের চিত্রার্পিত মুগ্ধতা, জন্মান্তরীণ সুখ-স্বপ্নের মতো একটা মৃদু স্নিগ্ধ বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্নের কম্পন—শরৎ-সাহিত্য আধুনিক কালের যুগসচেতন পাঠককে সেই হারানো কৈশোরের জাতিস্মর মুহূর্তে নিয়ে যায়। পাঠক নিজেকে নতুন ক'রে শরৎচন্দ্রের গল্পের মধ্যে আবিষ্কার করে।

সুখপাঠ্যতা এবং অনায়াস-রসভোগ যদি কথা-সাহিত্যের বড় গুণ হয়, তা হলে শরৎচন্দ্র নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ গুণী। গল্প জমাবার এমন কৌশল, পরিচিত জীবনকে একটু মোচড় দিয়ে এমন বিচিত্র করে তোলার নিপুণতা এবং সাধারণ আবেগকেই পাঠকের অন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ ব্যবহার করা ইদানীন্তন অন্য কোন কথা-সাহিত্যিকের মধ্যে বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সমাজ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত, লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি তাঁর হুইটম্যান বা ডস্টয়ভ্স্কি-সুলভ সহানুভূতি, এসব কথা তাঁর সম্বন্ধে আমরা অনেক বলেছি এবং

শুনেছি। প্রতিদিনের সাধারণ সামান্য ব্যাপারকে মজলিসী গল্পের আধারে পরিবেশন করে পাঠক, লেখক এবং গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রের একীকরণের কৌশল আমরা জানি, একটু বেশী মাত্রায় জানি। তবু পাঠক-মহলে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এখনও প্রবল কেন? এটা বাঙালীর 'দুর্মরতম কুসংস্কার' বললে উচ্চতর রসবোধের পরিচয় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পাঠকের প্রতি বোধ হয় সুবিচার করা হয় না। সাধারণ পাঠকই উপন্যাস-কারবারীর লক্ষ্মী, রসজ্ঞ পাঠক 'কোটিকে গোটিক হয়'। করাঙ্গুলিতে গণনীয় উচ্চতর পাঠকের জন্যই কেবল কথা-সাহিত্যের ভিয়েন বসালে অচিরে কারবারীকে দেউলে হতে হবে। তাই শরৎ-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহক—সাধারণ পাঠককে গালি না দিয়ে শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসের মর্মকথাটি বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। কি সেই সাহিত্য, যা আধুনিক কালের রঙবেরঙের উপন্যাসের স্তূপাকার সমারোহ সত্ত্বেও পাঠকের মনে এখনও ঢেউ তুলতে পারে? শিল্পকলার মারপ্যাঁচ ছেড়ে দিয়ে সহজ দৃষ্টিতে শরৎ-সাহিত্য বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানুষের অন্তরের গোপন কথাটি শরৎচন্দ্র ধরতে পেরেছিলেন, আর তাকে সহানুভূতির রঙে চিত্রিত করেছিলেন, বিবর্ণ বাস্তবের চারদিকেও রোমান্স ও করুণ রসের আবরণ টেনে দিয়েছিলেন—যে করুণ রসকে প্রকাশ্যে আমরা উপহাস করলেও মনে মনে তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি না। মানুষের হৃদয়বৃত্তি যেদিন ক্যান্সার জাতীয় ব্যাধি বলে গণ্য হবে, আবেগ মানসিক বৈকল্যের চিহ্ন বলে নির্দিষ্ট হবে, সেদিন শরৎ-সাহিত্যের মতো পৃথিবীর বারো আনা সাহিত্যের সমাধি হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও সেদিন আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, এবং এখনও পাঠককে শরৎ-সাহিত্যে দেবদাস, সতীশ, সুরেশ, শ্রীকান্ত, চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, অচলা, রাজলক্ষ্মীর সুখ-দুঃখের অংশভাগী হতে হয়।

শরৎ-সাহিত্যের আয়ুষ্কালের পরিধি নিয়ে সম্প্রতি কেউ কেউ সামুদ্রিক বিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেছেন। এ'রা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন—শরৎ-সাহিত্য একান্ত ভাবে দেশকালের অধীন, সুতরাং এই উদ্বেল সমাজ-সমস্যার সমাধান হলে এ সাহিত্যের কানাকড়ির মূল্যও থাকবে না। উপরন্তু এতে একটা বিশেষ সময়ের বাঙালী-সমাজের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে, সুতরাং এ সমাজের বাইরে এর কদর হওয়া দুরূহ। শরৎ-সাহিত্যের পুনর্বিচারের ভূমিকা নিয়ে নতুন যুগের সমালোচক বলছেন যে, শরৎ-সাহিত্য এ যুগের বাংলা দেশে জনবল্লভতা লাভ করলেও, গ্রন্থে বর্ণিত সমাজ ও পারিবারিক কাহিনীগুলি এমন ভাবে বাঙালী-শিলমোহর করা যে, অন্যত্র এর জনপ্রিয়তা হওয়া সম্ভব নয়। এ সমস্ত মতামত যে যুক্তিসহ নয়, তার প্রমাণ সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, আর্যভাষা ও দ্রাবিড়ভাষা—সবত্র শরৎ-সাহিত্য অনূদিত হয়েছে, শরৎ গ্রন্থাবলীর নানা খণ্ড হিন্দী তামিল প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, শরৎ-সাহিত্যের স্বরূপ, শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য-সাধনা, তাঁর পত্রাবলী প্রভৃতি নানা খুঁটিনাটি তথ্য প্রধান প্রধান প্রাদেশিক ভাষায় একাধিকবার অনূদিত হয়েছে। এখনও ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় শরৎ-গ্রন্থ 'বেস্ট্ সেলার'। বহু সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কথাকার—তা তিনি উত্তরাপথ বা দক্ষিণাপথ, যে ভাষাভাষী হোন না কেন, নানা দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছেন। শরৎচন্দ্র যদি সঙ্কীর্ণ বাঙালীয়ানার বাতায়ন থেকে জীবনকে দেখতেন, তা হলে কাশী-কোশল, কলিঙ্গ-কেরলে তাঁর এত ভক্ত দেখা যায় কেন? বাঙালীর ঘরের গল্প গুজরাটী পাঠককে মুগ্ধ করে কেন? কেনই-বা তামিলভাষী পাঠক বিনিদ্র রাত্রিতে তেল পুড়িয়ে শরৎচন্দ্রের বাঙালী সমাজ ও পরিবারের গল্প পড়েন? ভারতের বাইরেও তিনি কি সাহিত্যিক হিসেবে অজ্ঞাতকুলশীল? ইংরেজ-ফরাসী-ইতালী

ভাষায় তাঁর গ্রন্থের তর্জমার কথা কেই-বা না জানে? শরৎ-সাহিত্য বাঙালী-জীবনের সাহিত্য তাতে সন্দেহ নেই, যেমন হার্ডির সাহিত্য ইংরেজ-জীবনের সাহিত্য। কিন্তু বিশেষের আধারেই তো নির্বিশেষের পরিবেষণ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে 'সাধারণী-করণ' বলে, তাই হচ্ছে সাহিত্যের একটা আদিম বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্র বিশেষ দেশ-কালের আধারে, বাঙালী সমাজ-পরিবারের বাঁধা ছকে কাহিনী গ্রন্থন করেছেন বটে, কিন্তু তার একটা দেশ-কালাতীত প্রভাবও আছে। কালাতীত কিনা তা অবশ্য বলা সহজ নয়। কারণ আজকে আমরা বর্তমান কালসত্তার সহব্যাপী। আগামী কাল মানুষের রূপ, রীতি ও রুচির পরিবর্তনে কোন্ সাহিত্য ধোপে টিঁকবে তা এখন বলা যায় না।

শরৎচন্দ্র শুধু অবক্ষয়ী বাঙালী-সমাজে বন্দী হয়ে নেই, বৃহত্তর ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছেন নানা ভাষার মধ্যে, নানা জনের হৃদয়ে—এই জন্যই তাঁকে আমরা বাঙালী-জীবনের পাঁচালীকার বলে শুষ্ক প্রণাম ক'রে বিদায় দিতে পারি না। হোমরের মহাকাব্যের প্রভাব একযুগের গ্রীসে-রোমে যে-রকম ছিল, আজকের বিশ্ব-সমাজে সে-রকম নেই। সমকালীন হোমর আজ হারিয়ে গেছেন, তিনি এখন বিশ্বকালীন হয়ে উঠেছেন। কবিগুরু বাল্মীকি ও প্রাজ্ঞ বেদব্যাসের মহাকাব্যেও তাঁদের যুগ-মানসই প্রাধান্য পেয়েছিল, তবু এ-কালের পাঠক তার থেকে শান্তি ও সান্ত্বনা সংগ্রহ করেন কি করে? প্রত্যেক যুগের সাহিত্য সেই যুগের ও সেই দেশের হয়েও যুগান্তরকে অবধারণ করতে পারে, অন্য দেশকে বন্ধু বলে কাছে টেনে নিতে পারে। শরৎ-সাহিতে এই গুণটি নিশ্চয় আছে, তা নইলে অন্য ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁরা এত জনপ্রিয়তা কেন? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং শরৎচন্দ্র—এঁদের গ্রন্থই অবাঙালী পাঠকের বিশেষ পরিচিত, তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের ভক্তের সংখ্যাই সর্বাধিক। একথা সত্য বলে

মনে হবে, যদি কেউ বাংলার বাইরের কোন বড় রেলস্টেশনে বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে ক্রেতাদের বই কেনা লক্ষ্য করেন। ইদানীং সস্তা হিন্দী পকেটগ্রন্থের দৌরাত্ম্যে অবশ্য যথার্থ গল্প-উপন্যাসের কাটতি কমে গেছে, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র খর্ব হয় নি। একেই বলে বহুর মধ্যে বেঁচে থাকা। অবশ্য জনপ্রিয়তাকে যদি সাম্প্রতিক সমালোচক 'ভাল্গার' বলে পরিত্যাগ করতে চান, তা হলে আমরা নাচার। সূক্ষ্ম স্থূল যাই হোক না কেন, জনপ্রিয়তা সাহিত্যের শেষ আপীল। সেই আদালতে শরৎচন্দ্র জয়ী হয়েছেন। (১৩৭২)

বর্তমান বাংলা কবিতা-প্রসঙ্গ

বর্তমান বাংলা কবিতার পাঠক হিসেবে কতকগুলি জটিল প্রশ্নের সামনে এসে বাধ্য হয়ে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করতে হয়েছে। এই শতকের তিরিশ বছর পার করে বাংলা কবিতা এমন নতুন রূপ-রীতি ও মনন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল যে, সে যুগের কাব্যরসিকেরা নবজাতককে প্রশংসার শঙ্খধ্বনি করে বরণ করে নিতে বিশেষ উৎসাহী হন নি। এই অদ্ভুত বাক্‌পুঞ্জের প্রায়-অবোধ্য শব্দসজ্জা কারো কারো কাছে শরশয্যা বলেই মনে হয়েছিল। তখন রবীন্দ্র-প্রভাবের সম্মোহন-জাল ছিঁড়ে 'নতুন কিছু করা'র মতো অভিনব কাব্যকল্প সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল। তিরিশ সালের পর প্রায় আরও তিরিশটা বছর গড়িয়ে গেল। একদা যার স্খলদ্ পদচারণা হাসির কারণ হয়েছিল, এখন সেই আধুনিক বাংলা কবিতা শুধু যৌবনের দার্ঢ্য নয়, প্রবীণতার পক্বকেশী মনন-ধর্ম লাভ করে সাহিত্যসত্রের পংক্তিভোজে নিজের যথাযোগ্য ঠাঁই করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছায়াতলে বসে যে সমস্ত উপগ্রহের দল নির্ভর-কাব্যের বাঁধা পথে প্রথাসিদ্ধ রৌদ্র সেবন করছিলেন, তাঁরা বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। বুঝলেন—রবীন্দ্র-প্রভাবকে স্বীকার করে এবং অনুসরণ করে কাব্য লিখবার নিরাপদ দুর্গে এই আধুনিক কবিদের গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। তাই সাবেকী দল কখনও সুলভ ভাবালুতা, প্রকৃতি-তন্ময়তা—কখনও-বা বয়ঃসন্ধিকালের অপক্ব প্রেম বা স্বাদেশি-কতার সুসহ উত্তাপ সৃষ্টি করে কিছুকাল পাঠকসমাজের চিত্তবৃত্তি নিজের কক্ষে টানবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 'যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' তাই এঁদের মধ্যে যাঁরা সুপাচ্য হৃদ্‌বৃত্তির সঙ্গে

দুষ্পাচ্য বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ চর্চা করছিলেন, তাঁরা অবলীলাক্রমে পথ বদলালেন। তরুণ কবিদের বাক্‌রীতিকে চুনের কলপের মতো তাঁরা আপন-আপন ধূসর প্রত্যয়ের ওপর লেপন করলেন—যার ছোপ এক ধোপেই খসে পড়ল। তরুণ কবির দল দেশের-দশের গালমন্দে ভাঁড়ার বোঝাই করে এবং সম্ভবতঃ কিছু উৎসাহিত হয়ে চতুর সম্পাদক এবং নিরীহ পাঠকেব বুক চাঁদমারি করে চটকদারী কাব্য-শায়ক নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ গতায়ু হলেন। মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ নতুন পথের দিশারী হয়ে এলেও ধ্রুপদ-খেয়ালের খেয়াতরী বেয়েই সারস্বত তীর্থে ভিড়লেন। কলেজে-পড়া ছাত্রের দল তাঁদের মধ্যে নতুন জীবনবাদ এবং অভিনব বাক্‌প্রয়োগ-রীতি লক্ষ্য করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ইংরেজী কাব্যরসের গঙ্গোদকে যাঁদের ডেকাডেন্ট্ যুগের চিত্তমালিন্য দূরীভূত হয়েছিল তারা নবীন কবিদের মাঙ্গলিক রচনা করলেন। পত্র-পত্রিকায় আধুনিক কবিতা আসর জাকিয়ে বার দিয়ে বসল, ক্ষীণতনু কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে লাগল, কারো কারো কাব্য-সঙ্কলনও পাঠকের কাছে সহজে ধবা দিল, পাঠককে আর সাময়িক পত্রিকার খিড়কির পথে আড়ি পাততে হল না। জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যু আধুনিক বাংলা কবিতাকে মৃত্যুঞ্জয় করল। অধুনা পুরাতন কবিগোষ্ঠীর কবিতা ও কবিতাপুস্তক বিসর্জনান্তে প্রতিমার কাঠামোর মতো কোনক্রমে আত্মরক্ষা করছে, আত্মহত্যা করলেও তাদের সদ্‌গতির অভাব হত না।

বাংলা কাব্য নতুন পথে পদচারণায় সিদ্ধকাম। গত তিন দশকের মধ্যে কবিতার বস্তু-উপাদান, ভাব-সংবেগ, শব্দকল্প, প্রতীকতা,—এক কথায় কাব্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, উভয়ের মধ্যেই বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটে গেল। নবীনদের গুরুস্থানীয় কোন কোন কবি রবীন্দ্র-পক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করে উচ্চ:জয়ধ্বনি সহ অনভ্যস্ত পথে নামবার ঘোষণাপত্র পাঠ

করলেও তাঁরা উনিশ শতকী রোমান্সকে পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারলেন না। লাভের মধ্যে হোল, রবীন্দ্রনাথের সহস্রাংশু-বর্ণাঢ্য রোমান্সের স্থলে অসুস্থ মনোবিকার-জাত 'মরবিড' ধূসরতা নতুন রোমান্সের ভাবমণ্ডল রচনা করল। আর একদল কবি চিত্তগহনের সুখসুপ্ত অবচেতন কামনাগুলিকে বিদেশী পুরাণ-কোরান বিজ্ঞান-ইতিহাসের চটকদারী যুক্তির লেবেল দিয়ে সাম্প্রতিক হবার সবিশেষ চেষ্টা করলেন। কেউ-বা হাতুড়ি-হাতিয়ার আর রক্তধ্বজ বহন করে গণদেবতার বস্তি-যজ্ঞশালায় ব্রাত্যস্তোম মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করলেন। এঁরা যে বাক্‌রীতি অবলম্বন করলেন, যে ভাষা ও ছন্দ ব্যবহার করলেন—বক্তব্যকে যেভাবে কৌটিল্যের প্যাঁচ দিয়ে ঘোরালো করে তুললেন, তাতে হৃদয়প্রবৃত্তি নামক প্রাক্তন কুসংস্কারের তো কথাই নেই, এমনকি সজ্ঞান চিত্তপ্রবৃত্তি পর্যন্ত অনেক সময় এঁদের মানস-সরোবরের থৈ পায় না। অর্থাৎ আমরা গত এক শতাব্দী ধরে মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কাব্যের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলাম, এই নব-কালাপাহাড়দের কলমের খোঁচায় তাঁর জীবনান্ত হবার উপক্রম হল।

তাতে ক্ষোভের কারণ নেই; পরিবর্তন জীবধর্ম, সাহিত্যেরও ধর্ম। যুগভেদে সাহিত্যের রীতি বদল হয়, বিষয়বস্তুরও রূপান্তর ঘটে। বাংলা কাব্য যদি রবীন্দ্রভাবমণ্ডল পরিত্যাগ করে নতুন পথের সন্ধান করতে পারে, তবে তাতে তার প্রাণের লক্ষণই ফুটে উঠবে। কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসেবে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার রসাস্বাদনের পক্ষে প্রায়শঃই যে বাধাগুলি পেয়েছি, এখানে সংক্ষেপে তা নিবেদন করি। প্রথমে, এমন চিত্রকল্প, ভাবানুষঙ্গ, শব্দপরম্পরা এঁরা ব্যবহার করে থাকেন যে, যে-পাঠকের কাব্যপ্রতীতি সাধারণ বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাঁর পক্ষে এই শব্দকল্পদ্রুম থেকে রসফল পেড়ে নেওয়া বড় একটা ভাগ্যে ঘটে না। এ যেন চক্রচারী তান্ত্রিকগোষ্ঠীর গূঢ়ার্থবাহী বীজমন্ত্র

—'ওঁ হিলিহিলিং, ওঁ কিলিকিলিং'। চক্রে না বসলে যেমন তন্ত্রের অদ্ভুত বীজমন্ত্রগুলির তাৎপর্য বোঝা যায় না, ঠিক তেমনি এঁদের রসগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলে এই সমস্ত আপাতঃ-অর্থহীন বাক্‌পুঞ্জের স্বরূপ বোঝা যায় না। অবশ্য সাহিত্যের কালাপানিতে ডুব দিয়ে মুক্তা লাভের সম্ভাবনা থাকলে পাঠক সম্প্রদায় আধুনিক কবিতার হাঁটুজলেও তার সাধনা করতে রাজি আছেন। কিন্তু সমস্ত অরণ্য ঢুঁড়েও যদি একটি অম্লাক্ত বদরি ব্যতীত কোন অমৃতফল না পাওয়া যায় তবে সাধারণ পাঠক কিসের প্রলোভনে এই সমস্ত উদ্ভট শব্দাম্বুধি মন্থন করতে যাবেন? এঁদের কবিতার মর্মোদ্ধার করলে জীবন সম্বন্ধে কোন একটা বৃহৎ স্বরূপ, একটা গভীর প্রত্যয়ের সীমান্ত-সন্ধান অন্ধকার কক্ষে অনুপস্থিত কালো বিড়াল খোঁজার মতো বিড়ম্বিত হয়ে পড়ে। কোন একটি কবির অবচেতন মনের বিজৃম্ভণ লক্ষ্য করে ভাবালু হবার মতো মানসিক অবকাশ সব পাঠকের নাও থাকতে পারে। প্রভূত চেষ্টা করে অদ্ভুত 'অ্যানালজি'-র চমক দিয়ে, শব্দের অভিধেয়ার্থকে উল্টে দিয়ে, অন্বিতার্থকে ইচ্ছামতো দূরে টেনে নিয়ে যাওয়াতে কৌশল প্রমাণিত হয়, কবিত্ব নয়। এবং শুধু বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কাব্যকে অমরত্ব দিতে পারে না—তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়তঃ, এঁরা প্রায়ই ট্র্যাডিশনকে নাসিকাকুঞ্চনের দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। পশ্চিম সাগরের লবণজল সেবন করে এঁরা এদেশের দীর্ঘকালাশ্রিত ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দিয়েছেন। যার সঙ্গে জাতির জীবন ও মানসের নিবিড় সাহচর্য নেই, তা দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে না। অবশ্য আজকের পৃথিবীর স্থানকালের বন্ধন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, কোন একটা ভৌগোলিক ট্র্যাডিশন চিরকাল অচল হয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু বহিরাগত বিষয়বস্তুকে জাতিমানসের অঙ্গীভূত করে নেওয়া দরকার, যেমন করেছিলেন মধুসূদন।

তৃতীয়তঃ দুর্বোধ্যতা যেমন কাব্যের মারাত্মক ত্রুটি নয়, তেমনি

সুবোধ্যতাও কাব্যের পরম সম্পদ নয়। রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের সদুপদেশগুলি বেশ সুবোধ্য। তাই বলে কেউ তাদের কাব্যের কোঠায় ফেলবে না। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধির ব্যায়াম-কসরত দেখাবার জন্য দুরূহ, অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় নেন, অথবা অর্থকে সম্প্রসারিত করে এমন দূর-দুর্গম স্থানে নির্বাসিত করেন যে, পাঠক তা থেকে একটা বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তা ও মননের সাক্ষাৎ পেলেও কবিতার রস থেকে বঞ্চিত হন, তাঁরা কালধর্মে বিস্মৃত হলে পাঠককে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বিশুদ্ধ বুদ্ধিমার্গ কাব্যকবিতাকে চমৎকারিত্ব দান করতে পারলেও পাঠকহৃদয়ে তার স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত। সুতরাং কবিতা যদি জলবৎ তরল নাও হয়, তবু দুর্বোধ্য শব্দ-সমষ্টির "অক্ষর-ডম্বর" কবিতাকে কালজয়ী করতে পারে না। কবিতার সমগ্র শরীরের মধ্যে একটা প্রতীতিগত মোটামুটি সঙ্গতির সামঞ্জস্য চাই। যেখানে তা না থাকে, থাকে শুধু বুদ্ধির অহঙ্কার, সেখানে কাব্য পাঠক-হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না পেরে হরিজনদের মতো নাটমহলের বাইরেই অবস্থান করে।

কথা উঠবে, আধুনিক কবিরা কাব্যের শিল্পসত্তা বা 'ক্র্যাফ্‌টস্‌-ম্যানশিপ্‌'-কে কত বিচিত্র ভঙ্গিমায়, ঐশ্বর্যে ভরিয়ে তুলেছেন। কিন্তু একথা তো ভুলতে পারি না যে, কবিতা ক্র্যাফ্‌টস্‌ নয়, যে তাতে আঙ্গিকের চটক্‌দারী চমৎকারিত্ব চাই-ই। বরং শ্রেষ্ঠ কাব্যে 'ক্র্যাফ্‌টস্‌ম্যান্‌শিপে'র বাহুল্য বর্জিত হওয়াই উচিত। শ্রেষ্ঠ কাব্য যে দীর্ঘজীবী হয়েছে, তার প্রধান কারণ—ক্র্যাফ্‌টস্‌ম্যান্‌শিপ্‌ নয়, বলার ভঙ্গী নয়,—মানুষের জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহৎ উপলব্ধি কাব্যকে কালজয়ী করে। আধুনিক কবিতা কালজয়ী হবার সেই শিলমোহর সঙ্গে আনতে পেরেছে কি?

আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছিলাম।

(১৩-১)

সম্প্রতি বাংলা দেশে, বিশেষতঃ নাগরিক সংস্কৃতিকেন্দ্রে নাট্যাভিনয় রীতিমতো একটি চিত্তাকর্ষী ও আশাপ্রদ শিল্পান্দোলনে পরিণত হয়েছে। কলকাতা ও শহরতলীর নানা স্থানে প্রগতিবাদী তরুণের দল ছোট বড় নাট্যসংস্থার মারফতে কখনও নিজেরা নাটক রচনা করে, কখনও-বা প্রগতিশীল নাটক নিয়ে নতুন আঙ্গিক অনুসারে অভিনয়কলার পরিবর্তন সূচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ ব্যাপার শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর থেকে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কুশীলবেরা তখন ভক্তিরসার্দ্র পুরাতন পৌরাণিক নাটক, রৌদ্ররসপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক এবং অশ্রুপাতপ্রবণ পারিবারিক নাটকের সহস্র-এক-রজনীর অভিনয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন,—বিদগ্ধ দর্শকেরাও নাটককে চিত্তবিনোদনের সুলভ উপায় মনে না করে প্রেক্ষাগৃহে নতুন নাটক ও নতুন অভিনয়কলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য বোধ করছিলেন। ক্রমে সামাজিক চেতনা কিছু কিছু সৌখীন অভিনেতাদের উচ্চকিত করে তুলল। মহাযুদ্ধান্তে যখন বিভ্রান্ত মন শিল্পের মূল্যায়ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছে, তখন নবীন অভিনেতা ও নাট্যকারেরা অভিনয়ের মধ্যে আর পুরাতনের জীর্ণ অনুবৃত্তি সইতে পারলেন না; তাঁরা নটপটের নয়নমনোহর যাদুবিদ্যায় সম্মোহিত হতেও গররাজি হলেন। ফলে গত দু' দশকের মধ্যে নাট্যামোদী দর্শক যেমন নতুন নাটক সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন, তেমনি নাট্যকার, প্রযোজক ও নাট্য-সংস্থা সেই প্রয়োজনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে এসেছেন—জাতির মনোজীবন সম্বন্ধে এটি একটি শুভ বার্তা। কারণ নাটকাভিনয়ে

একটা গোটা জাতির মনের রূপ ধরা পড়ে। এর সঙ্গে নাট্যকার, কুশীলব, অধিকারী মশাই, সহৃদয় 'সামাজিক', লভ্যাংশভোগী কর্মকর্তা এবং ছোটখাট কর্মীর দল জড়িত আছেন। নাটকাভিনয় শ্রুতি ও দৃষ্টির বস্তু, এবং মুখ্যতঃ চিত্ত-বিনোদনের উপায়; তবু এর সঙ্গে জাতির অধিমানসের যোগটি সহজেই চোখে পড়ে। এক যুগের দর্শকেরা নাটকে কি চাইত এবং কেন চাইত—সেই চাওয়ার পটভূমিকায় কোন্ সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল—এই সমস্ত তথ্য নাটকের আলোচনায় আপনিই এসে পড়ে।

আধুনিককালে অপেশাদারী নটগোষ্ঠীর মধ্যে বিষয়বস্তুর যে আমুপূর্বিক পরিবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য ইদানীন্তন নাট্যকলাতে যে খুব একটা অভিনবত্বের আয়োজন হয়েছে তা মনে হয় না। বরং পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ দর্শকের চিত্তে বোম্বাই যাদু সৃষ্টির জন্য বাস্তব জীবনের অবিকল অনুকৃতির হাস্যকর চেষ্টা করছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়ের দ্বারা আর দর্শকের মন আবর্ষণ করতে পারছেন না, তখন বাধ্য হয়েই বাস্তব দৃশ্যপটের অনুকরণমানসে বিশুদ্ধ ভোজবাজির আশ্রয় নিচ্ছেন। এতে কিন্তু নাট্যসাহিত্যের উন্নতি সূচিত হয় না। কিছু সূত্রধর, কর্মকার, ওস্তাগর এবং বিজলীকর্মীর অন্ন সংস্থান হয়—এইটুকুই যা সান্ত্বনা। কিন্তু অধুনা যাঁরা নবনাট্য আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা আঙ্গিকের ছেলেমানুষী একেবারে বর্জন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য—এখনও কি আমরা যথেষ্ট সাবালক হই নি যে, পার্সী থিয়েটারের দ্বারা মন ভোলাতে হবে? আঙ্গিক নয়, নাটকীয় বক্তব্যই এঁদের অভিনয়ের নিয়ামক সূত্র। তাই এঁদের প্রেক্ষাগারে অভিনবত্বের চমক নেই, নিতান্তই সাদামাঠা রঙ্গসজ্জা নিয়ে পাদপ্রদীপের তলে আত্মপ্রকাশ করতে এঁরা কুণ্ঠিত নন। কারণ এঁরা বিশ্বাস করেন, নাটকের মূল কথা—একটা বিশেষ ক্রান্তিকালের

মানস-প্রতিফলন ; সমাজবোধ ও চেতনার সঙ্কট আজ মানুষকে যে কোন্ বিনাশের তমোগহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে---সেই শঙ্কা, সংশয় ও সংমোহকেই এঁরা নাটকে ফুটিয়ে তুলতে চান।

আধুনিক সমাজ যে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তার কতকগুলো স্থূল বস্তুগ্রাহ্য হেতু আছে। যেমন---মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা ; জনতার আশাহীন, আনন্দহীন জীবনবৃত্ত ; রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের অপকৌশলে দরিদ্রের মুখ থেকে বণিক সম্প্রদায়ের ভোগ্যবস্তু অপহরণের চেষ্টা—এগুলি সমাজের বাইরের দিক। নাট্যকারগণ ও দর্শক-শ্রোতারা অধিকাংশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বলেই হোক, অথবা আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা মধ্যবিত্তের ওপর দিয়ে রোলার চালিয়ে দিচ্ছে বলেই হোক—সাম্প্রতিক নাটকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হতাশাটাই বড় বেশি ফুটে উঠেছে। এই হতাশা থেকে অবক্ষয়ী মনোভাবের জন্ম হয়, ক্রমে চেতনাকে একটা প্রকাণ্ড নেতিবাদী অন্ধকার একেবারে ঢেকে ফেলে। আমরা শহর ও শহরতলীতে অভিনয় দেখার জন্য আমন্ত্রিত হলে সেখানে প্রায় এই ধরনের অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি দেখি। এর কারণ স্বাভাবিক। আধুনিক যুগে মূল্যাবনতির বিষবাষ্প যদি কাউকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে থাকে, তবে তা হচ্ছে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সুতরাং নতুন নাটকে জীবনের এই দিকটা তো আর্তনাদ করবেই। একদা দেশ বিভাগ নিয়ে একাধিক সুলিখিত নাটক অভিনীত হতে দেখেছি, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকাতেও নতুন নাটক এই শতকের চতুর্থ দশকে নিতান্ত কম অভিনীত হয় নি। তারও আগে পরশাসনের মর্মজ্বালা জাতীয়তাবাদী নাটকের প্রধান উপাদান ছিল। এখন চারিদিকে যে সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে, সাম্প্রতিক নাটকে তার প্রতিফলন দেখা দেবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

সাম্প্রতিক নাটকের আর একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে। কোন কোন

নাটকে একক ব্যক্তির অহংবোধ প্রতীকের দ্বারা নতুন ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যূথবদ্ধ সমাজচেতনার সঙ্গে ব্যক্তির অস্মিতার বিরোধ—ফলে অসহায় ব্যক্তির ব্যর্থ হাহাকার নাটকে গূঢ় গহন অতিব্যঞ্জনার সৃষ্টি করছে, এবং প্রায়ই সেই প্রচেষ্টা প্রতীকের দ্বারাই আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হতে চেষ্টা করছে। প্রেম, কর্তব্য, আচরণ—এগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও তারও পরিপার্শ্বের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। সেই যোগ যখন নানারূপ বৈষম্যের ফলে বিয়োগে পরিণত হয়, তখন অসহায় ব্যক্তি কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনও প্রতীকতার মারফতে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। আজকাল মুষ্টিমেয় কয়েকজন নাট্যকার ব্যক্তির নিঃসঙ্গ বেদনাকে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করছেন।

ইদানীং চেতনার নানা গূঢ় এষণা, মগ্নচেতনার তথাকথিত ভাবদ্বন্দ্ব, ক্রিয়াবাদী মন এবং নিষ্ক্রিয় ভাববিকার—এই ধরনের নানা মানসিক ব্যাপারও নতুন নাটকে বেশ বড় স্থান দখল করেছে। অবশ্য চিদ্বস্তু যে জড়বস্তুরই কার্যকারণাত্মক পরিণাম—এ বিশ্বাস কেউ কেউ পোষণ করে থাকেন। আমাদের মানসিক বিপর্যয়, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার অক্ষমতা—এসবের মূলে আছে কতকগুলি বস্তুপ্রত্যয়। মনের এই জটিল পরিস্থিতির স্বরূপ নিয়েও কোন কোন নাট্যকার নতুন পথের ইঙ্গিত দিতে চান।

সম্প্রতি দেখছি কেউ কেউ হাল আমদানি 'এ্যাবসার্ড ড্রামা' বা উদ্ভট নাটিকাও রচনা করছেন—দু'এক স্থলে এর অভিনয়ও হচ্ছে। ব্যক্তি-চেতনার বিশুদ্ধ নৈরাজ্যের ফলে চেতনা ও চরিত্রের 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' আজ ভেঙে যেতে বসেছে। আমাদের মন, ক্রিয়া ও আচরণের সঙ্গে যেন কিছুতেই মিল ঘটানো যাচ্ছে না। ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সমস্ত উদ্ভট নাটকের ঘটনাগ্রন্থন, চরিত্র ও পরিণামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের বাহ্যিক যোগাযোগ খুব স্পষ্ট নয়। এ-ও একপ্রকার ব্যক্তিদ্রোহ—বিষয়ের বিরুদ্ধে বিষয়ীর আর্তনাদ। এই ধরনের নাটক

ও অভিনয় এখনও নীহারিকার পর্যায়ে আছে। তাই বৃহৎ 'সামাজিকের' সঙ্গে এখনও এর বিশেষ যোগাযোগ ঘটে নি।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, নবীন কবির দল কাব্যনাট্য নামে একপ্রকার আবেগধর্মী, গীতিরসার্দ্র ছন্দোময় নাটিকা রচনা ও অভিনয়ে কিছু কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও রোমান্টিক নাটকে গীতিছন্দ যদি বাহন হতে পারে, আধুনিক যুগ ও জীবনকে সেই ছন্দপ্রকরণ কেনই-বা বেগ দান করবে না? সাম্প্রতিক নাটকে এ-ও একটা নতুন পরীক্ষা—আমাদের সাম্প্রতিক নাটকের ইতিহাসে ও বিবর্তনে তার দাম কম নয়।

কতকগুলি সামাজিক হেতু আর তার সঙ্গে ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক যে নাট্যসাহিত্যের বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে তাতে সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে নতুন নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শকদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ফলে এ বিভাগে বিশেষ জীবন-চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। তিন-চার দশক পূর্বে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নানাধরনের উন্নতি ও ক্রিয়াকর্মের প্রভূত আয়োজন হলেও নাটক ছিল পেশাদারী অভিনেতা এবং বণিগ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন স্বত্বাধিকারীদের এক্তিয়ারভুক্ত। রুচিবান ব্যক্তি এগুলিকে মনে করতেন জনমনোরঞ্জনের স্থূলতম উপাদান এবং এর প্রতি কেমন একটা উন্নাসিক তাচ্ছিল্য বোধ করতেন। তাঁরা স্বস্তি পেতেন শান্তিনিকেতন-গোষ্ঠীর আভিজাত্য-মণ্ডিত নৃত্যনাট্য ও নাটকাভিনয় দর্শন করে—যার নটনাথ ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ইদানীং নাটকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে শিল্পসংস্কৃতি, লোকশিক্ষা, সমাজমানস, ব্যক্তির চিত্তসঙ্কট রাজনৈতিক আন্দোলন, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—প্রত্যেক বিভাগেই নাটকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ একে সমাজসংগ্রামের হাতিয়ার রূপে বেছে নিয়েছেন, কেউ এর মধ্যে ব্যক্তিত্বের নানা কূটৈষণার ইঙ্গিত দিতে উৎসুক, কেউ-বা চেতনার

গভীরে বুদ্বুদ আকারে স্ফুটমান নানা ভাবানুষঙ্গকে আভাসে-ইঙ্গিতে-প্রতীকে অবধারণ করতে ব্যাকুল, কেউ কেউ নাট্যকলাগত ঐক্যবন্ধন, মনস্তত্ত্বগত আচরণবাদ এবং স্থানকালপরিবেশের বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অস্মিতার নিঃসঙ্গতাকে এমন একটা রূপ দান করিতে চান, যা আপতঃ উদ্ভট, অসঙ্গত ও অর্থহীন মনে হয়। যাই হোক, এখন নাটক যে উপেক্ষিত নয়, 'ডিলাটেন্ট' রসবিলাসীর 'থীসিস ড্রামা' নয়, বা অবসিয়াবাদীদের ধূম্র-সলিল-মরুৎপূর্ণ প্রতীকতাও নয়, পরন্তু প্রতিদিনের সমাজগোষ্ঠীর দ্বারাই এর গোত্রকুল নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—এ আশার কথা সন্দেহ নেই।

তবু এই প্রসঙ্গে একটা আশঙ্কার কথা বলি। এখনও সাম্প্রতিক গোষ্ঠীর মধ্যে যুগস্রষ্টা নাট্যকার এবং শিল্পের দিকনির্দেশকের আবির্ভাব হয় নি। অধুনা প্রচুর নাটক লেখা হচ্ছে, অভিনয়ও হচ্ছে। কিন্তু অসংখ্যের মধ্য থেকে এমন দুটি-একটি নাটক সৃষ্টি হচ্ছে না, যা সমগ্র জাতি-মানসকে, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলকেই অনুপ্রাণিত করবে। অভিনয়কলাও দলগতভাবে বেশ প্রাধান্য পাচ্ছে বটে, কিন্তু একক অভিনয়ের দিন যেন শেষ হয়ে আসছে। বোধ হয় এটা গণতন্ত্রেরই প্রতিক্রিয়া। গ্যারিক, গিরিশ ঘোষ, শিশিরকুমারের দিন চলে যাচ্ছে। এখন অভিনয় নায়ক-নায়িকাকেন্দ্রিক না হয়ে গোষ্ঠিকেন্দ্রিক হচ্ছে। কারণ জীবনেও যেমন একক-নেতৃত্বের অবসান হচ্ছে, শিল্পেও তার প্রভাব পড়ছে। সে যুগে অপ্রধান চরিত্রগুলিকে যেনতেনপ্রকারেণ শেষ করে প্রধান চরিত্রের ওপর যা কিছু গুরুত্ব দেওয়া হত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, একজনের অভিনয়ের উৎকর্ষের চেয়ে ছোট-বড়ো সব চরিত্র মিলিয়ে যৌথ অভিনয়ের দিকেই বেশি দৃষ্টি পড়েছে। এমন একদিন আসবে বলে অনুমান হচ্ছে, যেদিন কি কথাসাহিত্য, আর কি নাটক—কোনটাতেই নায়কচরিত্রের প্রাধান্য থাকবে না, গোটা সমাজমানসই তখন নায়কের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনের কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব লক্ষণের আভাস দেখা যাচ্ছে। সে যাই হোক—নাটক যে জীবনের একটা শিল্পরূপ, নিছক বাস্তব 'রিপোর্টাজ' বা দৈনন্দিন লোকচরিত্রবৃত্তান্ত নয়, তা অস্বীকার করা যায় না। সেই শিল্পাদর্শ নাটক রচনা ও অভিনয়ে যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত না হলে শুধু বিষয়ের গুরুত্বে নাট্যসাহিত্যকে দীর্ঘজীবী করা যাবে না। আধুনিক নাট্যগোষ্ঠীর অনেকেই এই শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছেন—এটাই আশার কথা।

ইতিপূর্বে কয়েকটি নিবন্ধে উনিশ-বিশ শতকের বাঙালী-চেতনার কোন কোন দিক আলোচনা করেছি। উনিশ শতকের বাঙালীর যে নবজাগরণ, তাকে কেউ কেউ পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের অনুকরণে উনিশশতকী বাঙালী-রেনেসাঁস বলতে চান। মধ্যযুগের অবসানে বাঙালী-জীবনের যে সর্বাত্মক অবক্ষয় সমাজে ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল, জীবনবাদী ও ইহচেতন পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সম্মুখীন হয়ে সেই নিদ্রিত লেভিয়াথান তার শতাব্দীসঞ্চিত ভুজঙ্গনিদ্রা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাঙালীর সমাজসংস্কার, ধর্মচেতনার বিপ্লবী পরিবর্তন, শিক্ষার বৈজ্ঞানিকীকরণ, মানবসেবা, চেতনার আধুনিকতা, পাশ্চাত্য-ঘেঁষা রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাদেশিকতা এবং বাংলা সাহিত্যের রূপ-রীতি-ভাববস্তুর অভূতপূর্ব পরিবর্তন গোটা উনিশ শতক ধরে ঝড়ের বেগে বয়ে গেছে। চৈতন্যযুগে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বাঙালী-মানসিকতার মূল্যান্তর হয়েছিল, উনিশ শতকে তারও চেয়ে বিশাল ও যুগাতিক্রমী মূল্যান্তরের আবির্ভাব হয়েছিল। পুরাতন জীর্ণসংস্কারের 'ভেরেণ্ডার খাম' তখন উনপঞ্চাশী হাওয়ার বেগে উড়ে যেতে বসেছে, এবং গর্ভগৃহবাসী ও বিশুদ্ধসংস্কারবাদী কোন কোন ব্যক্তি উড্ডীয়মান চণ্ডীমণ্ডপের চালের বাতা ধরে অবশ্যম্ভাবীকে জড়ত্বের শিকল বাঁধতে চাইছিলেন। কিন্তু জলপ্রবাহকে কোথাও বাধা দেওয়া সম্ভব হলেও, ভাবের প্রবাহকে বেঁধে রাখা যায় না—তা করতে গেলে শুধু অনর্থের সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকে বাঙালী-জীবনের এলোমেলো হাওয়া ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়ে এল। পরবর্তী কালের সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মের প্রবীণ-পক্বকেশী নেতারা হিন্দু-কলেজীয় জীবনের যৌবনোচ্ছল অশনবসনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে কিছু ব্যঙ্গ-রহস্য করলেন বটে, কিন্তু তার প্রতি তাঁদের প্রচ্ছন্ন আসক্তি রয়ে গেল। বাল্যকালের নিষিদ্ধ কর্মের

স্মৃতি বার্ধক্যেও কি ভোলা যায়? যাই হোক, একদিকে নবনবীনের অভ্যাগম, আর একদিকে পুরাতনী ধারার তোয়বদ্ধতা,—বলাই বাহুল্য বদ্ধ জল মুক্তির স্বাদ পেলে আর তাকে গোষ্পদে ফিরিয়ে আনা যায় না। উনিশ শতকে বাঙালী-জীবনে সমাজ-ধর্ম-সংস্কার-সাহিত্য নিয়ে প্রচণ্ড কলরব উঠেছিল। 'হ্যাঁ'-র সঙ্গে 'না'-এর বিরোধ এবং তৃতীয় ব্যক্তি এসে সে বিরোধ মিটিয়ে আবার নতুন বিরোধ ও বৈষম্য জাগিয়ে তুলেছে—এই ভাবে ইতিহাস অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির অয়নরেখাও সেই ধারা মেনেই চলে। উনিশ শতকের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিশ শতকে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কারকে—যাবতীয় 'ইমোটিভ' ব্যাপারকে এমন একটা বৈচিত্র্য দান করেছে যে, তার কারুকর্ম যেমন বিস্ময়কর, গুণগত উৎকর্ষও তেমনি সু-উচ্চ পরিণতির উত্তরাধিকারী। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি হিতবাদী ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের আত্মনিয়োগ এবং বিপুল প্রয়াসের দ্বারা জীবনের এক নব মানচিত্র অঙ্কন, এ যুগের মানসিক ভৌগোলিক সংস্থানের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। বিপুল আশা ও অনন্ত সম্ভাবনার নিশীথস্বপ্ন বক্ষপুটে ভরে নিয়ে একদা কলকাতার নাগরিক বাঙালী যাত্রা শুরু করেছিল, হাতে ছিল ফরাসী বিপ্লবের জ্বলন্ত মশাল, আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণাপত্র হয়েছিল ধ্বজপতাকা। এ্যাডাম স্মিথ, টমাস পেইন, মাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভুর, বিসমার্ক, কোঁৎ, মিল, বেন্থাম—এঁরাই হয়েছিলেন নাগরিক বাঙালীর স্বপ্নসহচর।

ওদিকে গ্রামীণ বাংলায় সে মশালের আলোক পৌঁছাল না, শিক্ষার দীপ জ্বলল না, জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনই মিটল না। বঙ্কিমচন্দ্র বৃথাই 'রামা কৈবর্ত' ও 'হাসিম শেখে'র জন্য ব্রিফ নিলেন। এই ভদ্রজীবন-কেন্দ্রিক 'কলকাতা কালচার' যাকে কেউ কেউ 'বাবু কালচার' বলছেন—তার সঙ্গে বিশাল বাংলার বিশেষ কোন সংযোগ

ঘটল না। তবু পিলসুজের ওপর প্রদীপ জ্বললে যেমন তার চারপাশে কিছুটা আলো ছড়ায়, তেমন 'ফিল্টারেশন' পদ্ধতিতে কলকাতার জীবন-সংস্কৃতি চুঁইয়ে চুঁইয়ে গ্রামজীবনের কিছুদূর প্রবেশ করল, কিন্তু তাতে গ্রামের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হল। তবু ভদ্র সংস্কৃতি সামাজিক আন্দোলন করেছে, রাজনৈতিক উত্তাপ সঞ্চার করেছে, মধ্যযুগীয় পাঁচালী-কীর্তন শোনা কানে সমুদ্রসঙ্গীত ভরে দিয়েছে।

বিশ শতকে বাঙালীর যে নানা ক্ষেত্রে আত্মপ্রসার লক্ষ্য করা যায়, বিশেষতঃ রাজনৈতিক দাবার ছকে রাজা-উজির মারার নিপুণ কলা-কৌশল, রবীন্দ্রনাথের মতো বৃহৎ বনস্পতির শাখা-পত্রের আশ্রয় সত্ত্বেও তার ভব্য নাগরিক বেশের কৃত্রিমতা ঘুচল না। বলতে গেলে— উনিশ-বিশ শতকের বাঙালীর যাবতীয় চিত্ত-সংস্কার ইংরেজী শিক্ষার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য তার জন্য ক্ষোভ বা লজ্জার কারণ নেই। বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশী আহার্য যদি মন ও দেহকে সজীব রাখে এবং স্বদেশে যদি তার অনুকল্প পাওয়া না যায়, তবে কালাপানির পার থেকে আমদানি বলে তাকে বর্জন করা উচিত নয়। বিদেশের চশমায় যদি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তা হলে না হয় স্বদেশী চোখ-ঢাকা বলদের ঠুলি বর্জন করাই গেল। কিন্তু বিশ শতকের সংস্কৃতিও গ্রামীণ বাঙালীকে যথার্থ দৃষ্টি দান করতে পারে নি। এখনও যত আন্দোলন, সব ব্যাপারের প্রাণকেন্দ্র নাগরিক জীবন ও পরিবেশ।

আজ বিশ শতকের মধ্যযাম পার হয়ে গেছে, এখন শিল্প ও সাহিত্যের নব নব পরীক্ষা চলছে, বিশ্বের সাহিত্যান্দোলনের আমরা সমান অংশীদার হয়েছি। কিন্তু 'স্বাক্ষর' ব্যক্তির সংখ্যা কিছু বাড়লেও সূক্ষ্ম মননকর্ম এখনও কি নাগরিকতার এ্যাকোয়ারিয়মে সন্তরণশীল নয়? সম্প্রতি আবার 'নিও-লিটারেট' জনগোষ্ঠী এবং সংবাদপত্রের কল্যাণে শিক্ষা-সংস্কৃতি আরও ডেমোক্র্যাটিক হয়ে উঠছে। এখন বিগত সূর্যের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কী-ই বা করবার আছে?

ঊনিশ-বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল বনিয়াদটা যে ভব্যতা, আভিজাত্য ও নাগরিকতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আর এ-ও অস্বীকার করা যায় না যে, দু-চারটি মহীরুহই এতদিন সমস্ত দেশকে ছায়াবিস্তার করে, ফল দিয়ে, শাখায় আশ্রয় দিয়ে আসছিল। ঊনিশ শতকের সেই সমস্ত ন্যগ্রোধ এখন ভস্মীভূত হতে বসেছে। শত শাখাপ্রশাখা ও অযুত শিকড়সহ রবীন্দ্রছায়াতরুরও মূলোৎপাটিত হয়েছে। এখন শুধু এরণ্ডদের দ্রুমত্ব লাভের জন্য আপ্রাণ প্রয়াসই লক্ষ্যগোচর হচ্ছে।

কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই। ডেমোক্র্যাসির যুগে অভিজাততন্ত্রের পশ্চাদপসরণ কে-ই বা ঠেকাতে পারে? একক প্রতিভার কাল শেষ হল, বহুজনে এখন স্বল্পবিত্ত সম্বল করে সাহিত্যের ফাটকাবাজারে নেমেছেন। নাই-বা রইল ধনী-ভূস্বামীদের কৃপাকটাক্ষপূর্ণ উদারহস্তের অজস্র দান। বিশ শতকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এখন ক্রমেক্রমে হর্ম্যচূড়া থেকে প্রাঙ্গণে নেমে আসছে। এর ফলাফল শুধু ভাবগ্রাহী জনার্দন ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না। একজন বঙ্কিম, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন বিদ্যাসাগর, একজন বিবেকানন্দকে হারিয়ে শত শত মানবকের 'কিল্‌কিলা' ধ্বনিতে সমুদ্রসঙ্গীতের স্বাদ পাওয়া যাবে কি?

আগামী কালের পাঠক তার বিচার করবেন, তার রস আস্বাদন করবেন। হয়তো আজি হতে শত বর্ষ পরে জীবন ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ রূপান্তর ও ভাবান্তর হবে। এখন সাহিত্যের যে সমস্ত *motif*-এ আমাদের শিহরণ জাগে সে যুগের পাঠকের তাতে বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য থাকবে না। 'কালোহ্যয়ং বিপুলা চ পৃথ্বী' বলে সান্ত্বনা লাভেরও সম্ভাবনা থাকবে না। একবিংশ শতকের ভাগ্যবান পাঠকের রুচি ও রীতিকে ঈর্ষা করে এখনকার মতো পুঁথিতে ডোর দেওয়া যাক।।